হাওয়ার্ড ফাস্ট

অনুবাদ : প্রফুল্ল চক্রবর্তী

পরিবেশক :

প্রথম সংস্করণ
অক্টোবর—১৯৫৩

প্রকাশক :
উপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
দাশগুপ্ত ব্রাদার্স
৫ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :
শ্রী প্রবোধ কুমার সিংহ
মহানন্দ প্রিণ্টিং হাউস
৭ বক্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৫

প্রচ্ছদ ভূষণ : পূর্ণেন্দু পত্রী
ব্লক :
ক্যালকাটা ফটোটাইপ ষ্টুডিও
১, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ভারত প্রেস
২২।১।এ ডিকসন্ লেন
কলিকাতা—১৪

দাম—৫৲

পরম সুহৃদ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে

প্রফুল্ল

নিবেদন

সাহিত্যে নবাগত পঁচিশ বছরের এক যুবক এমন একখানি উপন্যাস লিখলেন বারো-তেরো বছরে যার দশ লাখ বই বিক্রী হয়ে গেল আর ষোলটি ভাষায় হল অনুবাদ। আধুনিক আমেরিকান সাহিত্যের সার্থক সৃষ্টি 'কনসিভড ইন লিবার্টি' সম্পর্কে এই সংবাদ বিশেষভাবে আমাকে আকৃষ্ট করে এবং অনুবাদের প্রেরণা দেয়। মুক্তিপথে এই বহু প্রশংসিত বহুল প্রচারিত উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ।

উপন্যাসখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। ফাস্টের বয়স তখন পঁচিশ বছর (জন্ম ১১ই নভেম্বর, ১৯১৪)। অবিশ্যি এই উপন্যাস প্রকাশের পূর্বেই হাওয়ার্ড ফাস্ট আমেরিকার সমকালীন সাহিত্যে খ্যাতির সোপান বেয়ে বেশ কিছু দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। বছর দুয়েক আগে প্রকাশিত 'দি চিলড্রেন' এবং 'প্লেস ইন দি সিটি' নামে উপন্যাস দুখানি তাঁকে প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা দেয়। কিন্তু 'কনসিভড্ ইন লিবার্টি' প্রকাশের পর আমেরিকার সমকালীন পুরোধা সাহিত্যরথীদের দলে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অচিরেই উপন্যাসখানি আমেরিকার সাহিত্যে 'ক্লাশিকের' মর্যাদা লাভ করে।

এই উপন্যাসের পটভূমি ঐতিহাসিক। চরিত্রগুলি কিছু ঐতিহাসিক—কিছু কাল্পনিক। আমেরিকার মুক্তি-সংগ্রামের এক চরম দুঃখজয়ের কাহিনীর উপর গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের ইমারত।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর সঙ্গে আমেরিকার মুক্তিযোদ্ধাদের ছয় বছর কঠোর সংগ্রাম চলে। সামান্য কয়েকটি খণ্ড-যুদ্ধে জয়লাভ

ছাড়া আমেরিকানরা প্রথম দিকে ক্রমাগত পেছু হটতে বাধ্য হয়। প্রায় একটানা দেড় বছর পেছু হটার পর ১৭৭৭ সালের শীতকালে ফোর্জ উপত্যকা নামে এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে তারা ছাউনি ফেলে। আমেরিকান কংগ্রেসের সদরঘাঁটি ফিলাডেলফিয়া শহর থেকে স্থানটির দূরত্ব মাত্র আঠারো মাইল। কিন্তু ফিলাডেলফিয়া তখন ব্রিটিশ বাহিনীর দখলে—কংগ্রেস বিতাড়িত। প্রচণ্ড শীত, প্রবল তুষারপাত, একটানা অনাহার ও চরম দুঃখ-দুর্ভোগে জীর্ণবাস শীর্ণ ক্লান্ত শত শত মুক্তিযোদ্ধা এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে প্রাণ হারায়। অনেকে হতোদ্যম হয়ে দল ছেড়ে ভেগে যায়। তবু সেই চরম দুর্দিনেও একদল দুঃখজয়ী সৈনিক মুক্তিযুদ্ধের মশাল অনির্বাণ রাখে।

একটি স্মৃতি তোরণ আজও ফোর্জ উপত্যকায় এই চরম আত্মত্যাগ, অসীম ধৈর্য আর দুঃখজয়ের কাহিনীকে স্মরণীয় করে রেখেছে; আর ফাস্টের উপন্যাস সেই অমর কাহিনীকে করেছে জীবন্ত।

হাওয়ার্ড ফাস্টের ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা বিশিষ্ট ধরণ আছে। এধারা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। ইতিহাসের পাতা থেকে কুড়িয়ে অতীতের রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষগুলোকে তিনি সমকালীন পরিবেশে বাঁচিয়ে তোলেন—নতুন করে তাদের প্রতিষ্ঠিত করেন যথাযথ মানবীয় মর্যাদায়। সেকালের সাচ্চা মানুষগুলোর সঙ্গে একালের মানুষের নতুন সমধর্মিতা নতুন আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তিপথে এই অভিনব রচনা শৈলীর উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

বরাহনগর
৪—১০—৫৩

প্রফুল্ল চক্রবর্তী

প্রথম খণ্ড—উপত্যকা

—এক—

থেমে দাঁড়িয়েছি আমরা। এখনও বেলা আছে ঘণ্টাখানেক। থামবার সময় হয়নি তো! দিনের আলো থাকা অবধি মার্চ করি··· অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে ঢুকে পড়ি তাঁবুতে·· ভোর হবার আগেই আবার উঠে পড়ি···আবার শুরু হয় পথ চলা। এমনিই তো চলছে রোজ। কিন্তু আজ এই সময় আদেশ আসে: আজকের মত এইখানেই থাম, পাহারার ব্যবস্থা করে রাত কাটাবার আয়োজন কর।

লাইনের সামনে থেকে বিউগলের আওয়াজ আসে। ক্ষীণ শব্দ: নেমে পড়! জেকব ইগেন ধুপ্ করে গাঁটরি ফেলে দেয়। রাস্তার পাশেই বসে পড়ে চার্লি গ্রীন। দাড়িগোঁফওলা গোল পরীর মত মুখে সে হাসবার চেষ্টা করে। বামনের মত বেঁটে চার্লি। সারা দেহে ক্লান্তির অবসাদ। আমি লাইনের সামনে-পেছনে একবার দেখে নিই। সন্ধ্যার মুখে আমাদের লাইন চার পাঁচ এমন কি ছয় মাইলের মত লম্বা হয়।

কোনমতে কাঁধের বোঝা নামিয়ে ফেলি। আঃ বিশু! বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

সামনে পেছনে রাস্তার উপরেই লোকজন বসে পড়ে। জমাট মাটিতে মাস্কেটের খটখট আওয়াজ হয়। সবাই বন্দুকের বোঝা নামিয়ে ফেলতে ব্যস্ত। কাঁধ থেকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে। ওজনও তো কম নয়। কমসে কম সের দশেক হবে। মরচে ধরা কীরিচ লাগান দুর্বহ ভার।

কেন থামলাম? জেকব জিজ্ঞাসা করে। বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করে নয়। একা সে-ই অক্লান্ত। গম্ভীর মুখে টান হয়ে বসে আছে। কালো চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। একে একে সবাইর মুখের দিকেই তাকায় সে। জানতে চায়, কিসের জন্য থামা হল। লম্বা লিকৃলিকে চেহারা জেকবের। মুখে একগাল দাড়ি। লম্বা লম্বা চুল ছড়িয়ে আছে কাঁধের পর। নাকটা যেমন বড় তেমনি বঁড়শীর মত বাঁকা। ঠোঁট দুখানি খুব পাতলা; দাড়ির ফাঁকে অমনিতে দেখাই যায় না। কথা বলবার জন্য যখন সে হাঁ করে, তার অসমান তামাকের দাগওলা দাঁতগুলো দেখা যায়। জন্তুর মত একটা হিংস্রতা উঁকি মারে তার হাঁ ও দাঁতের মধ্যে।

থেমেছি তো হয়েছে কি?

এ তো থামবার জায়গা নয়! এ যে থামবার জায়গা নয়, এটা বুঝতে জেনারেল হবার দরকার হয় না। শীর্ণ হাত নেড়ে সে অরক্ষিত খোলা জায়গাটা দেখায়।

মস্ত বড় একটা সমতল জায়গায় আছি আমরা। খানিকটা উত্তরে উঁচুনীচু পাহাড়ের সার! পাহাড় মানে আশ্রয়। এই খোলা জায়গায় ছয় মাইল জোড়া পল্টন যদি আটকা পড়ে তো কি হবে? কিন্তু চিন্তা ভাবনার বালাই অনেকেই চুকিয়ে ফেলেছে; অনেকেই এখন বেপরোয়া।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমিও বসে পড়ি রাস্তায়। পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিই। কতক্ষণ আর বসা যাবে এ ভাবে? পা দুটো জমে যাবে যে! বেজায় ঠাণ্ডা দিন। আধঘণ্টাখানেক বসলেই পা দুটো অসাড় হয়ে যাবে।

আমার রেজিমেণ্টের আর সকলেও আমাকে ঘিরে বসে। আমি ছাড়া আর মাত্র আটজন আছে আমাদের রেজিমেণ্টে। কোন

অফিসার নেই। ন'জনের জন্য অফিসারের দরকার কি? ঝাণ্ডার একটা ছেঁড়া টুকরো ছিল; কিন্তু সে টুকরোটিও এলি জ্যাকসন পায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। চার নম্বর নিউইয়র্ক রেজিমেণ্টে ছিলাম আমরা। এক সময় তিনশো লোক ছিল আমাদের দলে। হোয়াইট প্লেইনসের মেজর এণ্টন ছিল নেতা। নিজের বাড়ীর কাছাকাছি হোয়াইট প্লেইনসেই সে মারা যায়। ইডেন সেজ ছিল ক্যাপ্টেন। সেও মরেছে। লেফটন্যাণ্ট ফেরেল মরেছে আমাশায়। ১৭৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসের কোন একদিনে অফিসারহীন আমরা। তারিখটা ঠিক মনে নেই। পালাবার সময় দিন-তারিখ ঠিক থাকে না। হয়ত তেরোই ডিসেম্বর হবে, কি চোদ্দুইও হতে পারে। একে তেরোই তায় হয়ত শুক্রবার—নিতান্ত অশুভ যোগাযোগ। চার্লি গ্রীন একটা গান বেঁধেছে তেরোই শুক্রবারের উপর। বোস্টনের মাঠে ডাইনীদের নেচে বেড়াবার গান।

রাস্তার ডাইনে-বাঁয়ে নিজের নিজের খেয়াল-খুশিমত ছড়িয়ে পড়ে সৈনিকেরা। চমৎকার ছাউনি ফেলা! যতদূর মনে পড়ে, গোটা মাঠের মধ্যে একটিমাত্র পাথুরে বাড়ী ছিল বনের কাছাকাছি। জানালা বন্ধ, কোন আলো নেই—কোন ধোঁয়াও বেরুচ্ছে না ঘর থেকে। এমন এলাকায় আমরা থেমেছি, যেখানকার লোক বিদ্রোহীদের ঘৃণা করে।

মেঠো পথটি নীচু। আমরা উঁচু মাঠের উপর চড়ে বসি। এলি জ্যাকসন থেমে তার পায়ে জড়ান নেকড়াকানি ঠিক করে নেয়। সব সময় রক্ত ঝরে তার পা থেকে। পেয়ারের একটি স্টাফ অফিসার ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে। নীল উর্দিপরা নাবালক। জেকব ইগেন তাকে থামায়।

বল তো ছোকরা, এইখানেই ছাউনি ফেলা হবে? জিজ্ঞাসা করে জেকব।

নোংরা বিচ্ছিরি চেহারা ইগেনের। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মুখের চার পাশে নীহার কণার দাগ। অবিশ্যি দেখতে সুশ্রী আমরা কেউই নই। ছেলেটি ঘোড়ার রাশ ঢিলে করে দেয়।

কালকে ছাউনি ফেলা হবে। আজ শুধু সৈনিকদের বিশ্রাম করান হল।

তা তোমরা আর জেনারেল মিলে খুব করেছ। শ্লেষ করে বলে জেকব।

গট গট করে চলে যায় ছেলেটি। হো হো করে হেসে ওঠে জেকব। অফিসারদের ঘৃণা করে সে। ভগবান সাক্ষী, কেউ আমরা ভাল বাসতাম না তাদের। কিন্তু জেকবের ঘৃণার মধ্যে খানিকটা পাগলামি আছে। আমরা সবাই যে চোখে বিপ্লবকে দেখি, সে দেখে তার চাইতে ভিন্ন চোখে। আমাদের কাছে বিপ্লবের অর্থ অনশন আর শীত ভোগ; কিন্তু তার কাছে বিপ্লব জনতার তৈরী জলন্ত আগুনের মত। অফিসারদের সঙ্গে রীতিমত তর্ক করে সে। তারা যদি বিপ্লবের পক্ষে হয়তো তারা আমাদেরই একজন। মানুষের জন্য মানুষের সংগ্রাম এটা। শুধু ভগবান আছেন মাথার উপর; কোন ব্যাটা ঘোড় সওয়ারকে কেয়ার করি না। এইভাবেই সে কথা বলে। কিন্তু আমরা বড় কান দিই না। জেকবের কথা বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের মত। চুপ করে শুনে যাই। শেষ অবধি তার গলার ঘড়ঘড় আওয়াজ ছাড়া কোন শব্দের অর্থ মালুম হয় না। হেঁটে চলি একটানা। শেষ অবধি পল্টনের ভীড়ের মধ্যে মিশে যাই। এখন যা আছে, তাকে পল্টন বলা যায় না। পাঁচ ছয় মাইল দীর্ঘ জনতা ছড়িয়ে আছে দেশগাঁয়ে। এক পাশে থাকার চাইতে ভিতরে থাকা অনেক নিরাপদ।

আমরা পেনসিলভানিয়ার ফৌজের পাশ কাটিয়ে যাই। জেনারেল

ওয়েন এদের মধ্যে তবু খানিকটা শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন। ব্রিগেডে ভাগ হয়ে ছাউনি ফেলেছে তারা ; সান্ত্রীও মোতায়েন করেছে পাহারার জন্য। একটি সান্ত্রী আমাদের থামায়। দক্ষিণাঞ্চলের লম্বাপনা চাষীর ছেলে বালকটি। আমরা তাকে আমল দিই না। হো হো করে হেসে ধাক্কা মেরে সরিয়ে পাশ কাটিয়ে যাই। সে বলে, কে হে নবাব পুত্তুর। পেনসিলভানিয়ার এলাকা দিয়ে ঠেলে চলবার কি অধিকার আছে তোদের ?

এডওয়ার্ড ফ্লাগ মোলায়েমভাবে বলে, এ কি তোর খাস তালুক ? ঠাণ্ডা মেজাজের লোক এডওয়ার্ড। বেশ বড় চাষী। চটে কম ; কিন্তু একবার চটলে সহজে রাগ পড়ে না।

হ্যাখ, মারামারি করবার ইচ্ছে আমদের নেই। ছেলেটিকে বল্লাম আমি।—নিউ ইয়র্কের এক রেজিমেণ্ট আমরা। তারপর আবার এগিয়ে চলি। পেছন থেকে ছেলেটি হেঁকে বলে, উকুনেরও অধম তোরা !

পেনসিলভানিয়ানদের এলাকা পার হয়ে যাই। গোলমাল বাঁধাবার কোন অভিপ্রায় নেই আমাদের। মানুষের হাতে হাতিয়ার তুলে দিয়ে তার মাথা বিগড়ে দেওয়া হয়। তারপর তারা নরক সৃষ্টি করে।—এই যুদ্ধে যা হবে তা বলছি শোন। কেনটন ব্রেন্নার বলতে শুরু করে।—শেষ অবধি দেখ উত্তর-দক্ষিণ আর পূব-পশ্চিমে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। পেনসিলভানিয়ার জার্মান থানকির বাচ্চাদের সঙ্গে আমার কোনদিন বনি বনা হবে না। বিনা দরকারেও জার্মান ব্যাটারা যখন বন্দুক নিয়ে ঘোরে, রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। ভেবে দেখ, ব্রিডস্ হিল আর হোয়াইট প্লেইনসে (১) কোথায় ছিলেন যাদুরা ?

তুমি থাম কেনটন। মস বলে। নেহাৎ নাবালক সে। বছর

---

(১) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের দুটি রণক্ষেত্র।

আঠারো বয়স হবে। এইবার তার পালা। পালা কথাটাও মসের আবিষ্কার। কে কখন মারা যাবে পালাক্রমে তার একটা তালিকা করা হয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে সে তালিকাটি বানিয়েছে। রেজিমেণ্টের মধ্যে কার পর কে মারা যাবে ক্রমানুসারে তার এক দীর্ঘ তালিকা। যেখানে যে নামটি আছে প্রায়ই তার নড়চড় হয়না। এ নিয়ে সে এমন নজীর দেখায় যে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। মসের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এইবার তার পালা। খুকখুক করে সর্বক্ষণ কাশে, সব সময় রক্ত শুকিয়ে থাকে ঠোঁটে। যখন সে কিছু বলে, আমরা সবাই তার দিকে তাকাই। এবারে সবাই চুপ করে থাকি।

জমাট পাণ্ডুর মাঠের বুকে চটপট অফিসারদের তাঁবু ওঠে। সৈনিকেরা মাঠের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে! শৃঙ্খলার বালাই নেই। পেছনের দিককার কিছু সৈনিক রাস্তার উপরেই বসে পড়ে। উত্তরে বনের কিনার থেকে দক্ষিণে দিগন্ত অবধি বিস্তৃত মাঠের সর্বত্র সৈনিকের ভীড়।

অনেক লোক। জেকব বলে।

দশ এগারো হাজার হবে। সায় দিয়ে বলি।

সবাই ভাগবে।

আমি আর পারি না। ভাবছি বাড়ী চলে যাব। মস বলে।

গোটাকয়েক ফলের গাছের তলায় এলাম আমরা। কাছাকাছি হাত ত্রিশের মধ্যে কোন লোকজন নেই। গাঁটরি ফেলে দিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ি। নিজের ইচ্ছেমত আস্তেসুস্থে মাস্কেটগুলো পাঁজা করে কেনটন ব্রেন্নার। নীরব উৎসুক দৃষ্টিতে আমরা চেয়ে থাকি। সত্যিই বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি সবাই।

যৎসামান্য খাদ্য ও প্রকৃত বিশ্রামের অভাবে একটা ঝিমু ঝিমু ভাব আচ্ছন্ন করে ফেলেছে আমাদের। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতিটি

সংযোগ অসাড় হয়ে আসছে ক্লান্তির অবসাদে। দেহের গভীরে প্রবেশ করে এ অবসাদ, মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে একটি মাত্র আকুতি—সে আকুতি গা এলিয়ে দেবার মত প্রশস্ত ঢালা শয্যার। বিছানা তোমাকে আপন করে নেবে, জুড়িয়ে দেবে হাড়ের অবসাদ। মাঝে মাঝে মনে পড়বে শিশুদের চাকাওলা বিছানার কথা—সেই বিছানায় শোওয়া শিশুর কথা। কিম্বা মনে হবে রুটি সেঁকা ওলন্দাজ উনুনের কথা। মনে পড়বে বাড়ীর কথা।

ঠাণ্ডা মাটিতে শুয়ে পড়ি। কেউ টান হয়ে শোয়, কেউ থাকে গুটিসুটি মেরে। কিন্তু আগুন জ্বালানও তো দরকার। পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করি; কেউ নড়তে চায় না। তখন চালি গ্রীন উঠে পড়ে। তার দিকে চেয়ে থাকি আমরা, কিন্তু ডেকে ফেরাই না। আমিও উঠে পড়ি তখন। গাঁটরি থেকে একখানা কুড়াল নিয়ে ফলের গাছ কোপাতে শুরু করি। আপেল কি প্লাম গাছ হবে হয়ত। ঠিক মনে নেই। বেশ শক্ত কাঠ।

ব্যথিত দরদী চোখে ওরা আমার দিকে চেয়ে থাকে। ফলের গাছ বড় হবার জন্য সে দীর্ঘ প্রতীক্ষা করতে হয় তার কথা মনে পড়ে দুঃখ হয়। কেউ গাছটি পুঁতেছে; তারপর দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা করেছে চারাটি বেড়ে ওঠবার জন্য। কেউ হয়ত গ্রীষ্মকালে পাকা ফল পেড়ে নিয়েছে।

কথা বলবার জন্য হাঁ করে ক্লার্ক; তারপর নিজেই থেমে যায়। আমি ঝুঁকে পড়ে ডালখানি ছিঁড়ে না নেওয়া পর্যন্ত ওরা চুপ করে থাকে। এলি জ্যাকসন তখন উঠে দাঁড়ায় এবং ডালখানা ভেঙে টুকরো টুকরো করে।

গ্রীষ্মকালের পাকা ফলের কথা মনে পড়েছে। ফিসফিস করে বলে মস্।

আমি খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে একটু বাদেই আর একখানা ডাল কাটতে শুরু করি। মনে তখন একটি মাত্র কথা জাগছে। আমার মনের কথা পল্টনের সবাইকার মনের কথা। আবার যদি গ্রীষ্মকাল আসে! আর একটি মাত্র গ্রীষ্মের ঘাম-ঝড়ান রোদ চাই। আর একবার গ্রীষ্ম আসুক আর রস চুঁয়ে পড়ুক পাকা ফলের খোসা ফেটে!

পিটে পিটে আমি কাটা ডালখানা ভেঙে ফেলি।

চকমকি আর ইস্পাত দিয়ে এলি তখন আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে। সব চেয়ে বয়সে বড় এলি। জেকবের চাইতেও বড। জেকবের বয়স চল্লিশের উপরে। এলিই আমাদের মুখপাত্র; অবিশ্যি যখন মোলায়েম কথার দরকার হয়। রেগেমেগে নিজেদের মধ্যে যখন ঝগড়াঝাটি করি, এলির কণ্ঠস্বর যেন জ্বলন্ত আগুনে জল ঢেলে দেয়। ভগবান সাক্ষী, নিজেদের মধ্যে তখন হামেশাই ঝগড়াঝঞ্ঝাট লাগত। মাংসহীন ঢিলে চেহারা এলির—হাত দুখানা মস্ত বড়। সেই হাতের নিশ্চিত অক্লান্ত কাজ লক্ষ্য করছি। চকমকির পোড়া শোলা কি ফিতে দুর্লভ। চট্ করে আগুন ধরে এমন কিছুই পাওয়া যায় না। টুপির মধ্যে থেকে সুতো বার করে কেনটন। অপলক দৃষ্টিতে আমি চেয়ে থাকি। মনে মনে বলি, অনেক অভিজ্ঞতা হল। আমার বয়স একুশ বছর। কিন্তু এই বয়সেই আটটি লোকের দেহমনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় জেনেছি।

জোর কদমে ছুটে এসে একটি অফিসার ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে এবং আমাকে গাছ থেকে নামতে বলে।

লুঠপাট করা চলবে না। সে বলে। লোকটিকে চিনি বলে মনে হয়। তার মুখে একগাল দাড়ি, গায়ে উর্দি নেই। ওয়াশিংটনের দেহরক্ষী বলে মনে হয়। ভার্জিনিয়ানদের ঢঙে কথা বলছে লোকটি।

ইগেন উঠে দাঁড়ায়। পাঁজা করা মাস্কেটের কাছে যায় সে। আর সকলেও উঠে পড়ে। অফিসারকে গোল করে ঘিরে দাঁড়াই আমরা।

সবাইর জামা কাপড় নোংরা আর ছেঁড়া। সবাইর মুখেই দাড়ি। মস ফুলারের বয়স মাত্র আঠারো বছর ; তবু তার মুখেও দাড়ি গজিয়েছে। যেমন নোংরা তেমনি শীর্ণ আমরা। পায়ে নেকড়াকানি জড়ানো। এলি জ্যাকসনের পায়ে জড়ানো নেকড়ায় রক্তের চাপ। কি যেন হয়েছে তার পায়ে—সারবার আশা নেই। সব সময় রক্ত ঝরছে। জীবনী শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে ক্ষতমুখে।

তোমাদের কমাণ্ডার কে? ব্রিগেডের নাম কি?

চার নম্বর নিউ ইয়র্ক।

কেনটন ব্রেন্নার তার মাস্কেটটা তুলে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে জেকবও। জেকবের চোখে ক্ষুব্ধ রোষ। তার ভাব লক্ষ্য করে অফিসার বলে, তুমিই কমাণ্ডার? তোমার রেজিমেণ্টের আর সবাই কোথায়?

আমরা সবাই এখানে আছি। জেকব বলে।—কোন অফিসার নেই।

জিনের পর কাত হয়ে গাছটি দেখিয়ে সে বলে, গাছটা মেরে ফেলছিলে তো!

সবাই আমরা বিদ্রূপ করি অফিসারকে। আমি কুড়ালের কোপ তুলি। আমার মাথা তাক করে পিস্তল উঁচিয়ে সে বলে, লুটপাট করা চলবে না।

কুড়ালের কোপ নাবাই। গুলী করবার ভয়ে নয়। সে গুলী করবে, এ আমি ভাবতেই পারিনি। ব্যাপারটা গ্রাহ্যই করিনি হয়ত। স্বপ্নের মত সহসা একটা পিস্তলের আওয়াজ কানে আসে। আমার মাথার টুপিটা উড়ে যায়। কুড়াল হাতে করে আমি রুখে এগোই। জেকব আমার সামনে। মাস্কেটের নলের এক বাড়িতে সে পিস্তলটা ফেলে দেয় এবং এক হেঁচকা টানে অফিসারকে ঘোড়া থেকে টেনে নামায়। চেয়ে দেখি, জেকবের বদ্ধমুষ্টির ঘুষি পড়ছে তার মুখে।

মাটিতে পড়ে যায় অফিসারটি। আমরা তাকে ঘিরে থাকি। বোস্টনের লোকজনের আস্তানা আমাদের কাছাকাছি। গুলীর আওয়াজ শুনে তারা এগিয়ে আসে। অফিসার প্রীতি তাদেরও নেই। দখনে অফিসারদের উপরে তো নয়ই!

শূয়োরটাকে খতম করে দেওয়া উচিত ছিল। তাদের একজন বলে।

দাস চড়ানে বেজন্মাটাকে খতম করে দাও!

কয়েকটা গোঙানি দিয়ে অফিসারটি উঠে দাঁড়ায় এবং কোন কথা না বলে ঘোড়ায় চড়ে চলে যায়। বোস্টনের সৈনিকেরাও চলে যায় তারপর। ইগেন তখন বসে পড়ে এবং দুই হাতে মাথা গুঁজে থাকে।

কোনমতে আগুন জ্বালা হয়। ইন্ধন জোগাবার জন্য আমরা ফলের গাছটির প্রায় সমস্ত ডালপালা ভেঙে ফেলি। এতক্ষণে অনেক আগুন জ্বলেছে; গোধূলির আলোর সঙ্গে মিশে গেছে আগুনের রাঙা আভা। স্টাফ অফিসাররা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। ওয়াশিংটনের মাথা ছাপিয়ে উঠেছে আর সবকটি মাথাকে। ঘোড়ায় চড়ে মাঠ পার হয়ে তারা বাড়ীখানির কাছে যায় এবং কবাটে হাতুড়ি মারতে থাকে। কবাট খুলে যায়। জানালার খড়খড়ি খুলে দেওয়া হয়। মিটিমিটি আলো দেখা দেয় ঘরের মধ্যে।

ঐ রকম একখানা ঘর যদি পাওয়া যেত! ফিসফিস করে বলে মস।

কোয়েকারদের (১) বাড়ী। ছাখ না, কি আরামে থাকে। বিড়বিড় করে বলে জেকব।

হেসে ওঠে এলি জ্যাকসন। আমাদের গাঁটরিতে কিছু আলু আছে। সেগুলো বার করে কিরিচের মাথায় ফুঁড়ে আগুনে সেঁকে নেওয়া হয়। আগের দিন এড ফ্লাগ আলু কটি চুরি করেছে। শস্যের দানা

(১) খৃষ্টান ধর্মের নিষ্ঠাবান শান্তিবাদী ধর্মভীরু একটি সম্প্রদায়।

চিবিয়ে যাদের দিন কাটাতে হয়, আলু তাদের কাছে দুষ্প্রাপ্য জিনিস বইকি!

সহসা গানের সুর কানে আসে। একটি স্ত্রীলোক বগলদাবা করে আগুনের দিকে হেঁটে আসে চার্লি গ্রীন। হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী মেয়েটি। গায়ে নোংরা কম্বল জড়ানো। তার পায়েও নেকড়াকানি বাঁধা, মুখে প্রসন্ন হাসি। বুভুক্ষুর মত আমরা তাকে লক্ষ্য করি। মোটাসোটা লোক দেখলে সকলেরই ভাল লাগে।

এর নাম জেনি কার্টার। চার্লি বলে।—খাসা নাদুস নুদুস মেয়ে। আবার সে গান গাইতে শুরু করে।

আগুনের পাশে বসে পড়ে মেয়েটি; মোটা পা দুটো ছড়িয়ে দেয় আগুনের দিকে। হাত নেড়ে সসব্যস্তভাবে সে চুল ঠিক করে নেয়। আমরা হাসাহাসি শুরু করি।

একে কোথায় পেলে চার্লি?

পেনসিলভানিয়ানদের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি। ওলন্দাজ চাষী-ভূতগুলোর দলে মেয়ে গিস্‌গিস্ করছে। শ খানেক হবে। জেনিকে নিয়ে এলাম। বল্লাম আমরা মোহকের লোক। একদল মোহকের খাসা লম্বা লোক আছে। আরও বল্লাম, মেয়েদের খাঁটি ভালবাসতে জানে এমন লোকও আছে, চল। কি বল জেনি?

মেয়েটির পাশে বসে হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চার্লি।

দুর! নোংরা ভিখারীর দল যত! থু থু ফেলে মেয়েটি।

সামান্য নোংরাতে নিশ্চয়ি কিছু মনে করবে না।

দু চারটে টাকাও আমি পরোয়া করিনা।

গাঁটরির মধ্যে থেকে একমুঠো মহাদেশীয় নোট বার করে মেয়েটির কোলে ফেলে দেয় জেকব। নোটগুলো ছড়িয়ে দেয় মেয়েটি। তপ্ত আগুনের শিখা অমনিই টেনে নেয় নোট ক'খানা।

ওতে হবে না।

ওলন্দাজদের মত দরকষাকষিতে তো খুব ওস্তাদ দেখছি। জেকব বলে।

আমি তার সামনে একটি শিলিং মুদ্রা তুলে ধরি। খপ করে মুদ্রাটি লুফে নিয়ে পায়ে বাঁধা নেকড়াকানির মধ্যে লুকিয়ে রাখে মেয়েটি। তখন আলু ভেঙে তার সঙ্গে কয়েকটুকরো নুন দেওয়া মাংস মেশান হয়। রসিয়ে রসিয়ে আস্তে আস্তে খাওয়া হয়। পুরোপুরি অন্ধকার হয়েছে এখন। পশ্চিম দিগন্তের পটভূমিকায় তখনও সৈনিকদের জটলা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পূর্বদিকে সব কিছু বনের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। মালুম হচ্ছে শুধু আগুনের শিখাগুলো।

আমাদের উত্তরে মাঠটা ঢালু হয়ে গেছে পাহাড় অবধি। ওদিকে এলোপাথারি আগুন জলছে। মনে হয় কতগুলি জোনাকি বসেছে মাঠের বুকে, এখুনি আবার উড়ে যাবে হয়ত বা। পশ্চিম আকাশের আভা মিলিয়ে যায়। বাতাস বইতে শুরু করে সোঁ সোঁ করে।

কি বেজায় ঠাণ্ডা রাত। ক্লার্ক ভ্যানডিয়ার বলে।

মেয়ে নিয়ে থাকবার মত রাত বটে!

নাদুস নুদুস মেয়ে হলে আর ভাল।

এক টুকরো আলু মুখে দিয়ে খিলখিল করে হাসছে জেনি। তারপর সে এলিয়ে পড়ে চালির বাহুবন্ধনে। ব্যাপারটা সবাই আমরা লক্ষ্য করি; কিন্তু কেউ তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। কথা তেমন বেশী কেউ বলছে না; যখন বলছে তাও চাপা গলায়। তবু মেয়েটির শ্বাস-প্রশ্বাস ও দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। বহুদূরে নিউ জার্সির সৈনিকেরা যেখানে আছে, সেদিক থেকে একটা সোরগোলের আওয়াজ ভেসে আসে।

এলি জ্যাকসন তার পায়ের পট্টি নিয়েই ব্যস্ত। মাঝে মাঝে আমার

মনে হত যে তার পা এখনও অসাড় হয়ে যায়নি—সামান্য অনুভূতি রয়েছে হয়ত। তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু এলি মরবে, এ আমি ভাবতেই পারিনা। মনে পড়ে বছর দশেক আগেকার কথা। হুরনরা (১) সেবার হানা দিয়েছিল মোহকে। এসেই তারা খুনখারাবি ঘরজ্বালানি শুরু করে। এলি আমাদের বাড়ী আসে। তখন তাকে নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে আমরা সব কটি পরিবার জড়ো করি। সবাই আশ্রয় নি পেট্রুন কেল্লায়। নেহাৎ বাজে আশ্রয়। এদিকে এলি আর জন ছয়েক লোক পুরো দুদিন ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করে। বেশ জোয়ান সাহসী লোক এলি।

নতুন সৈন্যদলের সঙ্গে জুতোও নাকি আসছে শুনলাম। সাগ্রহে বলে এলি।

ও কংগ্রেসের পেটমোটা শূয়োরগুলোর ধাপ্পাবাজী।

কংগ্রেসকে যত ঘৃণা করি—এত ঘৃণা আমি ব্রিটিশদেরও করি না। ক্লার্ক বলে।

আমি দুটোকেই ঘৃণা করি। জেকব বলে ওঠে।—যে ধাপ্পাবাজের দল নিজেদের কংগ্রেস বলে জাহির করেছ ওদের···। সহসা থেমে যায় জেকব। একবার আগুনের দিকে চেয়ে আবার বলতে শুরু করে: বহুত সময় আছে, জান ক্লার্ক! কংগ্রেসের জন্য বহুত সময় পাওয়া যাবে। আগে ব্রিটিশদের খতম করেনি! আগে ব্রিটিশ! ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পরাভূত বাহিনীর প্রতীক ওই আগুনের ফুলকিগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নেয় জেকব।

ব্রিটিশদের পরে, বুঝলে? আবার বলে সে।

শুনলাম আমরা নাকি বাড়ী যাচ্ছি? অনুযোগের সুরে বিড়বিড় করে বলে মস।

---

(১) একটি রেড্ ইণ্ডিয়ান উপজাত।

কিন্তু যাবার যায়গা নেই। ইণ্ডিয়ানরা মোহক পুড়িয়ে দিয়েছে! জ্ঞাতিদের মধ্যে কেউ যদি বেঁচে থাকে তো তারা যে কোথায় আছে ভগবানই জানেন।

আমি কিন্তু মোহক যাচ্ছিনে। মাথা নেড়ে বলে জেকব।—নিউ ইয়র্ক উপত্যকায় নির্বিঘ্নে বাস করবার জো নেই। কানাডা থেকে একশো বছর লড়াই করবে ওরা।

তা তুমি তো আর একশো বছর বন্দুক কাঁধে করে বেড়াতে পারবে না। হেসে ওঠে কেনটন।

পেনসিলভানিয়ায় একটা অপূর্ব জায়গার কথা শুনেছি। তার নাম নাকি কেনটাকি। বুন নামে এক ভার্জিনিয়ান জায়গাটা খুঁজে বার করেছে…

বোকা বোকা! সব শালা বেহদ্দ বোকা! খেঁকিয়ে উঠে জেকব। —আমাদের বিরুদ্ধে রেডদের লাগানোই তো ব্রিটিশদের চাল। জোসেফ ব্রায়ানট ছাড়া ছয় জাতির (১) শক্তি কি? আর ব্রায়ানট তাদের হাতের পুতুল! ইংলণ্ডে নিয়ে ওরাই তো তাকে আজকের ব্রায়ানট্ বানিয়েছে! শোন, ব্রিটিশদের রাজনীতির খেলা বলে দিচ্ছি। ভেদনীতির চাল চালবে ওরা—একটা শক্তিকে আর একটার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেবে। কিন্তু আমরা স্বাধীন মানুষ, রাজার হাতের পুতুল নই। রাজার দলের সব শালাকে যেদিন আবার গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে দিতে পারব, সেইদিন পশ্চিমে শান্তি আসবে।

মেয়েটিকে নিয়ে যেখানে আছে সেইখান থেকেই ভাঙ্গাগলায় খেঁকিয়ে ওঠে কেনটন, থাম থাম জেকব! চুলোয় যাক ব্রিটিশেরা।

মোড় ফেরে জেনি। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। চার্লি গ্রীন উঠে বসে, মাথা ঝাঁকায় ক্লান্ত ভাবে।

---

(১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক আমেরিকার আদিম অধিবাসী ইণ্ডিয়ান জাতিসমূহ।

কিগো, তোমার কাজ সেরেছ ? কেনটন জিজ্ঞাসা করে।

জেকবের ভাব বদলে যায়। উঠে মেয়েটির কাছে যায় সে। তার পিঠে কয়েকটা থাপড় মেরে গাল টিপে ধরে। বলে, সাচ্চা লোকের দিকে তাকাওনা !

মেয়েটাকে মেরে ফেলবে। মস ফুলার অনুযোগ জানায়। নিজের বখ্ রা চায় সে। ক্লান্ত মেয়েটির কাছ থেকে যে সামান্য আরাম পাওয়া যায় তারই জন্য আকুপাকু করছে মস। থর থর করে কাঁপছে—অধীর হয়ে পড়েছে আসন্ন মৃত্যুর শঙ্কায়।

মেয়েটির পাশে শুয়ে পড়ে জেকব। আমরা গুটিসুটি মেরে আগুনের কাছে এগিয়ে যাই। নিউ জার্সির সৈন্যদলে বিরাট সোরগোল শোনা যায়—গুলীর আওয়াজ কানে আসে। আমরা আগুনের কাছে বসে থাকি ; কেউ নড়াচড়া করছে না। আগুনের তাপে ক্লান্তির অবসাদ আচ্ছন্ন করে ফেলে আমাদের।

আক্রমণ শুরু হল নাকি ? এলি জিজ্ঞাসা করে।

আর গুলীর আওয়াজ শোনা যায় না। আক্রান্ত হলেও এমন কিছু এসে যায় না। দুটি অফিসার জোর কদমে ছুটে যায় ; আগুনের শিখায় ঝিকিয়ে ওঠে তাদের উন্মুক্ত তরোয়াল।

আরও কত দুর্ভোগ যে আছে !

সব চুপচাপ। জেকবের নাক ডাকানি শোনা যাচ্ছে। তাদের দিকে তাকাই শুধু বারেকের জন্য। জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে স্ত্রী-পুরুষ। মস ফুলার হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে আছে। আস্তে আস্তে কাশছে সে। গুন গুন করে একটি ফরাসী পল্লী-গীতির সুর ভাঁজছে এলি।

আর এক আলাদা দিনের কথা স্মরণ করবার চেষ্টা করি : সেদিন লজ্জা ও বিনয় ছিল। যে উদ্দীপনা নিয়ে প্রথমে আমরা লড়াইর ময়দানে ছুটে এসেছি, মনে করতে চাই সেদিনের কথা।

আমার নাম বলছি। নাম আলেন হেল। একুশ বছর বয়স আমার। আমেরিকার মহাদেশীয় ফৌজের সৈনিক আমি। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য অনেক দূর থেকে এসেছি।

আগুন নিভু নিভু হয়ে আসে। আবার ফলের গাছ কাটতে যায় কেনটন। ফিরে এসে সে আগুনের পর কাঠ দেয়। বলে, ফলের গাছ কাটতে হবে, কোনদিন এ কল্পনাও করিনি। প্রায় দশ বছর শেরি ও প্লাম গাছের বীজ সযত্নে রেখেছি। ভেবেছিলাম পশ্চিমে গিয়ে হ্রদ অঞ্চলে বিরাট ফলের বাগান বানাব। যাই হোক, যুদ্ধের দৌলতে পশ্চিমেই চলেছি—বীজগুলো রক্ষা করতে হবে দেখছি।

আগুন জ্বলছে। সৈন্যদল চুপচাপ। সবাই ঘুমোচ্ছে হয়ত। মস শুয়ে আছে মেয়েটিকে নিয়ে। সেও ঘুমোচ্ছে। নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস দেখে মনে হয় গভীর ঘুমে অচৈতন্য। আমাদের আর কেউ মেয়েটির কাছে যেতে চাই না—মসের ঘুম ভাঙাতে চাইনা।

মাসাচুসেট্সের জনকয়েক লোক এসে আগুনের পাশে দাঁড়ায়। তাদের অধিকাংশ ব্রিগেডই আগুন জ্বালাতে পারেনি। আগুনের চার পাশে ভীড় করে দাঁড়ায় তারা। আমরাও হাওয়ার সিরসিরানি থেকে বাঁচি! এদের মধ্যে একজন অফিসার। শতছিন্ন তাঁতে-বোনা বাদামি লড়াইর পোশাকপরা দাঁড়িগজান নাবালক সে। কোমরে মরচে পরা তরোয়াল।

চাপা গলায় কথা বলে তারা। পাশে লোক ঘুমোচ্ছে যে!

একজন বলে, শুনলাম বৃত্তের মত গোল হয়ে পিছু হটা হবে। পাহাড় ডিঙিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে নাকি ফিলাডেলফিয়া আক্রমণ করা হবে। পেনসিলভানিয়ায় শুনলাম অপরূপ এক পরীর রাজ্য আছে। বুন নামে একটা লোক জায়গাটা জরীপ করেছে। সেখানেই বসবাস করতে পারি আমরা। চাষ আবাদ করে নিজেদের জমিজমা রক্ষা করতে পারি।

মাগ-ছেলের কি হবে?

ঘরের টান থাকলে তার পল্টনে আসা উচিত নয়।

পল্টন এখনও আছে নাকি? বিড়বিড় করে বলে কেনটন।

ঘরের টানওলা পাঁচ হাজার লোকও যদি এখানে থাকে, তাহলে অস্ত্রত্যাগ করে তারা ফাঁসির দড়ি গলায় পড়বে নাকি?

শান্তির পর আর ফাঁসিটাসি হবে না।

জর্জ ওয়াশিংটন বেঁচে থাকতে শান্তিও হবার আশা নাই। ওয়েন আর তার পেনসিলভানিয়ার লোকজনের মাথায় কি ভূতই যে চেপেছে!

হার্লেমে আমরা রুখেছিলাম কিন্তু ওয়েনের লোকজন ভেগে যায়। আস্তে আস্তে বলে ভ্যানডিয়ার।

দুবছর জমিতে চাষ-আবাদ হচ্ছে না। পল্টন ভেগে যাবার পর ওরা জমি-জমা নিয়ে নেবে। কেনটাকি মুলুকে যদি মেয়ে থাকে তো…

কাল কোথায় যাচ্ছি আমরা? ইগেন জিজ্ঞাসা করে।

মাসাচুসেট্‌সের অফিসারটি বলে, উত্তর-পূবে ফোর্জ উপত্যকা নামে একটা জায়গায়।

সেখানে ছাউনি ফেলা হবে?

খানিক বাদে মাসাচুসেট্‌সের লোকজন চলে যায়। আগুন নিভে আসে। সারা মাঠে নিভু নিভু আগুনের মিটিমিটি আলো।

আমি ঘুমোবার চেষ্টা করি। এলি জ্যাকসন উঠে তার মাস্কেট তুলে নেয়।

কি করছ এলি?

আমি খানিকক্ষণ পাহারা দিচ্ছি। সে বলে।

গ্রীন হেসে ওঠে। পাহারা দেওয়া নিরর্থক। কি হবে পাহারা দিয়ে? যে কোন আঘাতে ভেঙে পড়ব আমরা। আমরা কি পল্টন নাকি?

একদিন ছিলাম বটে ; কিন্তু আজ নয়!

তুষারপাত শুরু হয়। বড় বড় শুকনো সাদা বরফের ফালি ঝরে পড়ে। খালি হাতে মাস্কেট ধরে দাঁড়িয়ে থাকে এলি। ঝুর ঝুর করে তুষার ঝরে পড়ে তার গায়ে মাথায়। খানিক বাদে সে নিস্পন্দ তুষারস্তূপে পরিণত হয়।

—দুই—

ওঃ! একটানা ঘুমে রাত কাবার করে ভোরবেলার ঝলমলে রোদে যদি ঘুম ভাঙে! এখন যদি একটু আগুন পাওয়া যায়! যেখানে আগুন জ্বালান হয়েছে সেই দিকে গোটা শরীর ছড়িয়ে দিই। কিন্তু আগুন নিভে গেছে। বুঝতে পারি, বারবার রাতের বেলা ঘুম ভেঙেছে আমার। বিউগল বাজছে একটা। উঠে বসি। ঝুর ঝুর করে বরফ গড়িয়ে পড়ে গা থেকে। দুই তিন ইঞ্চি পুরু বরফ জমেছে মাটির পর। গ্রীন, লেন, ব্রেম্নার ও ইগেন—প্রত্যেকে এক একটি বরফের ঢিবি।

উঠে দাঁড়াই। ঠক ঠক করে কাঁপছি শীতে। শরীর প্রায় অসাড় হয়ে গেছে। চারিদিকে তাকাই। লোকজন সবাই মরে আছে। সব কটি ব্রিগেড বরফে ঢাকা। এলি জ্যাকসন নড়ে ওঠে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় জেকব। হাতের ব্যায়াম শুরু করি আমরা— শূন্যে ঘুষো মারতে থাকি, শরীরের দুই পাশে থাপড় মারি, নাচানাচি লাফালাফি শুরু করি।

একটা অদ্ভুত কথা মনে হয়েছিল আমার। ভাবলাম, সবাই মরে গেছে। আমি বলি।

এলি হাসে। বরফে সাদা হয়ে গেছে তার দাড়ি।

অদ্ভুত লোক তো তুমি! এই কথা মনে হল। জেকব বলে।

আমাদের দলের আর সকলেও জাগে। ঘেঁষাঘেষি করে শুয়েছি আমরা—পরস্পরের দেহের উত্তাপ পেতে চেয়েছি। মস ফুলার কিন্তু তখনও ঘুমোচ্ছে। মোটা স্ত্রীলোকটি জড়িয়ে আছে তাকে।

ঘুমন্ত লোকের পক্ষে স্ত্রীলোক বেশ চমৎকার। মাথা নেড়ে বলে এডওয়ার্ড।

তুষার মাখা দেহ আমাদের। আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করি, সুবিধে হয় না। আগুনের আশা ছেড়ে দিয়ে শুকনো ভুট্টা চিবোতে শুরু করি; নুন মাথা মাংস চিবিয়ে গিলবার মত নরম করে ফেলি। সারাক্ষণ গরম হবার চেষ্টা করছি আমরা। ঘুম ভাঙছে সৈনিকদের। মাঠের সর্বত্র ভাঙা-গলার আওয়াজ শোনা যায়। কদমে ছুটাছুটি করছে সেনানীরা। গরম হবার জন্য সর্বত্র লাফালাফি নাচানাচি করছে সৈনিকরা। দু চারটে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে সারারাত। সেগুলো ভাল করে জ্বালাবার চেষ্টা হচ্ছে এখন।

তাঁবুর মধ্যে যেতে না পারলে সবাই মরে যাব। ভ্যানডিয়ার বলে।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিই। ডলাডলি করে হাত পা গরম করবার চেষ্টা করি। দু একটা রাত এভাবে কাটান যায়, তার বেশী নয়! গরমের জন্য আজকে যেমন আকুপাকু করছি, এমন আগ্রহে কোনদিন কিছু চাইনি।

পেনসিলভানিয়ানদের দলে একটা আগুন দেখিয়ে এলি বলে, দেখি একখানা জলন্ত কাঠ নিয়ে আসা যায় কিনা!

বিউগল বেজে ওঠে—হাতিয়ার তুলে নাও!

এখুনি মার্চ শুরু হবে।

জাহান্নামে যাক!

জাহান্নাম বোধহয় খুব ঠাণ্ডা ; আমার তো তাই মনে হয়! হেসে বলে কেনটন। ঠাণ্ডা লেগে নীলচে ও রাঙা হয়েছে তার মুখ—নাকের ডগার মরা মাংস ফেটে যাচ্ছে। এত কষ্ট কি করে সহ্য করে মানুষ? কি করে সহ্য করছি আমি? অবাক হয়ে যাই। তখনও লাফালাফি করছি। যে করে হোক, গরম হতে হবে। গরম হবার নেশা, যতটা সম্ভব চাঙা হবার নেশা পেয়ে বসে আমাকে।

মসকে জাগাও।

জুতোর মাথা দিয়ে মেয়েটিকে খোঁচা মারে জেকব। বলে, ঢের হয়েছে, এখন খসে পড় জেনি।

মুচকি হাসে চার্লি গ্রীন। গরম হবার জন্য বগলে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে ফোলা ফোলা মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে। পেনসিলভানিয়ানদের দলের দিকে পা টেনে টেনে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় এলি। মনে হয়, প্রতি পদক্ষেপে তার পায়ের তলায় ব্যথা পাচ্ছে। বুঝতে পারছি, আগুনের কাছে যাবার জন্য বদ্ধপরিকর এলি। আগুন সে আনবেই। মিষ্টি কথায় ওদের মন ভেজাবে। কথা বলার একটা বিশিষ্ট ধরণ আছে তার।

আমরা মস ও জেনিকে ঘিরে দাঁড়াই। গা নাড়া দিয়ে হাত ছড়িয়ে দেয় মেয়েটি। প্রচণ্ড শীত গা কামড়ে ধরে; হাত বাড়িয়ে মসকে হাতড়ায় সে। তারপর চীৎকার করে উঠে বসে। কাঁদ কাঁদ সুরে বলে, জমে গেছে!

হেসে ওঠে ভ্যানডিয়ার। চকচকে লাল হয়েছে মেয়েটির নাকের ডগা—সারা মুখে ছড়িয়ে আছে চুলগুলো। মোটা কুৎসিত অশ্লীল সে অবিশ্যি নোংরা ও কুৎসিত আমরা সকলেই। যেভাবেই হোক, এমনি হয়েছি। তবু মেয়েটিকে দেখে আমার ঘৃণা হয়। কারণ, সে সাবেক দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; মনে জাগায় পুরনো দিনের

স্মৃতি। একদিন এমনতর কুৎসিত নচ্ছার মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে আমার।

টেনে তাকে দাঁড় করাই। নোংরা কম্বল ধরে ঝাঁকাঝাঁকি করতে থাকি। আর সবাই লক্ষ্য করছে কি করি আমি। হাঁদার মত হাসছে হেনরি লেন। কিন্তু আর সবাই স্থির চুপচাপ। শুধু দেখছে।

মরে যাব! চেঁচিয়ে ওঠে মেয়েটি।

তখন ছেড়ে দি। ফিসফিস করে বলি, ভাগ!

ঘুরে ঘুরে সে কম্বলখানা ঠিকঠাক করে গায়ে জড়িয়ে নেয়; হাত দিয়ে ঠিক করে নেয় এলোমেলো হলদে চুলের খোপনা। বলে, যা ভাবছ আমি তেমন মেয়ে নই। ভদ্দর ঘরের ভাল মেয়ে, বুঝলে?

আবার হেসে ওঠে ভ্যানডিয়ার। বেঁটে সে। যুদ্ধের আগে পাদরি ছিল। হোয়াইট প্লেইনসে তার দুটি ভাই মারা গেছে। ইদানীং সে এমনি হয়েছে। আমি বুঝতে পারি। চল্লিশের বেশী বয়স তার; তবু সম্প্রতি বালকের মত তরলমতি হয়ে পড়েছে।

ভালয় ভালয় চলে যাও। জেকব ইগেন বলে মেয়েটিকে।

টলতে টলতে চলে যায় মেয়েটি। বারবার পেছন ফিরে চীৎকার করে আমাদের শোনায় যে ভদ্রঘরের ভাল মেয়ে সে। মসের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে জেকব—আস্তে আস্তে তাকে নাড়া দেয়। কাটখোট্টা বদমেজাজি লোক জেকব; তবু মসের কাছে তখন সে মেয়েদের মত কোমল হয়ে পড়ে। আস্তে সে মসের মুখ থেকে চুল সরিয়ে দেয়। দেখি, তার পাতলা দাড়ির পর চাপ চাপ রক্ত জমে আছে। জেকব উঠে দাঁড়ায়। বলে, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। একথা বলবার দরকার নেই। তখন সবাই বুঝতে পেরেছি।

ছেলেটির খোলা চোখে শূন্যদৃষ্টি। ভ্যানডিয়ারের হাসি থেমে যায়। নীচু হয়ে আমি তার পাতলা কোট খুলে ফেলি; ঝুর ঝুর করে তুষার

কণা গড়িয়ে পড়ে। তখন জোর করে তার চোখের উপর হাত দিয়ে চোখ দুটো বুজিয়ে দিই।

খুব পোক্ত লোক না হলে কালকের রাতের মত বেশী রাত সহ্য করতে পারে না। আস্তে আস্তে বলে ব্রেন্নার।

সত্যিই মারা গেছে? আমাকে জিজ্ঞাসা করে জেকব; তারপর কোন্দুলে গলায় বলে, এই সময় এলি গেল কোথায়? এই কি তার দূরে থাকবার সময়?

আগুন আনতে গেছে এলি। বিমর্ষভাবে বলে এডওয়ার্ড।

সে কেন গেল? এখন আগুন দিয়ে কি হবে? খানিক আগে আগুনের দরকার ছিল; কিন্তু এখন আর কি হবে আগুন দিয়ে? এখন আগুন জ্বালালে আর মস ফিরে আসবে না তো!

পেনসিলভানিয়ানদের ভঙ্গিয়ে আগুন আনতে গেছে সে। ওর একটা বিশিষ্ট ধরণ আছে।

খুব হয়েছে, থাম!

চকমকি দিয়ে আগুন জ্বালান যেত না! জলন্ত কাঠ আনতে গেছে এলি। ঠাণ্ডা অসাড় হাতে চকমকি ধরে রাখা যাবে কেন?

এখন এলি এসে কিছুই করতে পারবে না জেকব।

মসের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে জেকব। আমি ফল গাছটার কাছে সরে যাই। গাছটায় ঠেস দিয়ে বসি। শীতে সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসে। কিন্তু মস ফুলার যে হিমানী স্পর্শ অনুভব করছে তার তুলনায় আমার হাড় কাঁপানি শীত কিছুই নয়—অত গভীর নীরব ঠাণ্ডার কাছাকাছিও যেতে পারে না।

ঠিক বলছ, মারা গেছে?

হাঁ। জেকব বলে।

একটানা বিউগল বেজে যাচ্ছে। গোটা লাইনের সর্বত্র সৈনিকেরা

তোড়জোড় করছে রওনা হবার জন্য। আমাদের পূবদিকে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা বন। সূর্য উঁকি মারছে গাছের ফাঁকে। বনের পাশ দিয়ে পাতলা সার দিয়ে লোকজন হেঁটে চলেছে। তাদের গায়ে ভার্জিনিয়ার রাইফেলধারীদের মত বাদামি বেমানান সেমিজের মত জামা। অফিসাররা ঘোড়ায় চড়ে লাফিয়ে চলেছে; হুকুম দিচ্ছে হেঁকে। ছাই-রঙা পাথরের ঘরখানার পেছন থেকে বেরিয়ে আসে ম্যাকলেনের অশ্বারোহী দল—কুচকাওয়াজ করে মাঠ পেরিয়ে যায়। সার বাঁধবার সময় মাসাচুসেটসের লোকজন হাসাহাসি করে সঙ্গিনীদের সঙ্গে।

মারা গেছে! আবার বলে জেকব; ক্লোক দিয়ে ঢেকে দেয় মসের মুখ। আমাকে বলে, সাহায্য কর না আলেন!

উঠে দাঁড়াই। মুখে ভাঙা ডালের ঘষা লাগে। জ্বলন্ত একখানা কাঠ নিয়ে এলি আসছে। অদ্ভুত যোগাড়ে ক্ষমতা এলির। কি করে লোক জপায়?

এখুনি চমৎকার আগুন জ্বালব। হেঁকে বলে এলি।

এগিয়ে এসে সে আমাদের সবাইর মুখের দিকে তাকায়। অবাক হয়ে যায় আমাদের ঐ ভাবে দাঁড়ান দেখে। লাথি মেরে গত রাত্রের আগুনের পর থেকে বরফ সরিয়ে বলে, কুড়াল দিয়ে আরো খান কয়েক ডাল কেটে আন না আলেন। সামান্য খান কয়েক হলেই হয়ে যাবে। বড় ভাল গাছ, দেখো!

আমি নড়িনি। আবার সে বলে, মস এখনও ঘুমোচ্ছে? ডেকে তোল শিগ্‌গির, না হলে চলতে পারবেনা তো!

মস ঘুমোচ্ছে না। আমি বলি।

মারা গেছে। জেকব বলে।—ছেলেটি মারা গেছে এলি!

কালকের রাতে যে বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছিল, সইতে পারবে কেন? বিড়বিড় করে বলে কেনটন।

থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকে এলি। আক্ষেপে মাথা ঝাঁকায়। জলন্ত কাঠখানা পড়ে যায় হাত থেকে। বরফের মধ্যে পড়ে কাঠখানা বারকয়েক দপ্‌দপ্‌ চিটপিট করে নিভে যায়। আগুনটুকু বাঁচাবার জন্য কেউ নড়ে না। মসের কাছে গিয়ে তার মুখের ঢাকনি খোলে এলি। হাঁটু ভেঙে খানিকটা বসে সেখানে। এলির রক্ত মাথা পায়ে বরফ জড়িয়ে আছে। চট করে একটা কথা মনে পড়ে যায়। মসের পায়ে জুতো আছে তো! খুয়ে পাতলা হয়ে গেলেও তা বুট জুতো মাসখানেক আগে মরা এক হেসিয়ানের পা থেকে খুলে বুট জোড়া মসকে দেয় জেকব। কিন্তু এ নিয়ে কথা তুলবে কে, ভেবে পেলাম না। মস মারা গেছে, এখন শুধু তার জুতো জোড়াই কাজে লাগতে পারে—এ কথাটা আমি মেনে নিতে পারিনি।

এলির পায়ের দিকে চেয়ে মনে মনে বলি, জুতো জোড়া এলিকে দেওয়া যাবে। নিজের পায়ের দিকেও তাকাই। ভাবি, এলি তার বয়েস কাল পেরিয়ে এসেছে, এখন হয়ত যে কোনদিন মারা যাবে! কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। পা দুটো পচে খসে গেলেও এলি বাঁচবে। মনে মনে তাকে গালাগালি দিই। কিন্তু তার শক্তির কথা ভেবে গালাগাল দেবার জন্য নিজের পর ঘেন্না হয়।

উঠে দাঁড়ায় এলি; কিন্তু কোন কথা বলে না। আমার দিকে তাকায় সে।

চমৎকার ছেলে ছিল। যেমন লম্বা তেমনি স্বভাব। এডওয়ার্ড ফ্লাগ বলে :—এমন চট করে যে মারা যাবে তা ভাবতেই পারিনি।

যে বেজায় কাশ হয়েছিল!

বাড়ীর কথা ভেবে ভেবেই ম'ল। ভ্যালি-অঞ্চল তো এখান থেকে অনেক দূর, তাই না?

আমরা মাথা নেড়ে সায় দিই। হাত জোড় করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে

থাকি। ক্লার্ক ভ্যানডিয়ার এসে মসের উপর ঝুঁকে দাঁড়ায়। তার ভাবগতি লক্ষ্য করি।

ওর কবরের ব্যবস্থা কর, প্রার্থনা আমি বলব'খন। ভ্যানডিয়ার বলে। মুখ দেখে মনে হয়, এখনও মুখস্থ আছে।

এখানকার মাটিটা বেজায় কড়া। বিড়বিড় করে বলে লেন।

এলি বলে, মাসাচুসেট্সের লোকজনের দলে গিয়ে একটা বিউগল বাজিয়ে ডেকে আন চার্লি।

কিরিচ দিয়ে মাটি খোঁড়া শুরু হয়। আমি কুড়াল নিয়ে কোপাতে শুরু করি। মাটি জমে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। কাজ করতে করতে সহসা থেমে যায় জেকব, তাকায় মসের পায়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনের কথা বুঝতে পারি।

এক ফুট গর্ত খুঁড়তেই আমরা হাঁপিয়ে যাই। গ্রীন গেছে মাসাচু-সেট্সের লোক আনতে। আমরা তার পথ চেয়ে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই ভাবছে। কে জানে, হয়ত এক কথাই ভাবছে সকলে।

অবশেষে জেকব বলে, ছেলেটার পায়ে খাসা এক জোড়া জুতো আছে।

উলঙ্গ করে তো আর কবর দেওয়া যায় না। এলি বলে।—পুরো দুটি বছর এক সঙ্গে কেটেছে; কিছুতেই ওকে উলঙ্গ করে কবর দিতে পারব না।

আমি শুধু বুট জোড়ার কথাই ভাবছিলাম।

না, ওর জুতো ওর পায়েই থাক।

তোমার জুতোর একান্ত দরকার এলি!

বল্লাম তো, ওর জুতো ওর পায়েই থাকবে। ভগবানের দিব্যি জেকব, জুতো খুলবার চেষ্টা কর তো খুন করে ফেলব।

এর মধ্যে রাগারাগির কি আছে এলি? জেকব বলে।—মস মরে

গেছে। ঠাণ্ডা গরম কিছুই সে অনুভব করতে পারবেনা। ওর জুতোর কি দরকার বল? কিন্তু তোমার এক জোড়া না হলেই নয়।

এলি কোন জবাব করে না; মাথা হেঁট করে চেয়ে থাকে মসের দিকে। জেকব এগিয়ে গিয়ে বুট জোড়া খুলে আনে; বারে বারে ফিরে তাকায় এলির দিকে। কিন্তু সে নড়ে না।

আমায় মাফ কর এলি!

ইতিমধ্যে মাসাচুসেট্‌সের বিগ্রেড থেকে বিউগল বাজিয়ে নিয়ে ফিরেছে চার্লি। কৌতূহলবশে একদল বোস্টনের লোক এসেছে তার সঙ্গে। আমরা ধরাধরি করে মসের শব কবরে শুইয়ে দেবার সময় তারা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাসাচুসেট্‌সের একজন বলে, আসছে বসন্তে এ জমি চাষ হবে। গর্তটা তেমন গভীর হয়নি তো!

আমরা তখন মাটি চাপা দিই। ভ্যানডিয়ার সামান্য গুটিকয়েক কথা বলে। আটকে যায় ভ্যানডিয়ারের গলা।

বাড়ী অনেক দূর! এলি বলে।

ভোরের বাতাসে কেঁপে কেঁপে ভেসে যায় বিউগলের আওয়াজ। মসের জায়গায় যদি আমি হতাম তো আমিও এ-ই চাইতাম। ড্রাম বাজিয়ে আছে একজন। সেও বার কয়েক বাজায়। খাসা ব্যবস্থা। সৈনিকদল তখন চলতে শুরু করেছে। তাদের অনেকেই থেমে দেখে যায় কি করছি আমরা। কিন্তু এ এমন নিত্যনৈমিত্তিকার দৃশ্য যে কেউ বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। এগিয়ে যায় সকলে। গোটা পল্টন চলেছে।

মসের কিরিচখানা নিয়ে জেকব তার কবরের মাথায় পুঁতে রাখে। মরচে পড়া বাঁকা কিরিচখানি। কোন কাজেই লাগবে না। মাস্কেটটা আমরা মাসাচুসেট্‌সের একটা লোককে দিয়ে দিই। তাদের অনেকেরই কোন হাতিয়ার নেই।

মাসাচুসেট্সের ব্রিগেডগুলো চলতে শুরু করে। ক্রমে দূরে সরে যায় তারা। আমরা কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকি। ওয়াশিংটন এবং তার পার্শ্বচরগণ বেরিয়ে আসে পাথুরে বাড়ীর ভেতর থেকে। ঘোড়ায় চড়ে তারা কদমে ছুটে যায় পল্টনের সামনে।

হেঁটে রাস্তায় পড়ি আমরা।

আজকে লম্বা মার্চ করতে হবে। লেন বলে।

ফোর্জ উপত্যকা নামের কোন জায়গার কথা মনে পড়ছে না তো!

লোহার কারখানা হবে হয়ত। জায়গাটা লোহার খনি অঞ্চলের মত।

জায়গাটা শুয়েলকিলের উপর।

দক্ষিণে মার্চ করবার মতলব থাকে তো উত্তরে যাচ্ছি কেন?

শুনলাম, ব্রিটিশদের খোঁচাবার এক নতুন কায়দা বার করা হয়েছে।

একে যদি পল্টন মনে করে তো আস্ত বোকা সে।

সহসা ক্লার্ক বলে ওঠে, মস কোথায়? ভুলে গেছে।

আবার রাস্তা দিয়ে চলেছি আমরা। রোদে আয়নার মত চকমক করছে বরফ। একটু বাদেই চোখ বেঁধে দিতে পারে।

আস্তে আস্তে চলেছে গোটা পল্টন। তবু চলেছে তো। কিসের জন্য চলেছি বুঝে উঠতে পারি না। ছয় মাইল ছড়ান এই ভিক্ষুকের এক-সুরে-বাঁধা প্রাণের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি বলে মনে হয়।

পেনসিলভানিয়ার লোকজনের পেছু পেছু চলেছি আমরা। আমাদের পেছনে মাসাচুসেটসের ব্রিগেডগুলো। বারোখানা কাঠের ওয়াগন আমাদের পাশ কাটিয়ে যায়। ভেতরে স্ত্রীলোকদের কোলাহল শুনতে পাই। পুরুষের সমান সমান বারবনিতা জুটেছে পল্টনে। ক্যানভাসের পর্দা ফাঁক করে একটি স্ত্রীলোক মাথা বার করে—জিভ দেখায় দাঁত ফাঁক করে।

এসো না মেয়ে, আমাদের সঙ্গেই হেঁটে যাবে'খন! হেঁকে বলে চার্লি গ্রীন।

বেশ খুবসুরৎ খানকি তো! মাথা নেড়ে বলে এডওয়ার্ড।

একটানা হেঁটে চলেছি। মসের কথা আর মনে পড়ছে না। তার কথা ভেবে কোন লাভও নেই। আমরা সকলেই তো তার কাছাকাছি পৌঁছেছি। জীবিত ও মৃতের ব্যবধান বড় সংকীর্ণ।

গান গাইছে মাসাচুসেট্‌সের লোকেরা। আমরাও যোগ দিই। মাইলের পর মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে গানের সুর। কেঁপে উঠছে লাইন :

টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে
ইয়াংকি বাবু গেলেন লণ্ডনে······

—তিন—

এতক্ষণে পৌঁছান গেছে। মনে হয় আর যেতে হবে না। জানি বিশ্রামের অবসর নেই। কথাটা অস্পষ্ট মনে হয় আমার। তবু বেশ অনুভব করতে পারি—বিশ্রাম নেই।

এলি জ্যাকসন বলে কথাটা। জোয়ান গর্বিত একটা লোককে তিলে তিলে মরতে দেখা সত্যিই মর্মান্তিক। এলি বলে, দক্ষিণে মার্চ করা হবে না। ভারি অদ্ভুত লোক ঐ ড্যানিয়াল বুন। কি করে যে এতটা পথ গেল! আমরা কিন্তু তার বুনো পথ ধরে ট্রান্সসিলভানিয়া যাচ্ছিনে। এখন আমাদের পল্টন বলা যায় না।

কেমন অবসন্ন লাগছে। আমি আর মার্চ করতে পারব না। আমি বলি।

কেনটন বলে, এখানে ঘাঁটি করে ব্রিটিশদের সঙ্গে মোকাবিলা করা উচিত। ব্রিডস পাহাড়ের কথা মনে পড়ে আমার। লাল কোটের কি চেকনাই। মনে রাখবার মত সাচ্চা মানুষ ওরা। মস্ কেঁদে ফেলেছিল। মাত্র ষোল বছর বয়স ছিল তার।

অমন দৃশ্য ওর মত বালকে সইতে পারবে কেন? এলি বলে।—তোপে টুকরো হয়ে উড়ে যাচ্ছে, তবু যেভাবে ওরা পাহাড়ের পর মার্চ করে এগোয় তা দেখে তাজ্জব হতে হয়। আমার বেশ মনে আছে, এক ছোকরা রণভেরী বাজাচ্ছিল ব্রিটিশ পক্ষে। ছেলেটির পেটে গুলী লাগে, তবু সে বাজাবার চেষ্টা করছিল। নেহাৎ নাবালক···

এ ব্রিডস্ পাহাড়ের ঘটনা। লোকে এখন তাকে বাঙ্কার পাহাড় বলে ডাকে।

মসের মত বালক ছেলেটি। এলি বলে যায়।—এই দৃশ্য দেখে মস মুষড়ে পড়ে। এত বয়স কম ছিল তার!

আমরা আগুনের চারপাশে বসি। বেশ জোরাল আগুন জ্বালান হয়েছে এবার। কিন্তু এ আগুনের তাতেও শীত কমে না। আমাদের অস্থিমজ্জায় শীত ঢুকেছে। তার দাপটে আগুনের শিখাও নিস্তেজ হয়ে যায়।

পাহাড়ের মাথায় ছাউনি ফেলেছি আমরা। একপাশে জঙ্গল, অপর দিকে মেঠো জমি। পাহাড়ের সর্বত্র এবং নীচে উপত্যকার মধ্যেও আগুন জ্বলছে। পশ্চিমে একটা খাঁড়ির মধ্যে উপত্যকাটি শুয়েলকিল নদীতে মিশেছে। স্থানটির নাম ভ্যালি ফোর্জ। খাড়িটি যেখানে নদীতে মিশেছে, একসময় সেখানে কিছু সৈন্য মোতায়েন ছিল; ঘরদোরও কিছু কিছু আছে। শোনা যায়, সেনানীরা নাকি সেইসব ঘরে বাসা বাঁধছে।

পূবে গড়ানে মাঠটি পেরিয়ে আঠারো বিশ মাইল দূরে ফিলাডেলফিয়া

শহর। বার বার আমরা তাকাই ফিলাডেলফিয়ার দিকে। কেতা দুরস্ত উর্দিপরা এক ব্রিটিশ বাহিনীর কথা ভাববার চেষ্টা করি। গরম ঘরে ঘুমোচ্ছে তারা—শুঁড়িখানায় জমায়েত হয়ে 'টোসট্' করছে মনের অনন্দে। ফিলাডেলফিয়া শহর মায় তার ঘর দোর নরনারী ও আরামের বিছানা সবই আজ তাদের।

মনে ভাবি এইখানেই শেষ হবে, আর যেতে হবে না দূরে কোথাও।

ক্লার্ক ভ্যানডিয়ার ঘাড়ঝাঁকানি দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে। আগুনের এত কাছে সে গুটিসুটি মেরে বসে যে দাড়ি ঝলসে যাচ্ছে। তাও সে টের পাচ্ছে বলে মনে হয় না। মসের মৃত্যুর পর রীতিমত বুড়িয়ে গেছে ক্লার্ক, সাবেক পাদরি জীবনের হালচাল দেখা দিয়েছে নতুন করে।

আমার শঙ্কা হয় কিন্তু। এডওয়ার্ড বলে। এইটেই তার ধরণ। এক সময় বেশ পালোয়ান ভারিভুরি কৃষক ছিল সে। কোন স্বপ্নবিলাসও ছিল না, কাউকে পরোয়াও করত না।

এলি জ্যাকসন মাথা ঝাঁকায়।

আচ্ছা, কালকে আবার যদি মার্চ করবার হুকুম আসে? উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করে এডওয়ার্ড।

সবাইর মুখে একই শঙ্কার ছাপ। যদি আবার মার্চ করতে হয়? বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমরা; এতটুকু শক্তি নেই মার্চ করবার। এখান থেকে খসে পড়বার পথ বাতলাবার চেষ্টা করি। পাহাড়ের ঢালু গা বরফে ঢাকা—চিকচিক করছে চাঁদের আলোয়। আগুনের আরও কাছ ঘেঁষে বসি ঘেঁষাঘেষি করে।

আমাদের নীচে পেনসিলভানিয়ার লোকজন মস্ত একটা বৃত্তের মত আগুন জ্বালিয়েছে। প্রতিটি আগুন শিখাহীন জ্বলন্ত আঙার। আধ-বোজা চোখে তাদের ছাউনিকে রাজমুকুট বলে ভ্রম হয়। ক্ষিদের

চোটে আমার মনে হরেকরকম আজগুবি কল্পনা ভীড় করে। জেকব রসদখানা খুঁজে বার করে সন্ধ্যার পর। আটজনের জন্য এক টুপি ভুট্টা নিয়ে ফেরে সে। রক্ত ঝরছে তার গা থেকে।
রক্ত ঝরাতে তোমার এক মিনিটও লাগে না। মোলায়েমভাবে এলি বলে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা চুপ করে থাকে জেকব। অদ্ভুত ধরণের গম্ভীর প্রকৃতির লোক—কঠোর। নাবালক বয়সে সে ফরাসী যুদ্ধে লড়েছে। তখনই সে পুরোদস্তুর বিপ্লবী—দ্বিধা দ্বন্দ্বের বালাই চুকিয়ে ফেলেছে। তার মতে, ফরাসী যুদ্ধেই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। তার পর থেকে একই জিনিস চলেছে। প্রথমে ফরাসীদের হাঁকাও, তারপর ব্রিটিশদের। জনতার রাজ্য গড়তে হবে। এই কথাই প্রচার করে জেকব: সব কিছু জনগণের জন্য। ইণ্ডিয়ানদেরও হটাতে হবে। কিন্তু তার আগে প্রথম ফরাসীদের তার পর ইংরেজদের হটান দরকার। ওদের দুজনেই ইণ্ডিয়ানদের দিয়ে খেলিয়েছে—তাদের লাগিয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে। ফরাসীদের উৎখাত করবার জন্য লড়েছে সে; এখন লড়ছে ব্রিটিশদের ধ্বংস করবার জন্য। চিরকাল সে লড়াই করবে। যতদিন গুলীর আঘাতে ধরাশায়ী না হয় ততদিন লড়াই করবে জেকব। এ মাটি কোনদিনই তার হবে না।

এলি বলে, আমার এখনও মনে পড়ে, বাড়ীর কত কথা বলত মস। শুনলাম, ম্যারিল্যাণ্ডের চার চারটি ব্রিগেড নাকি কিরিচ উঁচিয়ে পল্টন ছেড়ে গেছে।

এই তো সবে শুরু!

ম্যারিল্যাণ্ডের ব্যাটারা বেহদ্দ পাজী। যত চোর বদমাসের বাচ্চা! বিড়বিড় করে বলে জেকব।

এই তো সবে শুরু। আমি বলি।—খান খান হয়ে যাচ্ছে পল্টন।

উঃ! আমাদের উপোসী রেখে কংগ্রেসের পেটমোটা কর্তাদের যুক্তরাষ্ট্র গড়ার কথা যখন ভাবি! ম্যারিল্যাণ্ডের জন্ত লড়ছি আমরা আর তারা অক্লেশে বাড়ী চলে গেল! আজ সকালে মস প্রাণ দিল কিসের জন্ত?

তাকে শান্তিতে থাকতে দাও। ভ্যানডিয়ার বলে।

মোহকের কথা বলছিল সে।

পল্টন ছেড়ে কোথায় যাবে আলেন? আমরা সবাই খতম হয়ে গেছি। এলি বলে।

ভয় হয়?

ভয় আমার হয়না। এলি বলে। আমার দিকে তাকায় সে। তার ফোলা পা আগুনের দিকে ছড়ান। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে হাত সেঁকছে। এলির কালো চোখের শান্ত দৃষ্টির আয়নায় আমার অন্তর ধরা পড়ে।

ক্ষুব্ধভাবে ভ্যানডিয়ার বলে ওঠে: না না এলি, আর আস্থা রাখা যায় না। ভার্জিনিয়ার লোকজন যতদিন বোস্টনের লোকদের ঘৃণা করবে—যতদিন অবিশ্বাস ও ঘৃণা করবে নিউ ইয়র্কের সৈনিকদের, ততদিন শান্তির আশা নেই। আমরা জিতলেও শান্তি আসবে না— নতুন করে লড়াই শুরু হবে।

এলি কোন জবাব দেয় না। জেকব তার কালো উসকো খুসকো মাথা তোলে। আমাদের উপরে বনের কাছাকাছি নিউ জার্সির সৈনিকদের ছাউনি থেকে গানের সুর ভেসে আসে। করুণ এক ওলন্দাজ সুরে গাইছে তারা। আমি শুয়ে পড়ি; চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করি। কেনটন তখনও বকে যাচ্ছে। একশোবার যে কথা শুনেছি, সেই কথাই বলছে সে। বোঝাচ্ছে কি করে নিউ ইয়র্ক ভ্যালিতে পল্টন পাঠিয়ে ছয় জাতিকে ধ্বংস করা যায়। ইণ্ডিয়ানদের শায়েস্তা করবার সুযোগ ইংলণ্ড যে কেন দেবে না, নতুন করে সেই কথাই বলছে সে।

যেদিন আমরা সবল হব, সেইদিনই আমরা জাতিত্ব পাব। কেনটন বলে।

এ আমাদের বিধিলিপি। জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্পর্কে—অনেক তত্ত্বকথা শোনায় সে। কিন্তু পরাভূত এক জনতার কাছে কি মূল্য তার ?

জেকবও যোগ দেয় আলোচনায়। উসকো খুসকো মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁঝাল গলায় বলে, তুমি ঠিকই বলেছ কেনটু। আমাদের বল এইখানে—বহুর বলই আমাদের বল। ভেবে ভাখ, যে মোহকে ওরা খুনখারাবি করছে কি ঘর জ্বালাচ্ছে, সেখানে ফিরে যেতে পারতাম আমরা। কে মরেছে, কে বেঁচে আছে ভগবানই জানেন। কিন্তু আমাদের বল এইখানে। ইণ্ডিয়ানরা ব্রিটিশদের পর নির্ভর করে; কাজেই বেজন্মা রাজার লোকেদের সঙ্গে লড়ছি আমরা। বিশ্রামের পর আর একটি মাত্র আঘাত দরকার। বল সঞ্চয় করে আঘাত করব আমরা—জোরসে আর এক আঘাত হানব।

কোর্টটা মুখের পর টেনে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করি। একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, জেনি সহ ছোট মস ফুলারের কথা। হি হি করে হাড়ে কাঁপ ধরেছে শীতে। কাত ফিরে শুই। চোখ মেলে চাই আকাশের দিকে। চোখে ধরা পড়ে নক্ষত্রের অনন্ত বিস্তার। ক্ষিদের জ্বালায় পেট কাঁথা করছে। মনে মনে বলি, ঘুমোও আর ভেব না।

ভার্জিনিয়ার সৈনিকদের সহায়তায় এই ওয়াশিংটন লোকটা যদি রাজা হয়ে বসে।

লোকটাকে ভুল বুঝেছ। এলি বলে।

শেষ রাত্রে নক্ষত্রগুলো ফুলকির মত দেখায়। জেগে রাত কাটিয়ে দি। চেয়ে চেয়ে দেখি ভোর হয়ে আসছে। তখনও আগুন জ্বলছে, নিভু

নিভু হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে ঝিম এসেছে আমার। বড্ড লম্বা রাত। রাতগুলো এত দীর্ঘ হয়েছে কেন? গড়িয়ে আগুনের আরও কাছে গিয়ে বুঝতে পারি, কে যেন রাতে আগুনে কাঠ দিয়েছে। কে দিয়েছে? মনে হয়, এলি কেনটন কি আর কেউ হবে হয়ত। আল-বেনিকে মুদ্রাপক ছিল চালি গ্রীন। অনেকদিন সে মিশতে পারেনি, অচেনা পরদেশীর মত রয়েছে। প্রথমে বেশ নাদুসনুদুস ছিল, কিন্তু এখন সে চবি নেই। এডওয়ার্ড ফ্লাগ চাষীর ছেলে। জেকবও এলি দৃঢ়চেতা কিন্তু আলাদা প্রকৃতির। এদের যে কেউ রাত্রে আগুনে কাঠ যোগান দিয়েছে। এই প্রচণ্ড শীতে প্রচুর আত্মত্যাগ করতে হয়েছে তাকে।

আমি উঠে দাঁড়াই। আর সবাই ঘুমোচ্ছে তখনও। গরম হবার জন্য কুঁকড়ে আছে। ছেঁড়া ন্যাকড়ার বাণ্ডিলের মত দেখাচ্ছে ওদের। মনে পড়ে বহু বছর আগে একটা লোককে কাশিতে মরতে দেখেছিলাম। এরা বেঁচে আছে, তবু সেই কঙ্কালসার লোকটির মতই এদের চেহারা। কাঠ আনবার জন্য আমি বনের দিকে যাই। তুষার কণার উপর বরফের পরদা পড়েছে, চুরমুর করে উঠছে আমার পায়ের চাপে। ভোর হয়ে আসে তবু সূর্য ওঠবার কোন লক্ষণ নেই। পূব আকাশে একটা তুলোর মত সাদাটে ভাব। বরফ পরার লক্ষণও হতে পারে।

বনের সামনে জার্সির সৈনিকেরা শুয়ে আছে। আগুনের চার পাশে ছড়িয়ে আছে লোকজন। সান্ত্রীও মোতায়ন করেছে। তারাও ঘুমোচ্ছে এখন—গুটিসুটি মেরে আছে মাস্কেট জড়িয়ে। পাশ দিয়ে চলে যাই কিন্তু সান্ত্রীরা তবুও নড়ে না। জার্সির লোকেদের অবস্থা আমাদের চাইতেও খারাপ। খালি পা ও ছেঁড়া কোটের ফাঁকে তাদের গায়ের চামড়া দেখা যায়। কম্বল নেই বল্লেই হয়। তাঁবু আছে মাত্র দুটি। তবু মুখ বুজে আছে, অনুযোগ অভিযোগের

ধার ধারে না। ওলন্দাজ রক্ত তাদের গায়ে। পেনসিলভানিয়ার জার্মানদের মত নয়।

কাঠ সংগ্রহ করে আমি ফিরে আসি। আগুন জ্বালাই ভাল করে। আগুনের তাতে জেকব ও হেনরির ঘুম ভেঙে যায়। তারপর পেনসিলভানিয়ানদের বিউগলের শব্দে ভোরের আকাশ কেঁপে উঠে। এখনকার দৃশ্য মামুলি: একদল ভিখারীর ঘুম ভাঙছে—শীত তাড়াবার জন্য ছুটাছুটি হাঁটাহাটি করছে সকলে। আবার জড়ো হচ্ছে সৈনিকেরা।

কুচকাওয়াজ হবে আজ জেকব বলে।—ঝাণ্ডা নিয়ে প্যারেড হবে।

পা ছড়িয়ে গান ধরে চালি—ভিখারীরা আসছে লণ্ডন শহরে…

তাহলে একটা ঝাণ্ডা চাই যে আমাদের!

হাঁ, ঝলসান শূয়োরের ছবি আঁকা মস্ত একটা ঝাণ্ডা দরকার।

কোন খাদ্য নেই আমাদের। খাড়া হয়ে আগুনের দিকে চেয়ে থাকি। এক মুঠো বরফ নিয়ে চিবোয় ফ্লাগ।

আমি খাচ্ছি নে। এলি বলে।—মুখ পেট পুড়ে যাবে বরফে।

জার্সির লোকেরা খাচ্ছে। আমি বলি।—তাদের আগুনের পর গোটা কয়েক ক্যাম্পের কেতলি বসান দেখলাম।

রসদখানায় যাচ্ছি আমি। এলি বলে।

কিন্তু ওরা অফিসারের সই-করা কাগজ চায় যে!

হোঁচট খেতে খেতে চলে যায় এলি।—মসের জুতো ও কিছুতেই পরবে না। আমি বলি।—ওর পায়ের কাজ সারা হয়েছে, এখন জুতোর মধ্যে ভরাও যাবে না।

মসের সঙ্গে সঙ্গে ভাল একটা কোট কবরে গেল। মরা মানুষের তো আর ঠাণ্ডা লাগে না!

জুতো জোড়া নষ্ট করা উচিত হবে না। চাপা গলায় বলি। বসে

আগুনের দিকে পা তুলে আমি পট্টি খুলতে থাকি। পট্টি খোলা শেষ হয়; নীল হয়ে গেছে পা দুটো। আগুনের সামনে পা ছড়িয়ে অসাড় পা দুটো গরম করবার চেষ্টা করি। সারা পায়ে ক্ষত, কাঁচা ঘা আর নোংরা।

বরফ দিয়ে ঘষে ফেল আলেন।

হেসে বল্লাম, আবার ঠাণ্ডা করবার আগেই পচে যাবে।

ভ্যান ডিয়ার বলে, বিশপ বার্কলির বইয়ের একটা অংশ মনে পড়ছে। চমৎকার দার্শনিক লোকটা। তার মতে, ব্যথা ও সমস্ত পার্থিব জিনিস মনের অনুভূতি মাত্র। মনে না করলে আর অস্তিত্ব থাকে না।

মস মারা গেছে, কিন্তু আমরা রয়েছি এখানে। মড়ার মত আমিও কাঠ হয়ে পড়ে থাকব।

মসের গায়ে ঠাণ্ডা লাগছে না। আমি বলি।—জুতোটার জন্য লটারি করা যাক, কি বল জেকব!

ও আমার পায়ে খাটবে না। গোমরা মুখে বলে এডওয়ার্ড। বিরাট চেহারা তার। যেমন বড় হাত, তেমনি পা। অত বড় হাত-পা জীবনে দেখিনি।

কেনটন এক জোড়া জুয়ার ঘুঁটি বার করে এবং বরফের পর গড়িয়ে দেয়। ডবল ছয় পড়ে, হেনরিই পায় জুতো জোড়া। হাঁটুর মধ্যে নিয়ে জুতো জোড়া আদর করে সে···পরীক্ষা করে দেখে কত নরম। তারপর সে পায়ের পট্টি খুলতে শুরু করে। ব্যাণ্ডেজ পায়ে আটকে যায়। বলে, আটদিন পরে পায়ের পট্টি খুলছি। পট্টি খুলে যখন মোজা বেরিয়ে পড়ে, দেখা যায় চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে আছে মোজায়। তার পাও ফুলে ঢোল হয়েছে।

আমরা জোরাজুরি করে তার পায়ে জুতো পরাবার চেষ্টা করি। পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে হেনরি···যন্ত্রণায় হাত মুঠ করে।

সামান্য কিছু তামাক আছে আমার কাছে। এক টুকরো ছিঁড়ে দিয়ে জুতো পরাবার সময় চিবোতে বলি। তামাকটুকু মুখের মধ্যে পুরে জোরে জোরে চিবোয় হেনরি···তামাকের কালচে লালা গড়িয়ে পড়ে দাড়িতে। যন্ত্রণায় বারে বারে মুখ ভ্যাঙচায় হেনরি।

জুতো পরাবার পরেও সে উঠবার চেষ্টা করেনি। ফিসফিস করে বলে, এ আমি সইতে পারব না। খুলে নাও।

আবার হেনরির পা বেঁধে দেওয়া হয়। পা দুটো ধুইয়ে দিতে বলে জেকব; কিন্তু হেনরি রাজী হয়নি। আমারও জুতো জোড়ার পর লোভ আছে। আবারও ঘুঁটি ফেলা হয়। এবার পায় কেনটন। কেনটনকে বল্লাম যে এর জন্য লড়াই করব। সোজা কথায় বল্লাম যে তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বুটের জন্য লড়াই করব।

জেকব আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। বলে, মাথা খারাপ করছ কেন আলেন?

ও মসের জুতো। আমি বলি।—মস কোথায় এখন?

মাটিতে বসে আমি দুহাতে মাথা গুঁজে থাকি। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, মাথাটাও হালকা লাগছে। নিজেকে বেশ শক্তিমান বলে মনে হয়। মনে হয়, শুধু কেনটন কেন, আর সবার সঙ্গেও লড়তে পারি। আরও মনে হয়, অনায়াসে লম্বা লম্বা পা ফেলে হন হন করে হাঁটতে পারি।

তারপর কাঁদতে শুরু করি। আপনা থেকেই কান্না আসে। মুখ ঢেকে রাখি দু'হাত দিয়ে। চোখ তুলে দেখি, ওরা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। স্পষ্ট দেখলাম, ক্লার্ক ভ্যানডিয়ারের অধর কাঁপছে। বেঁটে খাটো লোক সে, সন্তানসন্ততি আছে নিজের। কে জানে, হয়ত নিজের সন্তানের কথাই মনে পড়েছে।

কেঁদ না আলেন, শান্ত হও! জেকব বলে।

কেনটন তখনও বুট জোড়া হাতে করে আছে। চাপা গলায় বলে, জুতোর আমার দরকার নেই আলেন।

আমি চেঁচিয়ে উঠি।—জানি কি ভাবছ তুমি। ভাবছ, এইবার আমার পালা। মসের পরে আমি।

আমরা এখুনি খেতে পাব আলেন।

মস বাড়ী যেতে চেয়েছিল। পল্টন ছেড়ে বাড়ী যাবার হিম্মত তোমাদের কারও নেই। ওঃ যীশু খ্রীস্ট, আমার পেটে কিছুই নেই!

এলি এগিয়ে আসে। তাকে দেখে ওরা সরে যায়। শুধু কেনটন তখনও দাঁড়িয়ে থাকে বুট হাতে। মিয়ানো গলায় বলে, মসের জুতোর জন্য জুয়ার ঘুঁটি ফেলেছিলাম আমরা।

এলি কোন জবাব দেয় না। তার হাতে এক টুকরো মাংস।

খাবার এনেছ? মাথা নেড়ে বলে জেকব।—তুমি অদ্ভুত লোক। আস্তে আস্তে পেছনে সরে গিয়ে কেনটন ও এলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বলে, জুতোর জন্য রাগ করোনি তো এলি?

রসদখানায় তুমুল কাণ্ড হবে। খুনখারাবিও হতে পারে। দশ হাজার লোক খাওয়াবার মত খাবার নেই। আমার কাছে কাগজ পত্তর চেয়েছিল; কিন্তু কোনমতে এই খাবারটুকু বার করে এনেছি। এক রেজিমেণ্টের জন্য চেয়েছিলাম। মনে হয়, সামান্যই খাদ্য আছে। বন্দুকে গুলি ভরে বোস্টন ও পেনসিলভানিয়ার লোকজন গেছে সেখানে।

পেনসিলভানিয়ানদের দেখতে পারি না। জেকব বলে।—কিন্তু খাবারের পর ভার্জিনিয়ানদের মুরুব্বিয়ানাও ঘৃণা করি।

বেশ চুপচাপ অদ্ভুত লোক ওরা।

আমি উঠে দূরে সরে যাই। ভেতরে ভেতরে হাঁপাচ্ছি। গলা জ্বলে যাচ্ছে। আগুনের কাছ থেকে সরে গেলে পাতলা জামা ভেদ

করে শীত যেন গা' কামড়ে ধরে। এলির ভাবসাবে চটে গেছি। আমায় কি জুতোর সম্পর্কে কিছুই বল্ল না! ফিরে দেখি, কেতলির পাশে জটলা করে ওরা মাংস কাটছে। সামান্য কিছু ভুট্টার গুঁড়ো আছে জেকবের কাছে; সেই শেষ সম্বলটুকুও সে ঢেলে দেয় কেতলির মধ্যে। সৈন্যদল তখন নড়াচড়া করছে—ভীড় করছে বনের চারপাশে আর পাহাড়ের শেষ প্রান্তে।

আগুনের কাছে ফিরে আসি; হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে নেয় এলি। নীরবে চটপঠ খাওয়া শেষ করা হয়। মাস্কেট তুলে নিয়ে সযত্নে মুছেনি। এ নেহাৎ অভ্যাস। বন্দুকের পর কোন দরদই নেই আমাদের। ব্রিগেডগুলোর সঙ্গে হেঁটে চলেছি—চলেছি মাসাচুসেটস্ ও ভারমণ্টের লোক, পেনসিলভানিয়ান ও লম্বা পাতলা-চুল জার্সির ওলন্দাজদের সঙ্গে। যেখানে ছাউনি ফেলা হয়েছে সবারই মুখেই তার প্রশংসা—স্থানটির রক্ষা ব্যবস্থার সুবিধার কথা। ফোর্জ উপত্যকার চতুর্দিকে পাহাড়ের বেড়া। প্রাকৃতিক দুর্গ বল্লেই হয়।

একজন বলছে, ফিলাডেলফিয়ার পথে যদি আক্রমণ করে তো আবার ব্রিডস্ পাহাড়ের পুনরাবৃত্তি হবে। লোকটি ভুলে গেছে, বাংকার পাহাড়ের যুদ্ধের সময় সবে যুদ্ধে নেমেছি আমরা। সেই থেকে আর কোন যুদ্ধেই আমাদের জয় হয়নি।

আমাদের চলা-চলতির মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নেই। মাঝে মাঝে দু একটি অফিসারের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তবু অধিকাংশ সময় সৈনিকেরা খেয়াল খুশি মত চলাফেরা করছে। অফিসারদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মেছে সৈনিক মহলে। তারাও সর্বদাই শঙ্কিত। সংগঠিত পল্টনের সব চিহ্নই লোপ পেয়েছে। বহু সপ্তাহ মাইনে পাইনি আমরা; খাবারও জুটছে না। যেখানে রয়েছি সেই জায়গা ও বাড়ীর মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান। মাঝখানে বিস্তীর্ণ ঠাণ্ডা অঞ্চল। মনে হয়, শুধু

এই শঙ্কাতেই এখনও একত্র রয়েছি। শোনা যায়, ব্রিটিশ টহলদার আংটির মত ঘিরে রেখেছে আমাদের।

বনের চার পাশে ও পাহাড়ের উপর ঘোরাঘুরি করে উত্তর মুখো এগিয়ে আমরা এক বিস্তীর্ণ খোলা মেঠো জমির মধ্যে নামি। শুয়েলকিল পর্যন্ত বিস্তৃত এই মাঠ। পরে এইটেই 'গ্রাণ্ড প্যারেড' নামে পরিচিত হয়। স্রোতের মত মাঠের মধ্যে নামছে সৈন্যদল আস্তে আস্তে। মোটামুটি একটা শৃঙ্খলার ভাব দেখা দেয়। পেনসিলভানিয়ার লাইন উত্তরে, তারপর নিউ জার্সির লাইন, নিউ ইয়র্কের লাইন এবং ভার্জিনিয়ার রাইফেলধারীরা।

মাঠের চারপাশে কিছু কিছু লোক জমে। পাশাপাশির বসিন্দা এরা। অধিকাংশই কোয়েকার। সৈনিকদের টিটকারি দিচ্ছে। ম্যাসাচুসেটস্ ও পেনসিলভানিয়ার ব্রিগেডে তখনও ড্রাম বাজিয়ে আছে। ক্রমে তাদের বাজনা জমে ওঠে···ড্রাম বাজনার তালে তালে চলতে শুরু করি। পুরনো অভ্যাস সহজে যাবার নয়।

পেনসিলভানিয়ার লাইনের এক প্রান্তে নিউ ইয়র্কের সৈন্যদলের কাছাকাছি আমরা আটজন দাঁড়াই। মাস্কেটে ভর করে থাকি। কারও মুখে বিশেষ কথা নেই। সৈন্যদলের সামনের ও পিছনের সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে আসে।

সহসা মেয়েদের কণ্ঠস্বর কানে আসে। দেখি, পেনসিলভানিয়ার লাইন থেকে মেয়েদের তাড়াচ্ছে ফৌজদাররা। সৈন্যদলের পশ্চাতে ভীড় করে দাঁড়ায় শিবির সঙ্গিনীদল। মেয়েদের উপস্থিতি এক করুণ বৈচিত্র সৃষ্টি করে!

হাজার খানেক মেয়ে হবে। জেকব বলে।

পুরুষের কাছাকাছি থাকতে মেয়েরা যে কি না করতে পারে, বোঝা দুষ্কর।

আকাশে মেঘ জমে। কালো পাণ্ডুর ও সাদা মেঘের ভীড়। একটি গোলন্দাজ ব্যাটারি ঘড় ঘড় শব্দে প্যারেডের মাঠ পার হয়ে যায়।

নক্সের কামান। এলি বলে।

মাঠে তখন প্রায় হাজার দশেক লোক। পাইকারি দলত্যাগের ফলে আমাদের সংখ্যা এর অর্দ্ধেক কি তারও কম হয়ে যায়। তার আগে গুনতিতে আমরা এই রকমই ছিলাম।

চোখ বুজে আমি এদের পল্টন হিসাবে কল্পনা করবার চেষ্টা করি। বোজা চোখে তুষার-জমা পাতার ফাঁক দিয়ে যদি এদের কথা ভাবা যায়, তাহলে অনায়াসেই ভুলে যেতে পারি যে অর্দ্ধেকের রাইফেল নেই আর সবাইর পোশাক শতছিন্ন। ভাজিনিয়ার সৈনিক ছাড়া উর্দি নেই কারও গায়ে। তাদের পরণে তাঁতে-বোনা বাদামি শিকার করবার শার্ট। ভাল একটা কোট কি ভাল এক জোড়া জুতো নেই কারও। প্রায় সকলেরই শরীরের কোন না কোন অংশ দেখা যায়। যাদের প্যাণ্ট ছিঁড়েছে তাদের নীলচে পাছা কি হাঁটু দেখা যাচ্ছে···পায়ে কম্বলের টুকরো বাঁধা···পায়ের পাতা ঢাকা হয়েছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে। পা দুটোই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। সৈন্যদল যদি লড়াই করতে নাও পারে, তবু মার্চ করবার সামর্থ্য তাদের থাকা চাই···চাই দিবারাত্র কি চিরকাল চলবার ক্ষমতা।

কিন্তু এখন যদি চোখ বুজি তো চোখের সামনে ভেসে ওঠে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দাড়িওলা এক পল্টনের ছবি। বড় জোর বুনো জন্তুর মত লড়াই করতে পারে এরা। আবার শঙ্কা হয়, আর কোন দিনই হয়ত আমরা লড়াই করব না। উচ্চস্বরে হেসে উঠি। এলি আমার দিকে তাকায়। কেনটন বলে, মসের জুতোর জন্য রাগ করনি তো আলেন? বহুদিন এক সাথে আছি, নিজেদের মধ্যে রাগারাগি করা সাজেনা আলেন! ভগবানের নামে হলপ করে বলছি, ও জুতো আমি পরব না।

ঠিক আছে!

হাতিয়ার তুলে নেবার আহ্বান জানিয়ে তূর্যধ্বনি হয়। মাস্কেট তুলে নেয় সৈনিকরা। পলকের জন্য মনে হয়, আমরা মানুষ নই···এক জীবন্ত বিপ্লবের অংশ···অপরাজেয় আমাদের শক্তি। মনে হয়, মানুষের বাইরে আমরা। কিন্তু এ অনুভূতি ক্ষণিকের। সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে। আবার ফিরে আসে শীত ও ক্ষুধার অনুভূতি।

পেনসিলভানিয়ার একজন বলে, গোল্লায় যাক প্যারেড। আমাদের মাইনে দিচ্ছে না কেন?

ওয়েন ও স্কট পেনসিলভানিয়ার লাইনের সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যায়। ওয়েনের মাথায় একখণ্ড কাপড় বাঁধা। ব্যবহারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তার কোট। সামনে ঝুঁকে স্কটের পাশাপাশি চলছেন। পেনসিলভানিয়ার সৈন্যদলে চাপা উল্লাস দেখা দেয়। দুজনকেই ভালবাসে এরা। কিন্তু ওদের কেউ সেদিকে লক্ষ্য করে না। ঘোড়া নিয়ে সৈন্য দলের সামনে দাঁড়ায়।

নিশানবরদার পতাকা নিয়ে যায়। আমাদের মধ্যে কেউ অভিবাদন করে না। সামান্য কয়েকজনেই করে। আমরা শীতে উসখুস করতে থাকি।

ফৌজদাররা ঠাসাঠাসি করে আমাদের গায়ে-গায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। ওয়াশিংটন ঘোড়ায় চড়ে মাঠের মাঝখানে আসেন। টান হয়ে বসে আছেন তিনি। মনে হয়, বাতাস সম্পর্কে কোন হুঁস নেই। অদ্ভুত মানুষ লোকটা। আমাদের মধ্যে কেউ বোঝে না তাঁকে, চেনে সামান্য জনকয়েক। মাঝে মাঝে তাঁর বিরুদ্ধে আমরা প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারি। অকুতোভয় তিনি।

হ্যামিলটন তার ঠিক পেছনেই আছে। অভিজাতের মত ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। তার উর্দির লেস-দেওয়া কাফ্ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হ্যামিলটনের পেছনে একদল সেনানী।

জেনারেলের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে সামান্য দু চারটে টুকরো কথা কানে আসে...অনেক পথ এসেছি... অনেক দুর্ভোগ ভুগেছি...সইতে হবে...ব্রিটিশরাও ভুগছে এমনি করে...কিন্তু আমাদের মত কোন আদর্শের জন্য নয়...

কে যেন চেঁচিয়ে উঠে, কোথায় ভুগছে তারা? ফিলাডেলফিয়ায়?

সমস্ত অন্যায় সইতে হবে আমাদের...ঘৃণা করতে...

আমাদের মাইনের কি হল? আপনাদের বদ্ধি মহাদেশীয় মুদ্রা...

আমি জেকবের দিকে তাকাই। তার কাল চোখ দুটো জ্বলছে। শীতে নীলাভ তার মুখ নড়ছে...কখনও রাগে কখনও বা দুঃখে।

শিগগিরই পর্যাপ্ত খাবার আসবে...রামের রেশন...কংগ্রেসের কাছে আবেদন...

বাজে কথা যত।

পেনসিলভানিয়ার একজন বলে ওঠে, আমি দিব্যি করে বলতে পারি, ঘুমের কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না ওর।

ঘরের মধ্যে আরামে আছে আর শূয়োরের মত গিলছে।

যখন আমরা এখান থেকে মার্চ করে যাব...জয় সুনিশ্চত...

তুমুল সোরগোলের মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায়: মাইনে চুকিয়ে পল্টন ভেঙে দিন! জমাট মাটিতে রাইফেলের কুঁদোর ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ কানে আসে। ড্রাম বাজছে একটা। তারই তালে তালে কে যেন রাইফেল ঠুকছে। আমি ওয়েন ও স্কটের ভাবগতি লক্ষ্য করে যাই। নিশ্চলভাবে বসে আছ তারা। ওয়াশিংটনও নড়ছেন না। সেনানীরা তাঁকে ঘিরে ধরে; কিন্তু তাদের ভীড় ঠেলে তিনি পল্টনের দিকে এগিয়ে আসেন। আমাদেরই কাছাকাছি এসে ঘোড়া থামান। বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শীতে নীলাভ তাঁর মুখ। তাঁর ঠোঁট রাঙা পাতলা কিন্তু দৃঢ়সংবদ্ধ। শঙ্কা হয়, যে কোন মুহূর্তে একটা বন্দুকের আওয়াজ

শুনতে পাব। বেশ বুঝতে পারি, কি ভাবে সৈনিকেরা এখন খুন করবে ওঁকে। জেকব ফিসফিস করে বলে, মানুষের মত মানুষ। মামুলি অফিসার নয়, জননেতা হবার যোগ্য লোক।

অদ্ভুত মানুষ। কদাচিৎ এমন লোকের দেখা মেলে। সায় দিয়ে বলে এলি।

গোলমাল ক্রমান্বয় থেমে আসে। মাথা হেঁট করেন জেনারেল। মুখ বেদনায় কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

ওস্তাদ অভিনেতা। বিড়বিড় করে বলে চার্লি।

তোমরা এখনও আমার সহকর্মী। তিনি বলে ওঠেন।—শুধু এইটুকু বিশ্বাস রেখ যে আমিও তোমাদেরই একজন···তোমাদের জেনারেল নই। এইখানে আস্তানা তুলে আমাদের থাকতে হবে এবং যা আসে সহ্য করতে হবে। এ করতেই হবে!

এরপর তিনি চলে যান। ব্রিগেডগুলো ছড়িয়ে পড়ে। কুচকাওয়াজ শেষ অবধি ক্ষুব্ধ জনতার সোরগোলে পরিণত হয়। মেয়েরা এগিয়ে আসে—মিশে যায় পল্টনের সঙ্গে।

পেনসিলভানিয়ানদের দলে খানিকটা শৃঙ্খলা আছে। ঘোড়া ছুটিয়ে ওয়েন আমাদের ছোট্ট দলটির সামনে আসেন। আমরা সরে দাঁড়াই।

তোমরা আমার লোক নও তো! তিনি বলেন।

আমরা চার নম্বর নিউ ইয়র্ক রেজিমেণ্ট স্যর। এলি জানায়।

ওয়েন পকেট থেকে একখানা ছোট্ট খাতা বার করেন এবং বুড়ো আঙুল দিয়ে খুঁজতে থাকেন। বাতাসে পত্ পত্ করে ওড়ে বইয়ের পাতা—খুলে যেতে চায়। এলিকে জিজ্ঞাসা করেন, ভেঙে দেওয়া হয়েছে?

আমরা আটজন মাত্র বেঁচে আছি।

তোমাদের চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়ায় নিয়ে নেব। ক্যাপ্টেন মুলারের হুকুম নিয়ে চলবে।

আমরা পেনসিলভানিয়া রেজিমেণ্ট হব না। গোমরা মুখে বলে জেকব।

হুকুম মেনে চলতে হবে।

চুলোয় যাক হুকুম!

তোমাদের দলপতি কে? গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করেন ওয়েন।

কোন ফৌজদার নেই আমাদের মধ্যে। আমি বলি।—তারা মারা গেছে।

চৌদ্দ নম্বরেই যোগ দিতে হবে তোমাদের; না হয় তোমাদের গ্রেপ্তার করা হল।

জেকব মাস্কেট উচায়। তাকে থামাবার চেষ্টা করে এলি, কিন্তু জেকব তার হাত ছাড়িয়ে যায়। ওয়েনকে বলে, এ জার্মান চাষীর সঙ্গে কথা বলা নয়! এখুনি আধমরা হয়েছি, অফিসারের তাঁবেদারি করলে আর বাঁচতে হবে না।

পেনসিলভানিয়ানরা আমাদের ঘিয়ে দাঁড়ায়। তাদের ঠেলে এক অফিসার এগিয়ে আসে। ওয়েন তাকে বলে, ক্যাপ্টেন মুলার, তোমার লোকজন দিয়ে একে ঘিরে রাখ। আর যদি গুলি চালায় তো ওকে গুলি করবে।

এমনি একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গ গোটা মাঠে আগুন জ্বালাবে। মনে হয়, আমি যেন বিপ্লবের শেষ অঙ্ক দেখছি। কিন্তু এলি দুহাতে জড়িয়ে ধরে জেকবকে এবং জোর করে তার মাস্কেট নাবিয়ে দেয়।

এরা তোমার লোক ক্যাপ্টেন। ওয়েন বলেন; তারপর তিনি ঘোড়ায় চড়ে চলে যান। আর সবাইর সঙ্গে আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি। বিষম রাগ হয় মনে মনে। বেশ অস্বস্তি বোধ করি। ব্রিডস্

পাহাড়েও আর একবার এমনি অস্বস্তি বোধ করেছি। ব্যস, তারপর আর নয়। ভীড় ঠেলেঠুলে আমি জেকবের কাছে এগিয়ে যাই।

পেনসিলভানিয়ার লোকজন তখন হাসাহাসি করছে। গুটিকয়েক মেয়েও আছে। খিল খিল করে হেসে আমাদের দিকে চোখ মারছে তারা।

আমার দলে বিদ্রোহ করা চলবে না। মুলার বলে।—হুকুম মাফিক কাজ করতে হবে, বুঝলে বাছাধন! না হয় দুর্ভোগ আছে।

আপনার যা খুশি করতে পারেন স্যর। মোলায়েমভাবে শুনিয়ে দেয় এলি।

এলির চোখের দিকে চেয়ে তার ধমক দেবার হিম্মত থাকে না। পেছন ফিরে সে সার বেঁধে দাঁড়াবার হুকুম দেয়।

ফিরে আসবার জন্য সার বেঁধে দাঁড়াই। জেকব তখনও কাঁপছে, কালো হয়ে গেছে মুখখানা। এলি তার হাত ধরে আছে। লম্বা ছিপছিপে একটি মেয়ের কোমর ধরে আছে কেনটন। যে কোন ভদ্র গেরস্থ মেয়ে লজ্জা পায় তার মুখ দেখে। পেনসিলভানিয়ার একটি লোক এগিয়ে এসে মেয়েটির পর দাবী জানায়: এ আমার স্ত্রী।

এ তো বেশ্যা; পয়সা খাচ্ছে আমার। কেনটন বলে।

বলছি আমার স্ত্রী!

আর সব মেয়েরা হাসাহাসি শুরু করে। কেনটনের হাতধরা মাগীটা স্বামীর মুখে থুথু ছুঁড়ে মারে। হো হো করে হেসে ওঠে সবাই।

আচ্ছা একদল মাগী জুটিয়েছে তো পেনসিলভানিয়ানরা! চার্লি গ্রীন বলে।

আবার আমরা ফিরে আসি। মেঘের প্রাচীরে ফাটল ধরে...শুরু হয় বরফ-পড়া। তুষারের মধ্য দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে আমরা আস্তানায় ফিরে আসি।

—চার—

চারিদিকে গভীর শান্তি। সব নিস্তব্ধ নিঝ্ঝুম। সামান্য হাওয়াতেই আকাশ সাফ হয়ে যাবে—নক্ষত্র দেখতে পাব। দুনিয়ার বুকে স্তব্ধতা থমথম করছে। বড়দিনের আগের রাত্রি আজকে।

যেন কয়েকদিন কি কয়েক সপ্তাহ এখানে এসেছি। দিন হপ্তার হিসেব কে রাখে? সহসা শোনা যায়, আগামী কাল বড়দিন এবং সেজন্য রামের বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। গুজব রটে, কালকে নাকি মুরগীও পাওয়া যাবে। লোকে বলে, ক্যাপ্টেন আলেন ম্যাকলেন আর তার হানাদারদল হাজার মুরগী ভরা একটি ব্রিটিশ কনভয় আটক করেছে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না। বড়দিন সম্পর্কেও বিশেষ উৎসাহ নেই কারও। বড়দিন মানে দুঃখকষ্টের আর একদিন। হাজার মুরগী সাবাড় করবার মত ফৌজদারের অভাবও হবে না।

রাত হয়েছে। আজ পাহারার পালা আমার। আমরা এখানে আসবার পর তিন দিন বরফ পড়েছে। ইঞ্চি ছয়েক পুরু আলগা বালির মত বরফ জমে আছে মাটির উপর। হাঁটতে গেলে ছিটকে ওঠে—পায়ের পট্টির ফাঁকে ঢুকে পড়ে। যতদূর মনে পড়ে, এমন শীত পড়েনি কখনো।

আমি একশো কুড়ি পা হাঁটছি, আবার পেছনে ফিরছি। ঘণ্টা দুয়েক এই ভাবে চলে। মাস্কেটের বোঝা টেনে গুটি গুটি পা ফেলছি। বনের কিনারে আমার 'বিট' শেষ। সেখান থেকে জমাট বাঁধা শুয়েলকিল নদী, কিং অফ প্রুশিয়া রোড ও ফিলাডেলফিয়ার পথ যেন স্পষ্ট মালুম হয়। আরও দেখা যায় রাত্রির রহস্যের-বুকে-হারানো গড়ানে গিরিমালা। দিগন্তের কোলে আলোর ছটা দেখছি বলে মনে হয়। ঐ বোধহয় ফিলাডেলফিয়া। ফিলাডেলফিয়া এখান থেকে মাত্র আঠারো মাইল দূরে। এ নিস্তব্ধতা পাগল করে দেয়।

এখানে ম্যাকস্ ব্রোনের জন্য অপেক্ষা করি। জার্মান নাবালক ছেলেটি। হেরিশবার্গ শহরের আশেপাশের পাহাড়িয়া গ্রামাঞ্চলের ক্যাবলা ছেলে সে। আজকে রাত্রে আমার সঙ্গে বিটে আছে। সামান্য গুটিকয়েক ইংরেজী কথাই জানে। শীতের কষ্টে ও বাড়ী ফিরবার টানে ভারী বেজার বেচারীর মুখখানা। যা-ই হোক, কোন সঙ্গী না থাকার চাইতে এমন সঙ্গীও বরং ভাল।

আমার বিটের শেষ প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়াই। থামবার সঙ্গে সঙ্গে শীতে গা কামড়ে ধরে। মনে হয়, ছুনিয়ার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। আমার ও ব্যোমমণ্ডলের হিমলোকের মধ্যে যেন কোন ব্যবধান নেই। ছুটি কোট আমার গায়ে। একটি আমার নিজের, অপরটি কেনটনের। ছুটিই পাতলা। পায়ে বরফ জমে গেছে। মনে হয় পা ছুটো যেন বরফের বল। হাতে কম্বলের টুকরো জড়িয়ে নিয়েছি। সেই হাত ও কনুই দিয়ে কোন মতে মাস্কেটটা বয়ে বেড়াচ্ছি। তাতেও শীতের হাত থেকে ত্রাণ নেই। পা ছুঁড়ে বরফ ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করি।

সেখানে দাঁড়িয়ে দেখি, অতিকষ্টে ঢালু পথ বেয়ে উপরে উঠছে ব্রোন। সামনে ঝুঁকে চলছে…বলতে গেলে হামাগুড়ি দিচ্ছে। খুব কাছাকাছি না আসা অবধি আমায় দেখতে পায়নি। তখন আবার পেছন ফিরে রওনা হয়।

সব ঠিক আছে। আমি বলি।

টান হয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ছোকরা। মুখ থেকে খানিকটা ধোঁয়া বেরোয়। নিজের গায়ে বন্দুকটা হেলান দিয়ে রেখে জোরে জোরে উরুতে হাত চাপড়ায়। বলে, আমার ভয় ধরে গিয়েছিল। বাব্বাঃ, কি নির্জন!

খানিকক্ষণ ছুজনে একসাথে দাঁড়িয়ে থাকি। কারও মুখে কথা

নেই। শীত তাড়াবার জন্য উভয়েই মাঝে মাঝে গা ঝাঁকানি দিচ্ছি। একটা নেকড়ে ডেকে ওঠে। তার গর্জন কেঁপে কেঁপে রাত্রির স্তব্ধ আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। ঘেউ ঘেউ করে একটা কুকুর ডাকের জবাব দেয়। শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি অনুভব করি। মেরুদণ্ড বেয়ে মৃদু কম্পন নীচু থেকে উপরে উঠে আসে। ব্রোনের মুখ সাদা হয়ে যায়।

গুলি করে যদি ওটাকে মারতে পারতাম! আমি বলি।—চামড়া দিয়ে ভাল একটা টুপি আর মিটেন (দস্তানা) বানান যেত!

ব্রোন বলে: আমি ভাবি, যখন একলা হাঁটি, ওৎ পেতে থাকে ওরা।

পণ্টন প্রথম যখন এখানে আসে, এ মুলুকে বাঘ ছিল না। বছরের পর বছর যে অঞ্চলে চাষ আবাদ হচ্ছে, বাঘ থাকতে পারে না সেখানে। তাছাড়া আঠারো মাইল দূরে হাজার বিশেক লোকের শহর রয়েছে একটা।

রোজই এদের সংখ্যা বাড়ছে। আমি বলি।

বাড়ীতে আজকে রাতে আগুন জ্বালান থাকত। শূয়োর রোস্ট করা হত। সারা রাত মদ খেয়ে নাচানাচি করে কাটাতাম!

অপলক দৃষ্টিতে পরস্পর চোখ চাওয়াচাওয়ি করি এবং মাথা নেড়ে সায় দি আমি। ছোকরার দিকে চেয়ে ভাল করে তার মুখখানা দেখবার চেষ্টা করি: লিকলিকে বেঁটে ছেলেটি। পাতলা দাড়ি গজিয়েছে মুখে। চোখ দুটি ক্যাবলা গোছের। শীতের চোটে ছেলেটির গোটা মুখখানা অসাড় হয়ে গেছে। কোন আশা, কোন আদর্শ তার আছে বলে মনে হয় না। নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করি, কেন? মনে মনে বলি, বিপ্লবের বিভীষিকাময় পথ চলতে এমনি হবে, স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পেরেছ কি?

এরও ধমনীতে হেসিয়ানদের (১) রক্ত। হেসিয়ানদের আমি ঘৃণা করি না; কিন্তু পেনসিলভানিয়ার জার্মানরা করে। তারা হেসিয়ানদের যতটা ঘৃণা করে এত ঘৃণা কোন মানুষকে করতে দেখিনি। দেখেছি, মুমূর্ষু হেসিয়ানদের নির্মমভাবে উৎপীড়ন করে এরা। তাদের লাথি মারে, কিরিচ দিয়ে খোঁচায়···ঠাট্টা বিদ্রূপ করে জার্মান ভাষায়।

পেছন ফিরে আমি চলতে শুরু করি। যাবার সময় কোন কথা হয় না। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, অতি কষ্টে ঢালু পথ বেয়ে নামছে ছেলেটি। তাকে আমার প্রতিবিম্ব বলে মনে হয়। চোখ বুজে সে-ছবি ভুলবার চেষ্টা করি···এগিয়ে চলি হোঁচট খেয়ে।

আমার বিটের অপর প্রান্তে এসে থেমে যাই···মাস্কেটে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকি চুপ করে। ক্রমে ঝিম আসে। এখুনি ঘুমিয়ে পড়ব মনে হয়। দুনিয়ার সঙ্গে শেষ দেখা-শোনার এক মধুর অনুভূতি আমায় পেয়ে বসে। ক্রমে ক্রমে শীতের সমস্ত অনুভূতি লোপ পায়। আধ বোজা চোখে আমি স্কটের সৈন্যদলের আধ-ঢাকা আস্তানাগুলো দেখতে পাচ্ছি। আজকের রাত মিশে যায় বড়দিনের অন্যান্য পূর্ব রাত্রির সঙ্গে। কানে বাজে বাবার একটানা মৃদু কণ্ঠস্বর। তিনি যেন 'সেরা মানুষের' কাহিনী পড়ছেন। তার সঙ্গে কানে বাজে মায়ের 'সুতো কাটার ঘড় ঘড় আওয়াজ। চাকার আওয়াজ আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেয়। বাইরে হ্রদ অঞ্চলের সুবিস্তীর্ণ সমতল বনভূমি···ছয় জাতির (ইণ্ডিয়ানদের) রহস্যময় রাজ্য। এইখানেই ডেরা বেঁধেছি আমরা। এ মুলুকের সব কিছুই রহস্য-ঘেরা বিভীষিকাময়। কিন্তু এক ফুট পুরু গাছের গুঁড়ির বেড়া দিয়ে এ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে।

---

(১) জার্মানির হেস অঞ্চলের লোক। ইংরেজপক্ষে ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে লড়াই করছে।

বাবা ডাকেন, আসেন। সঙ্গে সঙ্গে মাও আস্তে আস্তে বলে ওঠেন, এই, এ বই পড়বার সময় ঘুমোতে নেই আসেন!

সহসা সম্বিত ফিরে আসে। ভয়ে প্রাণ আঁতকে ওঠে। জমে যাচ্ছি! নড়বার চেষ্টা করি; কিন্তু নড়াচড়ার শক্তি নেই। আতঙ্কে সারা দেহ অসাড় হয়ে আসে। হাত পা ছেড়ে দি···নিজের সম্পর্কে কেমন একটা উদাসীনতা পেয়ে বসে।

পেছন থেকে সহসা কাঁধের উপর একটা থাপড় পড়ে। বরফের পর মুখ থুবড়ে পড়ে যাই। মাস্কেটে লেগে মুখ থেতলে যায়। মুখে বরফ লেগে চেতনা ফিরে আসে; মোড় ফিরে গড়িয়ে পড়ি। এডওয়ার্ড আমায় ধরে তোলে। রীতিমত জোয়ান সে। হাতের তলায় তার বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শে মনে জোর পাই।

ঘুমোচ্ছিলাম। আমি বলি।

এডওয়ার্ড তার আস্তিনে থুথু ফেলে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখি যে থুথুও জমে গেছে।

মাথা ঝাঁকায় এডওয়ার্ড।—বেজায় ঠাণ্ডা রাত, আগুনের কাছে যাও। কাঁপছে সে। মস্ত একটা ক্লান্ত কুকুরের মত পা বাঁকাচ্ছে।—শিগগির আগুনের কাছে যাও। আবার বলে।

মাথা নেড়ে আমি রওনা হই। পেছন থেকে সে বন্দুকটা হাতে দেয়। নিজের বন্দুকটা নিয়ে আবার চলতে থাকি আস্তানার দিকে। বুক ফেটে কান্না আসে···কিন্তু অশ্রুকণাও জমে যায় চোখের পাতায়।

ফিলাডেলফিয়ার পথের সামনাসামনি পাহাড়ের মাথায় পেনসিলভানিয়ানদের ঘাঁটি। এরাই প্রথম রক্ষা ব্যূহ। কারণ ফিলাডেলফিয়ার দিক থেকেই তো আক্রমণ আসবে! দুই তিন সারে আমরা আস্তানা তৈরী করি। আদ্ধেকটা মাটি খুঁড়ে এবং বাকী আদ্ধেকটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে পরিখার আস্তানা তৈরী করা হয়। গাছের গুঁড়ি দিয়ে

তৈরী করা আগুনের চুল্লীতে পুরু করে কাদা লেপে দেওয়া হয়। প্রতিটি আশ্রয়ে দশ থেকে বারোজন লোক। দরজার মুখ বনের দিকে। গাছপালায় তবু খানিকটা পশ্চিমা হাওয়া আটকায় তো! কিন্তু ঝড়ো হাওয়া আসে পূব দিক থেকে। গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে আস্তানায় ঢুকে গা কামড়ে ধরে—হি হি করে কাঁপায়।

ভেতরে ঢুকে আমি দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াই। হাতের মাস্কেটটা ফেলে দিই। ঠকাস করে শব্দ হয় নোংরা মেজেয়। ক্ষীণ ধারায় আমার পা থেকে জল গড়াতে শুরু করে। নিজের বাঙ্কের এক প্রান্তে বসে আছে এলি, নিরীক্ষণ করছে আমাকে। জেকব মাস্কেটটা তুলে নেয়, সযত্নে মুছে রেখে দেয় তাকে। এলি আমাকে খানিকটা 'রাম' ঢেলে দেয়।

শেষটুকু তোমায় দিলাম, আলেন।

ঢকঢক করে সবটা গিলে ফেলি। গলাটা জ্বলে ওঠে, কিন্তু পেটের ভেতর গরম অনুভব করি। আগুনের দিকে পা বাড়াতেই জেকব আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

জমে গেছ খেয়াল আছে ?

ধপ করে মেজেয় বসে পড়ি। পা ছড়িয়ে দিই সামনে। ক্রমে অসাড়তা কেটে যায়। হাতে পায়ে কনকনে ব্যাথা অনুভব করি। উবু হয়ে এলি আমার পায়ের পট্টির উপরের খানিকটা ন্যাকড়া খুলে দেয়। খোসা ছাড়াচ্ছে যেন।

ধরে-আনা মেয়েটিকে নিয়ে নিজের বাঙ্কে শুয়ে আছে চার্লি গ্রীন। লড়াই করবার মুরদ তার নেই। সঙ্গিনী ছাড়া চার্লির মত পুরুষের জীবনের আদ্ধেকটাই ফাঁকা। ভগবান জানেন, কিসের তাড়নায় বোস্টনের ছাপাখানা ছেড়ে এই নরকের গর্তে এসেছে। চার্লির কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে মোটা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি পরিবেষ্টিত বেঁটে

মোটা একটি লোকের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তার ভুঁড়ি অনেকদিন আগেই গেছে। ভাঁজ পরেছে ঢিলে চামড়ায়। এখন সে সঙ্গিনীকে নিয়ে শুয়ে আছে। নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আসবার পর নড়েনি তো! কেনটন বসে আছে তার বাঙ্কের একপ্রান্তে। তার সঙ্গিনীও কুঁকড়ি-মুকড়ি দিয়ে পড়ে আছে তার পেছনে। পেনসিলভানিয়ার মেয়ে সঙ্গিনীটি। শীর্ণ চেহারা পাতলা চুল আর ফিকে নীল চোখ মেয়েটির। কথা বলে ওলন্দাজ ঢঙে। তার নজর সবাইর দিকে। দশ জন পুরুষের সঙ্গে একই পরিখার আশ্রয়ে থাকতে হলে এমনতো হবেই। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে ভ্যানডিয়ার। আগের চাইতে অনেক বুড়িয়ে গেছে সে। মুখে হাসি নেই, কথা কয় কদাচিৎ। মনে মনে হয়ত স্বপ্ন দেখছে কাঠ দিয়ে তৈরী এক গ্রাম্য গীর্জার— ছয়টি নির্ঝঞ্ঝাট দিনের শেষে যথারীতি যেখানে রবিবার ঘুরে আসে। হেনরি ঘুমিয়ে পড়েছে। ব্রোন এখনও আছে পাহারার বিটে। বাকী লোকটি শীর্ণকায় অদ্ভুত ধরণের এক পোলিশ ইহুদি। ফিলাডেলফিয়া থেকে আসছে। লম্বা কোল কুঁজো লোকটির কটা চোখ দুটো কোটরগত। সবে বছর খানেক আমেরিকায় এসেছে। ইংরেজী জানে না; তবে ওলন্দাজ ভাষা বলতে পারে। আমাদের প্রায় সকলেই বুঝি ওলন্দাজ। কুঁজো হয়ে সে আগুনের কাছে বসে আছে; ঠোঁট দুখানা নড়ছে আস্তে আস্তে।

প্রার্থনা করছে। কেনটন বলে।—আজকের রাতটা যে কি, তার কোন ধারণাই নেই ওর। জীবনে কোনদিন ইহুদি দেখেনি কেনটন। মনে হয়, ঘাবড়ে গেছে।—অসভ্য পৌত্তলিক। কেনটন বলে।

এডওয়ার্ড তার আস্তিনে থুথু ফেলেছিল। আমি বলি। তিন গুণবার আগেই জমে গেল।

ব্রাণ্ডিওয়াইনের এক জিপসির কথা মনে পড়ে। যুদ্ধের আগে দেখেছিলাম। সে এমনি প্রচণ্ড শীতের কথা বলেছিল।

এলি আমার পায়ের পট্টি খুলে ফেলে। উবু হয়ে বসে কাজ করবার সময় তার লম্বা কাঁচা-পাকা দাড়ি আমার হাতে লাগে। আস্তে আস্তে সে আমার পা টিপে দেয়। আমি মুখ ঘুরিয়ে নি; কিন্তু এলি পরম যত্নে পা টিপে যায়। মনে হয় যেন নিজের পা টেপাটেপি করছে।

লাগছে ?

মাথা নেড়ে জানাই—না।

জেকব দাঁড়িয়ে দেখছে। ওস্তাদের মত লক্ষ্য করছে আমাদের। আস্তানাটি যেমন গরম তেমনি ছোট্ট। সারা ঘরে ভুর ভুর করছে মানুষের গায়ের গন্ধ আর বদ্ধ উত্তাপ। শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়াও এঁকে বেঁকে ঢুকছে মাঝে মাঝে। চিমনি দিয়ে ভাল ভাবে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। তাই কাঠের চালে নীলচে ধোঁয়া জমে আছে। সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে বাজে রামের ঝাঁঝাল গন্ধ।

পা'টা মানুষের দেহের সামান্য একটা অংশ। জেকব বলে।

কেনটনের সঙ্গিনী উঠে বসে। বলে, যা নোংরা পা! তোমরা কি মানুষ না শূয়োর ?

চুপ কর মাগী! বেশী বকবক করবিনি। ধমকে ওঠে জেকব।

কেনটন—কেনটন, শুনলে তো!

আড়মোড়া দিয়ে হাঁদার মত হাসে কেনটন। নিরীহ আয়েসী লোক। তখন চার্লি গ্রীনেরও ঘুম ভেঙেছে। বাঙ্ক থেকে ঘাড় বাড়িয়ে সে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায়। তার সঙ্গিনী চেঁচিয়ে বলে, আচ্ছা ব্যাটাছেলে! অসহায় স্ত্রীলোক পেয়ে অমনিভাবে গালাগাল করলে!

তাতে তোমার কি ? কেনটন বলে।

মাগীটা আমার দু'চোখের বিষ! বিড়বিড় করে বলে জেকব।

শুনলে তো কেনটন ?

এ তুমি বলতে পার না জেকব। মৃদু প্রতিবাদ জানায় কেনটন।

দৃঢ়ভাবে হাত মুঠ করে ঘুরে দাঁড়ায় জেকব। ওদের লক্ষ্য করছি আমি। গরমের মৌতাতে কারও নড়বার সাধ্য নেই। এলি একমনে আমার পা টিপে যাচ্ছে; মনে হয় যেন কিছুই তার কানে যায়নি। ইহুদিটি মাথা হেঁট করে মাটির দিকে চেয়ে আছে।

আমার যা খুসী বলব। জেকব বলে।

কেনটন উঠে দাঁড়ায়। ভ্যানডিয়ার দুজনকে ঠেলে সরিয়ে রাখে। তোমরা মানুষ নও, জানোয়ার। ভ্যানডিয়ার বলে।

ভগবানকে ভয় বা ভক্তি কিছুই কর না তোমরা।

আগুনের কাছে গিয়ে ইহুদিটির মুখোমুখি গুটিসুটি মেরে বসে জেকব। আবার বিছানায় এলিয়ে পড়ে কেনটন। সঙ্গিনী যখন তাকে আদর করবার চেষ্টা করে, ঠেলা মেরে তাকে সরিয়ে দেয়। এলি আবার আমার পা বেঁধে দেয়।

যে বেজায় শীত! এডওয়ার্ড বেচারীর জন্য দুঃখু হচ্ছে আমার। এলি বলে।

দুই বাহু তুলে খানিকটা মুখ হাঁ-করে আস্তানার মাঝখানে দাঁড়ায় ভ্যানডিয়ার। তার চোখের চারপাশে ঢিলে চামড়ার ভাঁজ পড়ে। তারপর সহসা হাত নামিয়ে সে নিজের বাঙ্কে চলে যায়। আগুনের কাছে বসান একটা পাত্র তুলে নিয়ে জেকব আমাকে খানিকটা ঝোল দেয়। রসিয়ে রসিয়ে খাই। গরম ঝোল বেশ লাগে।

হাড়ের কাঁপুনি তাড়ান বেজায় কঠিন। এলি বলে।

ইহুদিটি মুখ তুলে চায়; ওলন্দাজ ভাষায় বলে, সাইবেরিয়ার শীত আরও ভয়ঙ্কর।

সাইবেরিয়া কি ?

ওলন্দাজ ভাষা বোঝেনা গ্রীন; কিন্তু সাইবেরিয়া কথাটা বুঝতে পেরেছে।

এশিয়ায় বরফের দেশ একটা।

সেখানে ছিলে তুমি? আমি জিজ্ঞাসা করি। অত দূরে গিয়েছিলে কেন?

কথা হাতড়ায় ইহুদিটি। কিন্তু অত দূরত্ব বোঝাবার কথা খুঁজে পায় না।

আমরা দুহাজার গিয়েছিলাম সেখানে—জারের বন্দী হয়ে।

কোন দেশ থেকে?

পোলাণ্ড থেকে।

পোলাণ্ডের একটি লোককে চিনতাম। জেকব বলে। ক্রকলিন পাহাড়ে মারা যায়।

তুমি বুঝি পালিয়েছিলে? কৌতূহলী এলি জিজ্ঞাসা করে।

হাঁ, পালাতে পেরেছি। কোট ও শার্ট খুলে সে বুকের পর ক্রুশের একটা পোড়া দাগ দেখায়। এই ভাবে ইহুদিদের তারা ছাপ মেরে দিয়েছিল। বলত, আমরা বিপ্লব সৃষ্টি করি। আমি পালাতে পেরেছি।

চোখ বুজে আমি এই দীর্ঘ পথ-চলার কথা কল্পনা করবার চেষ্টা করি। এ যেন দুনিয়া পাড়ি দেওয়া! মাথা তুলে আবার যখন তাকাই, ইহুদিটি তখন হেঁট মাথায় ঠোঁট নাড়ছে।

আচ্ছা, কিসের জন্য লড়ছিলে তোমরা? ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করে এলি।

ইহুদিটি জবাব করেনা। কেনটন বলে, আমরা কিসের জন্য লড়াই করছি বল না এলি। ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, এবারকার শীত কাবার হবার আগেই গোটা পল্টন মরে সাবাড় হবে।

বার বার নিজেকে প্রশ্ন করছি—কেন, কেন লড়ছি আমরা? ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে কোন রাগ নেই আমার। যুদ্ধের আগে এমন একজন ব্রিটিশও দেখিনি যে আমার কোন ক্ষতি করেছে। পাকা দুশো একর জমি ছিল আমাদের, বছর দুয়েকের মধ্যে নিশ্চয় আরও হাজার একর সাফ করতে পারতাম। কোনদিন কোন ট্যাকস্ দেইনি। তবু এলাম। নেহাৎ বোকা ছিলাম তাই! বাবাকে বল্লাম, বোস্টনের লোকজন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য পল্টন গড়ছে। আমিও যাব তাদের দলে। হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। বল্লেন, বোস্টনওলাদের ভাল করেই চেনেন আর ব্রিটীশদেরও লড়াই করতে দেখেছেন…দু'মাসের মধ্যে আদমস্ ও হানককে ব্রিটিশরা ফাঁসিতে লটকাবে।

তাহলে এলে কেন? জেকব জানতে চায়। দুহাতে মুখ লুকোয় কেনটন।

জেকব ঝাঁকি মেরে বলে, তোমার মত শুয়োর দিয়ে কোনদিন পল্টন গড়া যায় না, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

রাগারাগি করো না জেকব। ফিসফিস করে বলে এলি।

এমনি এক রাতে খ্রীস্ট জন্মেছিলেন। ছাড়াছাড়া ভাবে বলে ভ্যানডিয়ার।—আজাদীর নামে তোমাদের ঘাড়ে মাগীর ভূত চেপেছে। যত অনাসৃষ্টি কাণ্ড। একগুঁয়ে জেদী তোমরা, ভগবানের বিচারে রেহাই পাবে না।

হয়েছে আর উপদেশ দিতে হবে না। খেঁকিয়ে ওঠে চার্লি।

কেনটনের সঙ্গিনী তারস্বরে বলে, চুপ কর পোড়ার মুখো! তোরা কি মানুষ? নচ্ছার ভিখারী যত!

জেকব উঠে পড়ে। দরজার দিকে দুপা এগিয়ে সে তাক থেকে বন্দুক তুলে নেয়। তারপর কেনটনের বাক্সের দিকে ফিরে বলে, মাগী

আর টু শব্দ করেছে তো খুন করে ফেলব। বারণ করে দাও কেনটন। খানকী মাগীর বেয়াদপি সইব না।

চট করে লাফ দিয়ে উঠে জেকবের সামনে দাঁড়ায় এলি ; বন্দুকটা সরিয়ে দেয় একপাশে। কর্কশ গলায় ভ্যানডিয়ার বলে, ক্রোধ-রিপুর বশে যদি রক্তপাত করতে চাও তো আমায় খুন কর জেকব।

কেনটনের সঙ্গিনী তখন গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দেয়। জেকবের হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নেয় এলি। এলির কাছে শিশু হয়ে পড়ে জেকব। তবু তার ঠোঁট কাঁপছে। গত সপ্তাহের সমস্ত বিভীষিকা পুঞ্জীভূত হয়ে আজ ফেটে পড়েছে। এলি তাকে ধরে বাঙ্কের কাছে নিয়ে যায়।

ভুলে যেওনা জেকব, বহুদিন একসাথে আছি আমরা। মোলায়েম ভাবে বলে এলি।

তারপর সবাই চুপ করে থাকে। মনে হয়, সাময়িক উত্তেজনায় সব দম ফুরিয়ে গেছে। কেনটনের সঙ্গিনী তখনও ফোঁপাচ্ছে ; তবু কেনটন তাকে শান্ত করবার কোন চেষ্টা করেনি। দুই হাতে মুখ চেপে বসে আছে। আগুনের পাশে বসা ইহুদিটি নিস্পন্দ।

বাইরে বাতাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। একটা বাঘ ডেকে ওঠে—করুণ তার ডাক। সবাইর মুখের দিকে তাকাই…একগাল দাড়িওলা লম্বা আকাটা চুল ভরতি মুখ। দেহের যত্ন পরিপাটি সম্পর্কে কোন খেয়াল বা হুঁস নেই এদের। শতছিন্ন জামাকাপড় পরা একদল লোক গুটিসুটি মেরে বসে আছে উত্তাপের আশায়। এদের সঙ্গিনীদেরও আর স্ত্রীলোক আখ্যা দেওয়া যায় না! মনে মনে কথাটা ভাবি…ভাবতে হয়। না হলে পাগল হয়ে যাব যে। মনে মনে বলি, আর কোথাও নিশ্চয়ি হয়ত সুন্দরী সুবেশা নারী আর পরিচ্ছন্ন সুপুরুষ আছে। নারীর দেহ সম্পর্কে যে কল্পনা এতদিন করে এসেছি

আজকেও সেই কল্পনার চোখে ভাবতে চেষ্টা করি মেয়েদের···ধবধবে সাদা আর নিখুঁত···

কেনটনের সঙ্গিনী ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি···নরকে যাও, সেখানেও সঙ্গে আছি তবু···

কেউ জবাব দেয় না। আর একটা কিছুর জন্য কান পেতে আছি আমরা। দীর্ঘ গভীর নীরবতায় মানুষ যেমন করে কান পেতে থাকে, তেমনি ভাবে উৎকর্ণ হয়ে আছি। বাইরে বরফের পর পায়ের শব্দ হয়···পদধ্বনি এগিয়ে আসে দরজার কাছে।

জার্মান ছেলেটি এসেছে। এলি বলে।—ভেতরে আসছে না কেন ?

খানিকটা অপেক্ষা করে আমি দরজা খুলে দিই। হুস হুস করে তুষারকণা ঢোকে ঘরে; তারপর টলতে টলতে একটি মানুষ প্রবেশ করে।

কে তুমি ? জেকব পরিচয় জিজ্ঞাসা করে।

আমি চেপে দরজা বন্ধ করে দি। মেয়েটি মাথা তোলে। তখন বুঝতে পারি কম্বল মুড়ি দেওয়া একটি মেয়ে ঢুকেছে। তার খালি পা নীল হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা লেগে ফেটেও গেছে জয়গায় জায়গায়।

যিশু খ্রীস্ট! ফিস ফিস করে বলে গ্রীন।

কম্বলখানা ফেলে দেয় মেয়েটি। অর্ধনগ্ন সে। কম্বলের তলায় শুধু একটা পুরনো ব্রিচেজ পরা। প্রচণ্ড শীতে নীল হয়ে গেছে মেয়েটি। পাতলা একহারা চেহারা···গাল বসা মুখ···তরুণীর মত ছোট্ট স্তনযুগ··· মাথায় লম্বা কালো চুলের খোপনা। এককালে লাবণ্যময়ী ছিল বলেই মনে হয়। একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকি। আর সকলেও দেখছে অপলক দৃষ্টিতে। হেনরি লেনের ঘুম ভেঙে যায়। বাঙ্ক থেকে উঠে আসে। মেয়েটির দিকে এগোতেই তার দাড়িওলা উসকো-খুসকো চেহারা দেখে আমার দিকে পিছিয়ে আসে মেয়েটি। কম্বলটা

তুলে নিয়ে আমি তার গা ঢেকে দিই। টলতে টলতে আগুনের কাছে গিয়ে সে গুটিস্থুটি মেরে বসে পড়ে।

তুমি কে মেয়ে? এলি জিজ্ঞাসা করে।

আমায় একলা থাকতে দাও। সে বলে।—দোহাই ভগবানের, আমায় একলা থাকতে দাও।

কেনটনের সঙ্গিনী বলে, কে আমি বলছি। ভার্জিনিয়ার ব্রিগেডের রূপসী মেয়ে···নাম বেস্ কিনলি।

আমায় একলা থাকতে দাও।

জেকব উঠে পড়ে। সরাসরি মেয়েটির কাছে গিয়ে সে তার কম্বল টেনে ধরে। কর্কশ গলায় বলে, বেরিয়ে যা।

ভ্যানডিয়ার যোগ দেয় তার সঙ্গে: বেরিয়ে যাও, অনেক নচ্ছার মেয়ে আছে এখানে। তোমার জন্যে ভার্জিনিয়ানদের সঙ্গে হয়ত খুনোখুনি হবে। খসে পড়!

ওকে একলা থাকতে দাও। আমি বলি। জেকবের সামনে দাঁড়াই।

সরে যাও ছোকরা! মেয়েটা ভাল না।

ও থাকবে এখানে। জেকবকে বলি।—পা দিয়ে রক্ত পড়ছে। এখানে থাক—গরম করে নিক পা'টা।

জেকব আমার ঘাড় ধরে ঘুষি বাগায়, কিন্তু এলির ধমকে থেমে যায়। থ' মেরে সে মেয়েটিকে নিরীক্ষণ করতে থাকে।

'ওরা পাঁড় মাতাল হয়েছে। মেয়েটি বলে।—আমায় পেলে মেরে ফেলবে। এই ছাখ! কম্বলখানা খুলে দেখায় মেয়েটি।

কেনটন খেঁকিয়ে ওঠে, পাঁড় মাতাল হয়েছে। কুইলার শালা হলপ করে বল্লে রাম নেই, তবু ভার্জিনিয়ানদের মাতাল হওয়া আটকাল না তো! রসদখানার কর্তা কুইলার।

ওকে বার করে দাও। ছাড়া ছাড়া ভাবে বলে ভ্যানডিয়ার।

কেনটনের সঙ্গিনী চেঁচিয়ে ওঠে, তুমি এখানে থাক বাছা! পারে আমায় বার করে দিক না। মানুষ হলে আজকের এই রাতে কুকুরকেও বার করে দিতে পারে না।

সহসা দরজাটা খুলে যায়। একটা লোক উঁকি মারে। ভার্জিনিয়ানদের লম্বা বাদামি শিকারীর শার্ট তার গায়ে। মাথা খালি। হাঁপাচ্ছে লোকটি। আরও জন কয়েক আছে পেছনে। কারও কারও হাতে লম্বা রাইফেল। দরজাটা তারা খুলে রাখে—হু হু করে ঠাণ্ডা ঢোকে ঘরের মধ্যে।

দরজাটা বন্ধ করে দাও। এলি বলে।

ওকে নিতে এসেছি···আমাদের সঙ্গিনী।

ভার্জিনিয়ার মেয়ে ও। পেছন থেকে কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে।

দরজাটা বন্ধ কর বলছি।

জাহান্নামে যাও! আমি বলি।—যে চুলোয় খুশী যাও, কিন্তু এখান থেকে খসে পড়!

লোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আমি তার পথ রোধ করে দাঁড়াই। দৃঢ় মুষ্টিতে সে আমার মুখে ঘুষো মারে। তার পরেই জেকবের গম্ভীর গলার ধমকানি কানে আসে। নীচু দরজা দিয়ে ভার্জিনিয়ানটিকে বার করে দিচ্ছে সে। কেনটন ও ভ্যানডিয়ারকে নিয়ে এলিও তার পেছু পেছু যায়। আমিও উঠে পড়ে তাদের পেছু নেই। লেন আর গ্রীন আসে আমার সঙ্গে। ইহুদিটির দিকে একবার চোখ পড়ে···নির্বিকারে সে আগুনের ধারে বসে আসে।

বাইরে ছায়া-মূর্তির তুমুল মারামারি শুরু হয়। চরম ঘৃণা ও ক্রোধে নিয়ে আমি হানাহানির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সোরগোলে নিষুতি রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে যায়। পেনসিলভানিয়ার লোকজন ছুটে আসে আস্তানা থেকে। বন্দুক হয় লাঠি, ছুরিও চলে।

চারিদিকে ধ্বনি ওঠে : ভার্জিনিয়ানরা এসেছে !

ভার্জিনিয়ানরা দলে ভারী নয়। বড় জোর জন বারো। অনায়াসেই তাদের হটিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দলের সংখ্যাধিক্যে কাবু হয়ে পড়ে। আমরা হাঁপাতে থাকি। প্রচণ্ড শীতেও গরম বোধ হয়। পেনসিলভানিয়ানদের একজন বলে ওঠে, পাঁড় মাতাল ব্যাটারা।

আমাদের রামের বরাদ্দ জোটে না আর ভার্জিনিয়ান শালারা প্রাণভরে গিলছে।

গজর গজর করতে করতে আমরা আস্তানায় ফিরে আসি। তবে এই মারামারি না হলে আমরা যে পাগল হয়ে যেতাম, একথা সবাই বুঝতে পারি। দরজার কাছে আমরা জটলা করে দাঁড়াই। উত্তপ্ত দেহে আগুনের তাত লাগে। ইহুদিটি একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে, যেন আমরা তার বুদ্ধির বাইরের একটা জিনিস।

পেনসিলভানিয়ার লোক তোমরা ? মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে।—আজকের রাতটা আমায় থাকতে দেবে তো !

আমরা পেনসিলভানিয়ার লোক নই। জেকব বলে।

নাম কি তোমার ? আমি জিজ্ঞাসা করি।

বেস কিনলি।

আগুনের পাশে বসে শরীরটা তাতিয়ে নাও। আমি তাকে আশ্বাস দিই।—কেউ তোমাকে আগুনের কাছ থেকে তাড়াবে না।

আমি মেয়েটি দিকে তাকাই। চোখোচোখি হয়। চোখে চোখে অজানা কি যেন বলাবলি হয়ে যায়। নিজেকে আরও বড় বলে মনে হয়...মনে হয় আলাদা মানুষ আমি।

ও থাকবে, কেমন ? সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করি।

হাঁ, আজকের রাত তো বটেই। এলি সায় দেয়।

আমি তার কাছ ঘেঁষে বসি। মেয়েটি কিন্তু কথা বলে না।

আবার তার মুখের দিকে তাকাই এবং শিবির সঙ্গিনীদের মনের রহস্য বুঝবার চেষ্টা করি। অবশেষে বিষণ্ণভাবে বলি, শিবির ছেড়ে চলে যাচ্ছ না কেন? কেন বেরিয়ে যাচ্ছ না এখান থেকে?

কোথায় যাব? জিজ্ঞাসা করে বেস।

কেনটনের সঙ্গিনী তখনও চাপা গলায় ফোঁপাচ্ছে। সবাই চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে কেউ হয়ত আগুনে একখানা চেলা ফেলে দেয়।

বড্ড খিদে পেয়েছে আমার। মেয়েটি বলে।

খানিকটা লাপসি দিলাম তাকে। দুহাতে কাঠের কাপ ধরে আস্তে আস্তে লাপসি খায় মেয়েটি। কেউ কথা বলে না। হেনরি লেন আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। গ্রীন ও কেনটন হামাগুঁড়ি দিয়ে বিছানায় যায়। মেয়েটি সম্পর্কে তাদের আগ্রহ মিটে গেছে।

শীতে নীল হয়ে আস্তানায় ফেরে এডওয়ার্ড। তুষারকণা ঝেড়ে ফেলে গা থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে সে মেয়েটির দিকে তাকায়। জেকব বলে, আলেনের সঙ্গিনী। এই আমাদের নীতিবোধ। বছরের পর বছর পোক্ত কাঠের গীর্জার শক্ত মেজেয় প্রার্থনা করবার এ-ই পরিণতি। বিয়ে না করেই মেয়েটি আমার হয়ে গেল। ভগবানের নামে একটি কথাও কোন লোক উচ্চারণ করল না। আমার পছন্দ হয়েছে তাই সে আমার। মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকায় মেয়েটি। তার কালো চোখের শাণিত দৃষ্টি আমায় বিদ্ধ করে। কিছুই বলি না। এলি সব ঘটনা জানায় এডওয়ার্ডকে।

ভাজিনিয়ার লোকগুলো ভারী পাজি—বেজায় নিষ্ঠুর। এডওয়ার্ড বলে।—মেয়েটা খানকি। ও কি আশা করেছিল যে ভার্জিনিয়ানরা ওকে আদর যত্ন করবে।

মুখ সামলে কথা কও। আমি চেঁচিয়ে উঠি।

ভার্জিনিয়ানদের আমি সমর্থন করছিনে আলেন।

ব্রোন কোথায় ? এডওয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করে এলি।—এতক্ষণে তার আসা উচিত।

তাকে দেখিনি তো। এডওয়ার্ড বলে।—আমি ভেবেছি, সে এসেছে।

আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমি বলি।—শীতে কাবু হয়ে পড়েছিল ছেলেটি। একদম ভুলে গিয়েছিলাম তার কথা।

উঠে দাঁড়িয়ে কোটটা গায়ে জড়ায় এলি। জেকব বলে, বোকার মত বাইরে যাচ্ছ কেন ?

আমিও কোটটা গায়ে জড়িয়ে নিই। ক্লান্তিতে অবসন্ন আমি, তবু ব্রোনের খবর জানি তো। মনে মনে বুঝতে পারি।

এলির পেছন পেছন বেরিয়ে পড়ে। জেকবও আসে আমার পেছনে। কেউ কথা বলে না। পাহাড়ের কোল পেরিয়ে আস্তানা থেকে অনেকটা দূরে হেঁটে যাই। তারপর গালফ্ রোডের দিকে নেবে চলি। ব্রোন যে পথে গেছে, বরফের উপর তা বার করা খুবই সহজ। সেই পথ ধরেই চলেছি আমরা। পদচিহ্নের শেষাশেষি এসে খানিকটা দূরে বরফের পর ছুটো দাগ নজরে পড়ে।

বন্দুকটা আনা উচিত ছিল। কাতর কণ্ঠে বল্লাম।—বন্দুকের কথা তোমারও তো মনে করা উচিত ছিল এলি !

আমরা ব্রোনের কাছাকাছি যাই। হাঁটু ভেঙে বসে জেকব।

বাঘের কাজ ! সে বলে।—নিশ্চয় বাঘের কাজ ! আবার বলে ওঠে কাতর কণ্ঠে। শেষের দিকে গলাটা চড়ে যায়।—ছেলেটি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে বাধাও দিতে পারেনি।

আজ রাত্রেই সে বলছিল.........

টের পায়নি। এলি বলে।—ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমরা তাকে ঘিরে বসি। আমাদের নিশ্বাসে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। মনে হয় যেন মোম

জ্বালান হয়েছে। এলি আমায় সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে; তবু দেখতে হয় আমাকে।

ওকে নিয়ে যাব। এলি বলে।

মেয়েরা······

আগুনের কাছে নিয়ে যাব ওকে। এলি বলে। এমন ভাবে সে আমাদের দিকে তাকায় যে আমরাও ঘাড় নেড়ে সায় দিই।

আস্তানায় ফিরে লাসটি শুইয়ে দেওয়া হয়।—আগুনের কাছে। গম্ভীর ভাবে বলে এলি।—আগুনের কাছে শুইয়ে দাও।

ইহুদিটি উঠে দাঁড়ায়। দুনিয়ার সব দুঃখ যেন তার মুখে ভর করেছে। মাথাটা নীচু করে নীরবে সে মাথায় হাত দেয়। মেয়েরা কান্নাকাটি শুরু করে।

আমরা ব্রোনের চারপাশে ভীড় করে দাঁড়াই। হাঁটু ভেঙে বসে ভ্যানডিয়ার। বলে, আমাদের ক্ষমা কর ভগবান! আজকের রাতটার জন্য ক্ষমা কর। হাঁটু ভেঙে বসে সে প্রার্থনা করতে থাকে এবং প্রার্থনা-প্রসঙ্গে এমন সব কথা বলে, বহুদিন যা শুনবার সুযোগ আমাদের হয়নি। সহজ সরল ভাবে আস্তে আস্তে দরদ দিয়ে সে প্রার্থনা করে।

দ্বিতীয় খণ্ড—শীত

—পাঁচ—

১৭৭৮ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তিনদিন পেটে কিছু পড়েনি। কোন খাবার জোটেনি। খাদ্য বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছুই খেতে পাইনি।

বরফ জমে জমে পরিখার চাল অবধি উঁচু হয়েছে—দশ পনর ফিট পুরু হয়েছে উপত্যকার মধ্যে। প্যারেড ড্রিল বন্ধ। কোন রকম কুচকাওয়াজ হচ্ছে না দু'হপ্তা ধরে। গুজব রটে যে পল্টনের বেশীর ভাগ উধাউ হয়ে গেছে। কি জানি! গুজব পরখ করবার উপায় নেই। শক্তি কমছে আর বৃদ্ধের মত ঝিমিয়ে ক্লান্তভাবে চলছি। শান্ত্রীদের জন্য বরফ কেটে পথ তৈরী করা হয়েছে। পাহারা দেবার কথা উঠলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, খিস্তি খেউড় করি। তবু এই পাহারাদারির জন্যই এখনও পাগল হয়ে যাইনি।

আজ আমরা বিছানায় শুয়ে আছি। গুটিসুটি মেরে আছি গরম হবার জন্য। আগুনেরও তাত নেই। শুধু কেনটনই বসে আছে আগুনের খুব কাছে—একটা কবিতা খোদাই করছে বারুদ রাখার শিঙে। আগুনের শিখায় চিকচিক করছে মস্তবড় শিকারের ছোরাখানা···কোনমতে ছোরা চালাচ্ছে মস্ত হাতের থাবায় ধরে। মাস কয়েক ধরে প্রায়ই সে কবিতাটি এবং প্রসারিত হাত দিয়ে শিংএর প্রান্ত জড়িয়ে-ধরা একটি শিশুর ছবি খোদাই করতে লেগে থাকে। খোদাই করতে বসলেই সব কিছু ভুলে তন্ময় হয়ে যায়। শুধু মনে থাকে, গ্রীষ্মকালে সে কাজে হাত দিয়েছে। কখন-সখন চালিকে

দু'একটা বানান জিজ্ঞাসা করে। লেখাপড়ার কাজে বা বানান করতে তেমন ওস্তাদ সে নয়।

এলি রসদখানায় গেছে। তার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা। আগুনের শিখায় আস্তানার মাঝামাঝি অবধি আলোকিত। সব কটি বাঙ্ক অন্ধকার।

বেসকে পাশে নিয়ে স্বপ্নবিষ্টের মত শুয়ে আছি। চেঁচিয়ে উঠছি মাঝে মাঝে। বেস বলছে—আলেন! আলেন! কি বলছ?

জানিনা কি বলেছি। স্বপ্নের খানিকটা বোঝাবার চেষ্টা করি। বলি, আমার মায়ের নাম আন্না। আমাদের যদি সন্তান হয় তো তার নামও রাখব আন্না।

মেয়ে? বেস জিজ্ঞাসা করে।

প্রথম ছেলে, তারপর মেয়ে।

আবার ঘুমিয়ে পড়ি। একটু বাদেই ঘুম ভেঙে যায়। উদভ্রান্তের মত বেসের দেহ হাতড়াই। বলি, তবে রে বজ্জাত খানকি, আবার তোকে ভার্জিনিয়ানদের কাছে ফিরে যেতে হবে। স্ত্রী হবার যোগ্যা তুই নস্।

আলেন, কি বলছ তুমি?

আবার চোখ বুজি। মাথাটা এমন হালকা লাগে যে মনের খেই হারিয়ে ফেলি। মনে হয়, সর্বত্রই আছি আমি। শান্ত্রী হয়ে পাহারা দিচ্ছি বরফের মধ্যে, আবার সেই সঙ্গে শুয়ে আছি মোহকের গভীর উপত্যকার নিবিড় বনানীর মধ্যে। হাত দিয়ে বেস আমায় আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করে···ছেঁড়া জামা কাপড়ের উপর দিয়ে খুঁজে বেড়ায় আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ···আমার দাড়ির জট খুলে দেয়।

একটু বাদেই আবার ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্ন দেখি গভীর ঘুমে। স্বপ্নে দেখি, আমি যেন শিশু। সেদিন যেন কোন এক গরম দিনের

রোদে ঝলমল প্রভাত। পশ্চিম মুখো চলেছি আমরা। কতদূর থেকে আসছে স্বপ্নের শিশুটির খেয়াল নেই। পূর্বে অনেক দূর থেকে আসছে হয়ত। হয়ত বা কনেকটিকাট থেকে। চারখানা গাড়ি আছে। কাঠের তৈরী সেকেলে সরু গাড়ি। হিকরি কাঠের বাঁকান গোঁজ দিয়ে তৈরী চালের খাঁচা বাদামি ক্যানভাসে মোড়া। রাস্তা খারাপ। গাড়িগুলো গড়াচ্ছে আর ঝাঁকানি খাচ্ছে। ভয় হয়, যে কোন সময় ভেঙে যেতে পারে। যে করেই হোক, গাড়ি ক'খানা আস্ত থাকে। অনেকক্ষণ রয়েছে আস্ত।

আমি যেন প্রথম ওয়াগনের পেছনে পা ঝুলিয়ে বসে আছি। তপ্ত রোদ পড়েছে মুখে। মিঃ এপ্লাই দ্বিতীয় গাড়ির চালক। আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে। কখন-সখন লম্বা চাবুক তুলে বাড়ি মারছে। চেঁচিয়ে বলছে, হল তো আলেন!

দুজনেই হেসে উঠি। চাবুকটা আমাদের মধ্যে একটা মামুলি রসিকতার জিনিস। ভগ্নস্বাস্থ্য বুড়ো মানুষ মিঃ এপ্লাই। উঁচু সিটে বসবার সময় লম্বা বন্দুকটা সব সময় তার হাঁটুর পর থাকে। গাড়ি যে ভাবেই টাল খাক না কেন, হাঁটু থেকে মাস্কেট পড়বে না। মা চেঁচিয়ে ওঠেন, আলেন! গাড়ির মধ্যে এসো লক্ষ্মী! না হয় মিঃ এপ্লাইর ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে যেতে পার।

সপাং করে আবার চাবুকের বাড়ি পড়ে। আধ-ঘুমে আমি স্বপ্নটা আঁকড়ে থাকতে চাই…চাই রোদের তাত। যখন বুঝতে পারি স্বপ্ন ভেঙে গেছে, তখনও চোখ বুজে থাকি। চোখে মুখে রোদের তাত অনুভব করবার চেষ্টা করি।

ঘুম ভেঙে গেলে শিশুর মত গভীর ভালবাসা নিয়ে বেসের দিকে পাশ ফিরি। নারীর প্রতি পুরুষের ভালবাসার চাইতে এ ভালবাসার ধরণ আলাদা। সে আমার আমেজের উৎস। ক্ষীনবল মুমূর্ষু লোকের

পক্ষে এটা তুচ্ছ অবলম্বন নয়। কোন অনুযোগ সে করে না। আগেও কোনদিন করেনি। জানি, সেও মরতে চলেছে। তবু এও জানি, আমি যাবার আগে সে মরবে না।

যুদ্ধ বাঁধবার মুখে ভার্জিনিয়ার এক চাষীর ছেলেকে বিয়ে করে বেস। মরগানের রাইফেল বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে কুইবেক অবধি বেস স্বামীর অনুসরণ করবার চেষ্টা করে। তারপর সে পেছনে পড়ে যায়···ফিরে আসে বোস্টনে এবং কিছুদিন বাদে শুনতে পায় যে তার স্বামী কুইবেক অবধি পৌছোতে পারেনি। তখন সে ম্যারিল্যাণ্ডের এক গণফৌজের দলে ভীড়ে যায় এবং শিবির-সঙ্গিনী হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা না বুঝবার মত কঠিন নয়।

আস্তে আস্তে সে নিজের কাহিনী শুনিয়েছে। কণ্ঠস্বর শুনে বিশ্বাস জন্মে।—আমি কোন কথাই লুকোই না আলেন। তবে একদিন আমি ভাল মেয়ে ছিলাম। ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, সত্যিই ভাল মেয়ে ছিলাম একদিন। জান আলেন, আমার বয়স মাত্র উনিশ বছর। এর মধ্যেই পুরোদস্তুর বেশ্যা বনে গেছি। আমাকে ভালবাসবার কোন টানই তুমি বোধ কর না, না আলেন?

দুজনেরই চোখে জল আসে—দুর্বলতার অশ্রু। উভয়ে উভয়কে আঁকড়ে ধরি। প্রাণপণে আমার নোংরা দেহটা জড়িয়ে থাকে সে। যে ভাবে আমি কাঁদি, কোন পুরুষ অমন করে কাঁদবে না। প্রতিবার কান্নার পরেকার ঘুম শান্তির প্রলেপ দিয়ে যায়।

বহুবার বলা কথাই আবারও সে বলে। এ সম্পর্কে দিবারাত্রি স্বপ্ন দেখি আমরা।—তুমি ছেড়ে যেতে পার আলেন।

এডওয়ার্ডের কথা মনে পড়ে। আটদিন আগে সে পন্টন ছেড়ে গেছে। শুধু বলে গেছে, মোহক যাচ্ছি। নিজের বন্দুকটা নিয়ে যখন সে চলে যায়, কেউ কোন কথা বলেনি। কেউ ডেকে ফেরায়নি তাকে।

প্যাকাপোক্ত জোয়ান সে।—নিশ্চয় হেঁটে মেরে দেবে। এলি বলে। ক্ষ্যাপার মত চটামটি করে জেকব। জেকব ছাড়া আর কারও আস্থা নেই। আমরা সকলেই বিপ্লবকে ঘৃণা করি…ফৌজদারদের ঘৃণা করি… আর ঘৃণা করি পরস্পরকে। কিন্তু জেকবের আস্থা এখনও অটুট আছে। এ কথা ভুললে চলবে না যে, মানুষে অনেক কিছুর অংশ হতে পারে কিম্বা গোটা একটা জিনিস হতে পারে। শুধু একটি মাত্র জিনিসে যারা বিশ্বাস করে, তারা মশালের মত চিরকাল কিন্তু জ্বলে না। ভয়-দুর্বলতা মুক্ত জেকবকে চিনতে একথাটা মনে রাখা দরকার। স্বাবিরোধিতা আছে বলে ফৌজদারদের ঘৃণা করে সে। গভীর চিন্তাশীল লোক সে নয়। তার বিশ্বাস সহজাত। সে বিশ্বাস করে—সাধারণ মানুষ এক। ফৌজদাররা জনতার লোক নয়। নিজেদের আলাদা করে রাখে। তাই সে ঘৃণা করে তাদের। তবু সে সইছে, কেননা বিপ্লবের নেতৃত্ব তাদের হাতে। তাহলেও কিছুতেই সে স্বীকার করে না যে নেতৃত্ব করলেও ফৌজদাররা বিপ্লবের অংশ। দুর্বলতাকে আরও বেশী ঘৃণা করে সে। কোন মূল্য নেই মানুষের জীবনের। তার কাছে বিপ্লবই সব কিছু। এডওয়ার্ড তার বন্ধু। বহু বছরের বন্ধুত্ব তাদের। তবু সে দুর্বলচিত্ত—বিপ্লবের চাইতে নিজের কথাই বেশী ভাবে। এই জন্যই এডওয়ার্ডকে গাল-মন্দ করছে। কিন্তু সে আর বেঁচে নেই।

ক্ষ্যাপার মত রাগারাগি করে জেকব। তারপর যখন হাঁপিয়ে পড়ে, আগুনের পাশে বসে ডুকরে কাঁদতে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুকনো ফোঁপানি চলে।

ভয় না হলে আমিও এডওয়ার্ডের সঙ্গী হতাম। কিন্তু দূরত্বের কথা ভেবে ঘাবড়ে যাই।

ম্যাকলেনের লোকজন এডওয়ার্ডকে ধরে আনে। মাইল খানেকের

বেশী যেতে পারেনি। বরফের পর তাকে দেখতে পায়। ক্যাপ্টেন মুলার আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, দল ছেড়ে পালাচ্ছিল নাকি?

ও তো মরে গেছে, তাই না? বিড়বিড় করে জেকব বলে।—এখন আর ওর কথা ভেবে লাভ কি? ওর মনুষ্যত্ব খতম হয়ে গেছে।

শিকার করছিল। মিথ্যে করে বলে এলি। একলা বরফের পর যে লোকটা মারা গেছে তার জন্য এলিও মিথ্যে কথা বলতে পারে।

আমরা তাকে কবর দিতে যাই। কুঁকড়ে আছে এডওয়ার্ড। কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

নিশ্চয় ঘুমোচ্ছিল। এলি বলে।—ভালই হয়েছে, টের পায়নি। ঘুমের মধ্যে মারা যাওয়া ভাল।

বেসকে জিজ্ঞাসা করি, কোথায় যাব আমরা?

মরণের ভয় আমি করিনে আলেন। কিন্তু যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যাও...

আস্তানায় ফিরে আসে এলি। দরজা বন্ধ করে টলতে টলতে সে আগুনের কাছে যায়। এলির শক্তির পরিমাপ করা যায় না। এ তো দৈহিক শক্তি নয়। আগুনের পাশে বসে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

বিছানা ছেড়ে আমরা তাকে ঘিরে বসি। মরা মানুষের মত কোটরগত আমাদের চক্ষু। জামার তলায় হাড় দেখা যায়। এলি আমাদের দিকে তাকায় কিন্তু কথা বলে না।

জেকব বলে—খাবার এনেছ এলি?

আমি তার ঘরে ঢুকলাম। এলি বলে।—কি চমৎকার পাথুরে ঘরে থাকে সেনানীরা! ও সব ঘরে ঢুকলে বাইরের ঝড়ের টেরও পাওয়া যায় না।

আমি অবস্থাটা কল্পনা করবার চেষ্টা করি। সেনানীদের আস্তানা মাইলখানেক দূরে। অতটা দূর যাওয়া-আসার মেহনতের কথা উপলব্ধি

করবার চেষ্টা করি। তিনদিন কিছু খায়নি এলি। এডওয়ার্ড বরফের পর মাইল খানেক হেঁটেছে, তাতেই মরা এডওয়ার্ডকে নিয়ে আসতে হয়েছে। আর এলি ফিরে এসে আগুনের কাছে বসেছে।

জাহান্নামে যাক শালারা। আমি বলি।

বল্লে, আজকে রাতেই একখানা রসদ বোঝাই ট্রেন আসবে। রেজিমেণ্ট ও কোম্পানীর নাম টুকে রেখেছে।

জেকব কর্তাদের গালমন্দ করে। পায়চারি করতে করতে গলা ছেড়ে খিস্তি-খেউড় করে। শেষ অবধি তার খিস্তি-খেউড়ে আস্তানা গমগম করতে থাকে।

ঢের হয়েছে! ক্লার্ক খেঁকিয়ে ওঠে।—এ পাপের শাস্তি, বুঝলে? তোমরা মানুষ নও। সাচ্চা মানুষ হলে এ দুর্ভোগ ভুগতে হত না। এ পাপের শাস্তি। যেমন কর্ম, তেমনি ফল! সঙ্গিনীদের নিয়ে বেহায়ার মত বসবাস করে যাচ্ছ, কোন লজ্জা ঘেন্না নেই। মাগী নিয়ে খেলা করছ কিন্তু তার জন্য কোন সঙ্কোচ বোধ কর না। ভগবানকে গালাগাল দাও, তাই তাঁর অভিশাপ নেমে এসেছে তোমাদের মাথায়। স্বাধীনতার আদর্শকে তোমরা দেবতার আসনে বসিয়েছ; কিন্তু সে আদর্শ আজ ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। আলেন ছোকরা একটা মাগী কোলে করে শুয়ে আছে। তোমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে কেনটন ভোগ করছে তার মাগীটাকে। চার্লসের স্বভাব এমন যে ভগবানের মুখ ফেলে সে মাগীর দিকে তাকাবে। নিজেদের মধ্যে হামেশা খুনোখুনির কেলেঙ্কারী লেগে আছে! ভগবানকে ডাকছি, তিনি যেন তোমাদের এই পাপের শাস্তি দেন। উর্ধে বাহু তুলে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে ক্লার্ক। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়···মরা মানুষের মত বিবর্ণ হয়ে যায় পরক্ষণে। একটু বাদেই সে মেজেতে নেতিয়ে পড়ে।

এলি তাকে ধরে তুলবার চেষ্টা করে। বলে, ধর না আলেন! ধরাধরি করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়। চোখ বুজে আছে ক্লার্ক—শ্বাস বইছে ঘন ঘন। জেকব তাকে ডেকে কথা শোনাবার চেষ্টা করে। সহসা শান্ত হয়ে পড়ে সে।

ক্লার্ক শুনছ, তোমার কথা আমরা মেনে চলব! বুঝলে?

আমি বেসের কাছে ফিরে যাই। ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। ডুকরে কাঁদছে কিন্তু দাপাদাপি করছে না। ধরা গলায় আমাকে বলে, আমি খারাপ মেয়ে নই আলেন! কিন্তু ও আমাকে অভিসম্পাত দিল— ভগবানকে শাস্তি দিতে বল্ল!

না না, কে বলেছে তুমি খারাপ মেয়ে! তুমি খারাপ মেয়ে নও! আমি বলি।

আর আমার ঘুম হবে না আলেন। যদি মরে যাই, তাহলেও শান্তিতে ঘুমোতে পারব না।

নীচু হয়ে আমি তাকে চুমু খাবার চেষ্টা করি; কিন্তু সে আমার মুখ সরিয়ে দেয়।—আমায় চুমু দিওনা আলেন।

চার্লি গ্রীনের সঙ্গিনী খেঁকিয়ে ওঠে, আমাকে শাপ দেবার কি অধিকার আছে ওর! ও কে? বিটলে মিনসে!

আঃ চুপ কর না আন্নি! চার্লি বলে।

আমি বেসের হাত ধরি। হাত খানা উলটে চেপে ধরি নিজের ঠোঁটে। বলি, তুমি ঘুমোও…ঘুমোও!

তারপর ক্লার্কের দিকে ফিরি। জেকব তার বাঙ্কে শুয়ে পড়েছে। কখানা হাড় নেতিয়ে আছে বিছানায়। এলি ভ্যানডিয়ারের বিছানার পাশে দাঁড়ান। ইহুদিটি তার পেছনে। তার জরাজীর্ণ কুঁজো চেহারাও আমাদের যে কারও মত নোংরা এবং অস্থিসার। তবু সে আলাদা।

এলি বলে, ওর জন্য আমার শঙ্কা হচ্ছে আলেন। একজন ডাক্তার হলে ভাল হয়।

ক্লার্কের দিকে তাকাই। বিছানায় নেতিয়ে আছে। শ্বাস প্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। ঘামও হচ্ছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত।

পেনসিলভানিয়ার আস্তানায় কোন ডাক্তার নেই। হাসপাতাল থেকে কোন শালা আসবে না।

তাহলে চল সেইখানেই নিয়ে যাই।—এলি বলে।

আমি মাথা ঝাঁকাই। আমি পারব না এলি! শরীরে একটুও বল পাই না।

আস্তানার চারদিকে তাকায় এলি। দেখি, তার উসকোখুসকো দাঁড়িওলা মুখ আস্তে আস্তে ঘুরছে। জেকবকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। চার্লি গ্রীন অসুস্থ—নড়বার শক্তি নেই। হেনরি লেনের পায়ে মস্তবড় দগদগে ঘা। কেনটন এমনভাবে আগুনের পাশে বসে আছে যে ভ্যানডিয়ারের চেঁচামেচি তার কানেও যায়নি।

তুমি যাবে? ইহুদিকে জিজ্ঞাসা করে এলি।

আমি যাচ্ছি এলি! নিশ্চয় যাব। আমি বলি।

যেখানে যা পাওয়া যায় তা-ই আমরা গায়ে জড়িয়ে নি। চার্লির সঙ্গিনী একখানা কম্বল আর একটা সায়া দেয়। অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় সে চার্লির গা ঘেঁষে থাকে। আমাকে কাছে ডেকে নেয় মেয়েটি। বলে, যদি জ্ঞান ফিরে আসে তো শাপটা তুলে নিতে বল।

শাপটাপ কিছু নয়। ছাড়া ছাড়া ভাবে বলে এলি।

তিনজনে ধরাধরি করে ক্লার্ককে নিয়ে চলি। এলি আমি আর ইহুদিটি। হাড়ের পর চামড়া ছাড়া কিছুই নেই তার শরীরে। ওজন বড়জোর নব্বই কি একশো পাউণ্ড হতে পারে। তবু এটুকু বোঝাও আমাদের পক্ষে দুর্বহ। কিছুতেই ধরে রাখতে পারছি না।

বাইরে বেরিয়ে আমরা তুষারপাতের মধ্য দিয়ে চলবার চেষ্টা করি। বৃষ্টিও পড়ছে তুষারের সঙ্গে। এ যেন জলার মধ্য দিয়ে চলা…প্রতি পদে পা আটকে যাচ্ছে জলকাদায়! খানিকটা পরেপরেই থামতে হয়েছে…দম নিয়ে নতুন করে হাঁটবার বল সঞ্চয় করতে হয়েছে। রসদখানায় যেতে-আসতে এই পথেই তো দুই মাইল হাঁটতে হয়েছে এলিকে! তবু ফিরতে হয়েছে শূন্য হাতে। আবার সে চলেছে আমাদের সঙ্গে। এমন কি আছে এলির মধ্যে? মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে আমি বুঝবার চেষ্টা করি। কোত্থেকে সে এত শক্তি পায়? আমরা সবাই শীর্ণ, কিন্তু এলি শীর্ণতর। আমাদের পায়ের অবস্থা খারাপ বটে, কিন্তু এলির পা তো পচা মাংসের দলা! তবু এলি হাঁটবার সময় ব্যথা পাচ্ছে বলে মনে হয় না। কাজ করবার দরকার পড়ে তো এলি করে দিচ্ছে। যখন শক্তিশালী লোকের দরকার, এলি কোত্থেকে যেন শক্তি সংগ্রহ করে। জেকব এলির মত নয়। জেকব আগুনের শিখা; কিন্তু এলি আত্মিক শক্তির আধার। জেকবের বুকে ঘৃণার বহ্নিজ্বালা, আর এলি প্রেমময়। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, যখন সব কিছু চুকে যাবে, তখনও বেঁচে থাকবে এলি। জেকব নিঃশেষে পুড়ে যাবে কিন্তু এলি বেঁচে থাকবে তখনও।

হাসপাতাল তিন-পোয়া মাইলের পথ। পাহার বেয়ে উপত্যকার মধ্যে যেতে হবে। পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা। হু হু করে বাতাসের ঝাপটা লাগছে। এ মুলুকে হাওয়া বইলেই এখানে লাগবে। পেছন ফিরে আমি পরিখার আশ্রয়গুলোর দিকে তাকাই। সব কটা যেন বরফের ঢিবি। জীবনের সাড়া নেই। চিমনির মুখে পর্যন্ত ধোঁয়া নেই। মনে ভাবি, ব্রিটিশরা এখন যদি ফিলাডেলফিয়া থেকে মার্চ করে আমাদের আক্রমণ করে তো কি হবে? অনায়াসে পরিখায় ঢুকে যেতে পারবে। কেউ বাধা দেবে না কি চ্যালেঞ্জ

করবে না। এক মগ ঝোলের বিনিময়ে অর্ধনগ্ন ভিখারীগুলো অনায়াসে তাদের মান ইজ্জত বিকিয়ে দেবে। একটি গুলির আওয়াজও হবে না। খেতে দেবে আমাদের। তারপর যার যার বাড়ী ফিরে যাব। সাদা ঢালুর দিকে চেয়ে থাকি। সবটা ঠাহর করে উঠতে পারিনা। কেন তাহলে আসছে না ব্রিটিশরা? কেন চুকিয়ে দিচ্ছেনা সবকিছু?

আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছি। বেলা পড়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে ইতিমধ্যে। আমি মাথা হেঁট করে চলেছি; কিন্তু এলি আমাদের পথ দেখিয়ে নিচ্ছে। যখনই তার দিকে তাকাই, দেখি মাথা উঁচু করে পথ খুঁজছে। ইহুদিটির ফ্যাকাশে সাদা চেহারা কুহেলিকাময়। হঠাৎ আমার কেমন মনে হয় যেন ঘোর অন্ধকার পথে চলেছি···পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা বরফ ঘেরা অন্ধকার পথ। মাথাটা কেমন হালকা লাগে। নিজের পা বা ভ্যানডিয়ারের ওজন কিছুই অনুভব করতে পারি না।

দম নেবার জন্য আবার থামা হয়। রাস্তার ওপারে জয় পাহাড়ের ঢালুতে একটি শান্ত্রী নজরে পড়ে। অর্ধচন্দ্রাকার এক ছাউনির তলায় দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটা কামানের মুখ দেখা যাচ্ছে। পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে আছে শান্ত্রীটি।

এই পথটা সংক্ষেপ। এলি বলে।

আঁকাবাকা পথ ধরে আমরা হাসপাতালের দিকে এগোতে থাকি। টানা লম্বা একখানা কাঠের ঘরে হাসপাতাল। দরজার পাশে দাঁড়ান শান্ত্রীটি আমাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি মনে হয়, এমনি দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

এলি দরজায় ধাক্কা মারে। এক অফিসার দরজা খুলে দেয়। দাড়ি গোঁফ কামান লম্বা লোকটি। তার কাঁধে পদমর্যাদার প্রতীক চিহ্ন। আমি তাকে চিনিনা।

কে তোমরা? সে জানতে চায়।

আমরা পেনসিলভানিয়ার ব্রিগেডের লোক। সঙ্গে রোগী আছে।

তোমাদের দলে তো ডাক্তার আছে। নেই?

ডাক্তার না কচু আছে! নেই যে তা মশাই ভাল করেই জানেন। আমি খেঁকিয়ে উঠি।

কথা বলবার সময় একটু ভদ্রভাবে বলবেন স্যর! না হলে চাবকে শিখিয়ে দেওয়া হবে।

গোল্লায় যাও! আমি বলি।—হলপ করে বলছি, গোল্লায় যাও!

অপরাধ নেবেন না! এলি অনুনয় করে বলে।—আধা-উপবাসী আমরা—হাঁটবার শক্তি নেই।

বেশ বুঝতে পারি যে আমাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা যায়। মনে মনে তার আঁচ করছে অফিসারটি। যে আধা জানোয়ারদের তারা পরিচালনা করছে, ইদানিং অফিসার মহলে তাদের সম্পর্কে খানিকটা বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে।

কুচকাওয়াজ বন্ধ। লেফটন্যাণ্ট ও ক্যাপ্টেনরা মাঝেসাঝে দেখাশোনা করে যাচ্ছে। এদের পরিদর্শনের মধ্যেও অনেক দিনের ফাঁক থাকে। পাহাড়ের পর একটি শান্ত্রী মাস্কেটে ভর করে গুটিসুটি দিয়ে আছে। তার গায়ে সঙ্গীদের দেওয়া জামা কাপড় জড়ান। যে যতটা দিতে পারে তাই দিয়ে দিয়েছে। জানোয়ারের মত আমাদের গর্ত থেকে বেরুতে দেখে তাদের মনে হরেকরকম আজগুবি চিন্তার উদয় হয়। বাইরের প্রচণ্ডতম শীতের শঙ্কাতেই এই জানোয়ারগুলো এখনও একসাথে আছে। এই ভয়ের সঙ্গে জুটেছে দুর্বলতা। দুর্বলতার দরুণ তারা বহু দূরের বাড়ীর পথে পা বাড়াতে সাহস পায় না। তবু এদের হাতে বন্দুক আছে। অফিসারদের দিকে বন্দুক ঘুরিয়ে একসাথে যদি এরা বেরিয়ে পড়ে তো সব চুকেবুকে যাবে।

আমাদের নিরীক্ষন করে ফৌজদারটি লক্ষ্য করে দেখে যে আমরা নিরস্ত্র। বলে, হাসপাতাল ভরতি। কোন বেড খালি নেই। ভারনামের হাসপাতালে চেষ্টা করে দেখ। ভারনামের হাসপাতাল এখান থেকে কমসে কম মাইল খানেক দূরে।

এলি কোন কথা বলে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার পাতলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সামান্য সামান্য ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ওলন্দাজ ভাষায় আমস্তারদমের ঢঙে ইহুদিটি বলে, সাথীকে মরবার মত একটু জায়গা দিন। শত্রুদেরও তো এ জায়গা আমরা দিয়েছি! ওর মুখে সামান্য কিছু গরম খাবার ঢেলে দিন।

ফৌজদারটি ওলন্দাজ ভাষা জানে না। ইহুদিটির অদ্ভুত উচ্চারণ ভঙ্গীতে তা আরও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে।—ইংরেজিতে বল। খেঁকিয়ে ওঠে অফিসার।—পল্টনে তোমাদের জাতের লোক অনেক আছে।

আর এক মাইল হাঁটবার শক্তি আমাদের নেই। অতদূর যেতে পারব না। আমি অনুনয় করে বলি। অনুনয় করবার জন্য ঘৃণা হয় নিজের উপর।

শীতে জবুথবু হয়ে শান্ত্রী দুটি চেয়ে আছে। তাদের দাড়িতে শ্বাস-প্রশ্বাসের জমাট ফেনা। মনে হয়, নড়বার ক্ষমতা নেই। আবাক হয়ে ভাবি, এক এক করে ক্লার্কের মত এইখানে এমনিভাবে আসতে আর কতদিন বাকী! গোঙাচ্ছে ক্লার্ক। কথাও বলছে। প্রলাপ।

এখন আর এক মাইল হাঁটতে পারব না। আমি বলি।—অতটা দূরে যেতে পারব না।

আপনাদের মেজেয় একটুখানি জায়গা করে দিন। এলি বলে।—মেজেয় ছ ফিট জায়গা দিলেই হবে। লোকটাকে আর এখানে রাখলে শীতে জমে যাবে।

ফাঁসির মঞ্চেও ছ ফিটের বেশী জায়গা তোমাদের লাগবে না।

নিউইয়র্ক শহরের লোক কিম্বা ইংরেজের সন্তান। নাকি সুরে কথা বলার ঢঙেই বোঝা যায়।

আমরা ভেতরে যাচ্ছি। এলি বলে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হয় আমার। ভয়ে আঁতকে উঠি। আমি জানি, একবার এলি যদি চটে যায় তো সে নিজেও বাঁচবে না, আর যে তার পথে দাঁড়াবে তারও নিস্তার নেই! আমি চেঁচিয়ে বলি, শূয়োরটা গোল্লায় যাক এলি! চল আমরা অন্য হাসপাতালে যাই!

ভ্যানডিয়ারকে নিয়ে এগিয়ে যায় এলি। আমারাও যাই সঙ্গে সঙ্গে। আমি তাদের থামাবার চেষ্টা করি। অফিসারটির কোমরে তরোয়াল। মুঠোয় হাত দেয় সে।

বেঁটে একটি লোক তখন অফিসারকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। বেঁটে লোকটির কোমরে রক্ত-ছিটান লম্বা একখানা ছাই রঙের এপ্রন জড়ান…চোখে চশমা…দাড়ি গোঁফ কামান…লম্বা সরু নাক এবং টুকটুকে লাল পুরু ঠোঁট লোকটির। তার পাতলা চুল মাথার পেছনে জড়ো হয়েছে।

কি হচ্ছে মারগট? ধমকে ওঠে লোকটি।—রোগী রয়েছে দেখছনা!

হাসপাতালে জায়গা নেই।

আমার হাসপাতালের ব্যাপারে নাক গলাতে এস না। ওকে ভেতরে নিয়ে এস।

অফিসারটি তখন বেঁটে লোকটির দিকে কটমট করে তাকায়। ডাক্তার তার শাসানির পরোয়া না করে পেছনে ফিরে হাসপাতালের মধ্যে ঢুকে যায়। আমরা তখন ভ্যানডিয়ারকে ভেতরে নিয়ে যাই। কাঠের বেড়া দেওয়া ঘরখানা বড় জোর বিশ হাত লম্বা। তাহলেও শ'খানেক লোক আছে এর মধ্যে। লম্বালম্বি একটানা বিছানায় শুয়ে আছে।

কেউ কেউ ঘুমোচ্ছে। কিন্তু বেশীর ভাগ রোগীই কাতরাচ্ছে। ভারী ঠাণ্ডা জায়গাটা। বিরামহীন কাতরানি কানে আসে। একটু বাদে আর ওতে কিছু এসে যায় না।

আমাদের এখানে বড্ড গাদাগাদি। ডাক্তার বলে।—রোগী আসছে আর যাচ্ছে। প্রায় সমান সমান। জননী বসুন্ধরার চাইতে আমাদের এ জায়গা মোটেই বেশী গরম নয়। পেছন দিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা ছোট্ট জায়গায় সে আমাদের নিয়ে যায় এবং হাতের ইশারায় ভ্যানডিয়ারকে বিছানায় শুইয়ে দিতে বলে। তাকে শুইয়ে দিয়ে আমরা তার গায়ের ঢাকনি খুলে ফেলি। ছোট্ট একটা লোহার উনুন আছে ঘরে। ভীড় করে তার কাছে যাই।—যে নোংরা, বাব্বাঃ! কি করে যে তোমাদের একজনও বেঁচে আছে ভেবে অবাক হয়ে যাই। নোংরা—নোংরা! দাড়ি কামাও না কেন বলত? সে যাক, একে একবার দেখা যাক! বলত কি হয়েছে?

কঠোর মর্মান্তিক ভাষায় আস্তে আস্তে এলি তাকে সব কথা খুলে বলে।

জানি হে, জানি! এলির কথা শেষ হবার আগেই মাথা নেড়ে বলে ডাক্তার।—জানি, এমনি অবস্থায় মানুষ পাগল হয়ে যায়। কিন্তু এ রোগ সারাবার ওষুধ তো আমার জানা নেই? কি আশা কর তোমরা। একজন সুস্থ মস্তিকের লোকও যে এখানে আছে এতেই তো আমি অবাক হয়ে যাই। যদি কেউ থাকে তো আমি তাদের একজন। কিন্তু আমিও আর বেশী দিন থাকতে পারব না। কি করতে পারি আমি? পারি আমি এর মধ্যে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে? আমি কি ভগবান?

ইহুদিটি মোলায়েমভাবে বলে, সত্যিই আপনি দেবতা। জানেন, সবাই দেবতা ছিলাম আমরা। এ আস্থা রাখতে হবে যে আমাদের

অন্তরে ভগবান রয়েছেন। আগেও উপবাস করেছি। সাইবেরিয়ায় হেঁটে যাবার পথে দু'হাজার লোক মরতে দেখেছি। মানুষের দেবত্বের পর নিশ্চয় আস্থা রাখতে হবে। তাহলেই মৃত্যুভয় জয় করা যায়। দেবতা ছেড়ে যাবেন, মৃত্যু সম্পর্কে এইটেই সব চাইতে বড় ভয়।

ডাক্তার চশমা খুলে ফেলে। এপ্রনে চশমা মুছে ওলন্দাজ ভাষায় জিজ্ঞাসা করে, কে তুমি?

পোলাণ্ডের একজন ম্লেচ্ছ ইহুদি। আমি বলি।

তুমি কি স্পিনোজার (১) দর্শন পড়? জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার।

আপনি কি এই ভাবে ওকে মরতে দেবেন? ক্লার্ককে দেখিয়ে সে বলে।

ঠিক আছে, গামলাটা এদিকে দাও। এলি এগিয়ে ধরে। ডাক্তার ক্লার্কের হাত খুলে ফেলে···আস্তে আস্তে শীস দিতে থাকে, শিরা পরীক্ষা করে। এক টুকরো নেকড়া নিয়ে সে হাতখানা ধুয়ে যতটা সম্ভব পরিচ্ছন্ন করে দেয়। গজ গজ করে বলে, চান করাবার জো আছে! বরফের মত ঠাণ্ডা এই নরককুণ্ডে হাসপাতাল বানিয়েছে! আমিও তোমাদের মত নোংরা। মলাটটা চোস্ত হলে কি হয়, ভেতরে তোমাদের মত নোংরা। ভ্যানডিয়ারের হাত থেকে ক্ষুদে একটা জিনিস খুটে আনে ডাক্তার।—দেখছ? উকুন। সবাই উকুনের ডিপো তোমরা। আমি কি করব?

ছুরি হাতে নিয়ে সে ভ্যানডিয়ারের হাতের একটা শিরা কেটে দেয়। তারপর হাতখানা মেলে ধরে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে

(১) স্পিনোজাঃ স্পেনের ইহুদি দার্শনিক (মৃত্যু—১৬৭৭)। তিনি একটি মাত্র অদ্বৈত অনন্ত স্বত্বার স্বীকার করেন। বস্তু, মন ও ব্যক্তি তাঁর মতে, এই মূল স্বত্বার পরিবর্তনশীল প্রকাশ মাত্র।

পড়ে গামলার মধ্যে। কালচে লাল রক্ত। যে আস্তে আস্তে রক্ত আসছে তাই দেখে মনে হয়, ক্লার্কের শরীরেও বেশী রক্ত নেই। এলিকে জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার, কদিন আগে খেয়েছে ?

তিনদিন খাওয়া জোটেনি। কারও না।

আবার শীস দেয় ডাক্তার।

বড্ড দুর্বল, এ ভাবে রক্ত পড়লে মারা যাবে। এলি বলে।

আর কি করতে পারি ? আমি ভগবান নই, তা তোমাদের ঐ ইহুদি যাই বলুক না কেন! জ্ঞান ফিরে না আসা অবধি ঐভাবে রক্ত ঝরাতে হবে। ও বাঁচবে না কিছুতেই।

ক্লার্কের হাত থেকে ঐভাবে রক্ত পড়তে দেখে অবাক আগ্রহে আমরা তার বিছানার চারপাশে ভীড় করে দাঁড়াই। ক্লার্ক কথা বলতে শুরু করে। এলির খোঁজ করে। ওস্তাদ হাতে চটপট রক্তের প্রবাহ বন্ধ করে দেয় ডাক্তার। আঙুল দিয়ে টিপে শিরাটি জোড়া দিয়ে সে চটপট পট্টি বেঁধে দেয়।

এই তো আমি রয়েছি ক্লার্ক। এলি বলে।

জেকব কোথায় ?

তোমার কথায় তার মন ভেঙে গেছে। আসবার শক্তি ছিল না। আমরাই তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছি ক্লার্ক!

কে কে এসেছে ?

আমি, আলেন আর ইহুদিটি।

মস্ত বোঝা। আলেনের মাথায় পাপের বিরাট বোঝা। ও যাতে মাগীটাকে ছেড়ে দেয় তার জন্য অনুরোধ করবে এলি ?

এলি জবাব করে না।

বল, অনুরোধ করবে তো ? ক্লার্ক চেঁচিয়ে ওঠে।—আমি তো মরতে চলেছি!

এলি রাজী হয়। আমি বলি: ক্লার্ক, তুমি আমায় অভিসম্পাত দিচ্ছ? আমি তাকে ভালবাসি।

আমাকে কথা দাও আলেন।

মাথা নেড়ে আমি সম্মতি জানাই। এলি মুখ ফিরিয়ে নেয়। ক্লার্ক চোখ বোজে।

ওকে ঘুমোতে দাও। ডাক্তার বলে।—আমার সঙ্গে এস।

পেছনের দিকে একটা ঘরে নিয়ে যায় আমাদের। একখানা টেবিল, একটা বিছানা এবং একটা অগ্নিকুণ্ড আছে সে ঘরে। আগুনের কয়লা নিভু নিভু হয়ে এসেছে। টেবিলের পর একখানা কাঠের পিরিচ রেখে সে কয়েক টুকরো ঠাণ্ডা মাংসভরা একটা পাত্র বার করে।

খুব বেশী নেই, বুঝলে!

মাংস দেখে আমি লোভার্ত হয়ে পড়ি। এলি নড়ে না। ইহুদিটির মুখে ম্লান হাসি।

এ দিয়ে তো আর গোটা পল্টন খাওয়ান যাবে না! এলি বলে।

মহৎ হবার চেষ্টা কর না। ডাক্তার বলে ওঠে।—তোমার পেট ভরবে তো! তারপর ইহুদিটির হাসি দেখে বলে: গোল্লায় যাও, নোংরা ভিখিরী যত! ফাঁসিতে লটকাবার জন্যও ইংরেজরা তোমাদের মত নোংরা লোকের গায়ে হাত দেবে কিনা সন্দেহ।

আমরা চুপ করে থাকি।

খানিকটা রাম খাও। ডাক্তার বলে। তিনটি ছোট কাপে রাম ঢেলে বলে, এইটুকু না খেলে আর প্রাণ নিয়ে আস্তানায় ফিরতে হবে না!

রামে তিনজনেরই শরীর চাঙা হয়—নেশাও হয় খানিকটা। পেটের মধ্যে রামের ঝাঁঝ এবং বাইরে অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপে বেশ আরাম লাগে। ডাক্তার চেয়ারে বসে আছে—অদ্ভুত জন্তুর নমুনা হিসাবে নিরীক্ষণ

করছে আমাদের। তারপর ইহুদিটিকে লক্ষ্য করে ওলন্দাজ ভাষায় বলে, এখানে তোমরা আর আমরাই সভ্য। কুসংস্কার অজ্ঞতা আর নোংরামিভরা এই অসভ্যের দেশে একমাত্র তোমরা আর আমরাই সভ্য। মাত্র একটা জিনিস এরা বোঝে। পরস্পরকে ঠকাবার ও খুনোখুনি করবার স্বাধীনতা চায়···ইংরাজদের অধীনতা থেকে মুক্তি চায়। মানে, ঠকামি জোচ্চোরি আর ঘৃণা করবার অবাধ অধিকার চায়—দেশটাকে অজ্ঞতা ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে ডুবিয়ে দেবার অবাধ সুযোগ চায়। বোকা বলে আমি এদের সঙ্গে জুটেছি। কিন্তু তুমি এসেছ কেন?

ইহুদিটি ঘাড় ঝাঁকানি দেয়।

নিজের জাত ভাইদের জন্য একটা স্থায়ী বাস ভূমির স্বপ্ন নিয়ে এসেছ, কেমন তো!

সমস্ত মানুষের দেশ পত্তন করতে এসেছি।

তা দেশটাও তো মস্ত! হতে পারে। কিন্তু কি জান, ইয়োরোপের বল কি এখানকার বল, মানুষ সর্বত্রই এক রকম। যদি এরা জেতে, অবিশ্যি তার কোন আশাই নেই, তবু যদি এরা জেতে তো তোমাদের তাড়িয়ে দেবে। তোমরা ইহুদি—ম্লেচ্ছ!

না, না, তা দেবে না। মোলায়েম ভাবে বলে ইহুদিটি;—বলতে গেলে গোটা দুনিয়া পাড়ি দিয়ে এসেছি আমরা···

বিতাড়িত হয়ে, কেমন তো!

না। আমরা এখানে এসেছি সমস্ত মানুষের জন্য দেশ গড়বার স্বপ্ন নিয়ে। এ হবে নতুন পৃথিবী। পুরনো জগতের দিন ফুরিয়েছে। আরও কিছু সময়···হয়ত আরও দু'তিন শো বছর লাগবে। কিন্তু এর মধ্যে নতুন জগতের মানুষ তৈরী হবে। এই তো সবে শুরু। পণ্টন কিছুই না—শুধু একটা স্বপ্ন বই নয়! বুঝলেন? পণ্টন চলে যায়, কিন্তু

স্বপ্ন মরে না। ফিলাডেলফিয়ায় একটা লোকের বাড়ীতে ছিলাম। সে-ই এই বিপ্লবের স্রষ্টা। তার নাম হেম সলোমন। সেও আসছে পোলাণ্ড থেকে। পোলাণ্ড আমাদের পক্ষে ইস্কুলের মত। পোলাণ্ড লড়াই করে যাবে কিন্তু স্বাধীন হবে না। ওটা স্কুল। মানুষের মধ্যে দেবত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল করতে হয় তো ঐ দেশই তার উপযুক্ত স্থান।

আড়চোখে আমাদের দিকে তাকায় ডাক্তার।—এ বড় সুবিধের দেবতা নয়। এস, এ নিয়ে আলোচনা করা যাক। শুধু খেয়ে পরে যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না, তেমনি খাওয়া-পরা বাদ দিয়েও বাঁচা সম্ভব নয়। খাবার নেই। এ শীত আমি কাটাব না। যদি তোমাদের স্বপ্নের দেশ গড়তে পার তো সন্তান-সন্ততিদের এই অবিশ্বাসী বিজ্ঞানীর কথা বল। বল, সে বলত, সব বাজে কথা!

আবার আমরা ক্লার্কের কাছে ফিরে আসি। তখনও ঘুমোচ্ছে সে। দাড়ির ফাঁকে যতটুকু মুখ দেখা যায় তা বরফের মত সাদা।

বেঁচে উঠবে কি? এলি জিজ্ঞাসা করে।

কি করে বলব? ডাক্তার বলে ওঠে।—তাছাড়া, কি এসে যায় তাতে? তোমাদের কারও চাইতে খুব বেশী দূরে যাবে না।

তখন আমরা ক্লার্কের গায়ে জড়ান কোট দুটো এবং সায়াটা তুলে নি। একটা কোট এলিকে এবং বাকীটা ইহুদিটিকে দিয়ে দি। সায়াটা আমি গলায় মাথায় জড়িয়ে নি। তারপর তিন জনেই বেরিয়ে পড়ি। মুখে প্রচণ্ড শীত লাগে—ছুরিতে কেটে যাচ্ছে বলে মনে হয়। মামুলি কৌতূহল বশে আমি আস্তিনে থুথু ফেলি। আর দুজনেও লক্ষ্য করে আমাকে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করে। এক গুণতে না গুণতেই থুথুর ছোট ছোট গোল ছিটেগুলো তুষার কণার সঙ্গে মিশে যায়।

বাব্বাঃ! ফিসফিস করে বলে এলি।

এত ঠাণ্ডা জীবনে দেখিনি। এলি কানাডায় গেছে। শীতকালে আমিও হাডসন নদীর উজানে পাহাড়িয়া অঞ্চলে বাস করেছি। তীব্র ঠাণ্ডা পড়তে দেখেছি। কিন্তু এমন শীত কোন কালেই দেখিনি। এলিও দেখেনি এমন দুরন্ত শীত। সর্বপ্রকার আশ্রয়হীন গ্রহের বুকে প্রচণ্ড হিমধারা নামছে। এ ঠাণ্ডা যেন জীবন্ত আর হিংসুটে—মানুষের দেহ মন ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। গোটা আমেরিকার অধিবাসীদের জীবনে শীতের এমন দুরন্ত প্রকোপ কেউ কোনদিন দেখেনি। কারও মনে পড়ে না এমন প্রচণ্ড শীতের কথা।

শুকনো বালির মত তুষারপাতের মধ্য দিয়ে পথ করে সন্তর্পনে চলেছি আমরা। এক পা এগোই আর সেইখানেই অপর পা রেখে আবার পা বাড়াই। রাত হয়ে গেছে কিন্তু আকাশে চাঁদ নেই। নক্ষত্রগুলো মাণিকের মত মিটিমিটি জ্বলছে। সাদা থানের মত বরফ জমে আছে। কোথাও কোন শান্ত্রী নেই। আমরা ছাড়া বাইরে কোন প্রাণী নেই।

পেনসিলভানিয়ানদের আস্তানায় ফিরে যেতে একটি ছোটখাটো পাহাড়ে চড়তে হবে। শ দুই ফিট উঁচু। কিন্তু পাহাড়ে চড়া না চড়ার সঙ্গে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত। ঢালু পাহাড়ের গা যেন নরকের পথ। এক পা এগোই আর হোঁচট খাই; আবার দু পা পিছিয়ে টাল সামলে নিতে হয়। পা পিছলে বরফের পর গড়াগড়ি খেতে হচ্ছে। জামা কাপড়ের প্রতিটি ভাঁজ ও ফুটোর মধ্যে বরফের কুচি ঢুকছে। থু থু করে মুখ থেকে বরফের গুঁড়ো ফেলে দিচ্ছি আর ঠাণ্ডায় জমে ঠোঁট দুখানা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। একটু বাদে আবার উঠে দাঁড়াই এবং এগিয়ে চলি। আর ভাবতে পারি না। মনটা কেমন বিকল হয়ে যায়। দেহটা তবু চলে। দেহটা যেন আমি ছাড়া আলাদা একটা যন্ত্র: জীবনের বাতি যতদিন নিভে না যাবে ততদিন চলতে থাকবে।

একবার পেছন ফিরে তাকাই। ইহুদিটি বরফের পর শুয়ে আছে, নড়ছে না। এলি আমাকে ডাক দেয়। কিন্তু বাতাসের ঝাপটায় তার কথা শুনতে পাই না। আমি ওদের চাইতে উপরে দাঁড়ান। এলি ইহুদিটির কাছে ফিরে যায়। আচমকা আমার সম্বিত ফিরে আসে। মনে মনে ভাবি, দশ পা নীচে নাবা মানে আবার দশ পা ওঠা। বার বার মনে হয় কথাটা। অনেক কথাই তখন মনে ভীড় করে। আমি কাঁদতে শুরু করি। কিন্তু অশ্রুকণাও চোখের পাতায় জমে যায়।

এলির কাছে ফিরে আসি। ইহুদিটি বলে, আমাকে ছেড়ে যাও। আমাকে খুঁজে বার করতে ওদের খুব দেরী হবে না।

আমরা তাকে দাঁড় করাই এবং তিনজনে এক সঙ্গে চলতে থাকি। সীমাহীন রাত্রির অসীম পথে তিনজনেই একসাথে হেঁটে চলি। আমি নিজে সময় ও গতির সমস্ত বোধশক্তি হারিয়ে ফেলি। পথ দেখিয়ে চলবার মত যে কোন একজন লোক একান্ত প্রয়োজন।

অবশেষে আস্তানায় ফিরে আসি। তিনজনেই ধপ করে বসে পড়ি মেজেতে। ইহুদিটি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। চোখ টান করে বিভীষিকাময় দৃষ্টিতে এলি চেয়ে থাকে আগুনের দিকে। আমি কাঁদতে শুরু করি।

বেস আমার হাত ঘষে দেয়, আমাকে চুমু খায় এবং নানাভাবে আমার শীত তাড়াবার চেষ্টা করে। টেনে আমাকে সে আগুনের কাছে নিয়ে যায়। দূরাগত কথার মত শুনতে পাই, ক্লার্কের কথা জেকবকে বলছে এলি।

তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ি। নানাভাবে বেস আমাকে গরম করবার চেষ্টা করে। বেশ জানি, তারও শক্তি সামান্যই আছে। তবু তার আপ্রাণ চেষ্টা দেখে অবাক লাগে। থর থর করে শ হি

অস্ফুট একটা শব্দ হচ্ছে ঠোঁটে। ঠোঁট কেটে গেছে এবং রক্ত ঝরছে তখনও।

বেস বলে, বিশ্রাম কর, বিশ্রাম কর ডার্লিং।

হাত দিয়ে আমি তার গরম মুখ হাত এবংস্তনযুগ অনুভব করি। প্রাণের পরশ পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠি। জীবনের অনুভূতি লাভের জন্য বেসকে আঁকড়ে ধরি।

এই ভাবেই ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু স্বপ্নের ঘোরে ঘুম ভেঙে যায়। তন্দ্রার ঘোরে বলে উঠি, ক্লার্ক আমায় শাপ দিয়েছে…সে মরতে চলেছে…না না না তোমাকে তাড়াতেই হবে। সে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে!

বেস ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। অমন ভয়ার্ত চীৎকার আমি জীবনে শুনিনি।

আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি। কানে কানে বলি, ও কিছু নয়, স্বপ্ন দেখছিলাম।

কিন্তু তার ঘুম টুটে যায়। বেশ বুঝতে পারি যে শীতের রাতের ভয়ে এবং আমাকে ছেড়ে যাবার শঙ্কায় সে আকুল হয়ে পড়েছে।

—ছয়—

তবু আমরা বেঁচে থাকি। দিন যায়, দিনের পর দিন চলে যায়… দিবারাত্র মিশে এক কুৎসিত একঘেয়েমি সৃষ্টি করে, তবু প্রাণে বাঁচি। এই সময় এক অদ্ভুত জিনিস টের পাই। মানুষের শক্তি সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা জন্মে। মনে হয়, স্তরে স্তরে সাজান মানুষের জীবনীশক্তির একটার পর একটা স্তর কেড়ে নেওয়া যায়। সব কটি স্তর সরিয়ে নিলেও যেন তলা থেকে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি উদয় হয়ে জীবন বাঁচিয়ে রাখে।

তাই বেঁচে আছি আমরা। কতদিন চলে যায় মনে নেই। আমাদের আস্তানায় এক নতুন সঙ্গী আসে। তার নাম মেয়ার স্মিথ। এককালে ফিলাডেলফিয়ায় হোটেলওলা ছিল। ইহুদিটি অসুস্থ। মস ফুলারের কথা মনে পড়ে। ইহুদিটিও তারই মত অনবরত খকখক করে কাশে।

এলি বলে, ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে। ঠাণ্ডা লেগে ফুসফুস জমে গেছে। ঐ যে সাইবেরিয়া না কি বলেছে, হয়ত সেইখানেই লেগেছে। ফুসফুস একবার জমে গেলে আর কোনদিন তা সারে না।

ওর খকখক করে কাশের শব্দ ভুলে থাকবার জন্য আমরা জটলা করে বসি। ইহুদিটির দিকে চেয়ে বাঙ্কের উপর তার অস্থিসার খাঁচার দিকে তাকালে আপনা থেকেই এমন বিচ্ছিরি কথা মনে জাগে, যা আমরা কেউ-ই ভাবতে চাইনা।

খ্রীস্টও ইহুদি ছিলেন। জেকব বলে। কথাটা জেকবের মুখে অদ্ভূত শোনায়।

ইহুদিটির নাম আরন লেভি। তার সঙ্গে সবাই সদয় ব্যবহার করি। আমাদের নিজেদের কথা আলাদা। আমরা সবাই এই দেশের জল-হাওয়ায় মানুষ। কিন্তু ইহুদিটি এসেছে দূর দূরান্ত থেকে। এই দূরত্বের ব্যবধান আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে। নিঃসঙ্গ সে। তার নিঃসঙ্গতা আমাদের ব্যথা দেয়। ঘুমের ঘোরে সে এমন ভাষায় কথা বলে যার এক বর্ণও আমরা বুঝি না।

স্মিথ এখানে আসবার দুদিন বাদেই টের পায় যে লেভি ইহুদি। বলে, খুনী ইহুদিদের সঙ্গে কিছুতেই আমি একঘরে থাকব না। যে খানকির বাচ্চারা খ্রীস্টকে খুন করেছে, কিছুতেই থাকব না তাদের সঙ্গে।

জেকব তার গলা টিপে প্রায় মেরে ফেলবার উপক্রম করে। টেনে

আমরা তাকে সরিয়ে দিই। এরপর সাতদিন পর্যন্ত স্মিথের গলায় জেকবের আঙুলের দাগ দেখা গেছে। জেকব আমাদের ছেড়ে দেবার অনুরোধ জানায়। বলে, ওকে খুন করলে কোন পাপ হবে না। ওর চাইতে অনেক ভাল ভাল লোক মরতে দেখেছি।

স্মিথ ভড়কে যায়। লাফ মেরে বন্দুক রাখার তাকের কাছে গিয়ে মাস্কেট হাতে করে সে জেকবের দিকে রুখে এগোয়। তারস্বরে বলে, খুন করব তোকে। সরে যাও তোমরা! গায়ে হাত দিয়েছে যখন, তখন ওর রক্ষা নেই।

এলি এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে মাস্কেটটা কেড়ে নেয়। এক মোচড় দিতেই সে ছেড়ে দেয়। এলি শান্তভাবে বলে, ভারী বদমেজাজী ছোটলোক তো তুমি!

স্মিথ হামাগুড়ি দিয়ে তার বাঙ্কে যায় এবং বাকী রাত চুপ করে শুয়ে থাকে। তার উপর করুণা হয়। ঘৃণা করবার অতীত অবস্থায় চলে গেছি আমরা। স্বচক্ষে দেখছি, জেকবের আমার স্মিথের ও হেনরি লেনের মাথা বিগড়ে যাচ্ছে। এলি মারা গেলে কি যে হবে ভেবে আমার দারুণ শঙ্কা হয়। একদিন সত্যি সত্যিই আমি তাকে না মরতে অনুরোধ করি। নানা ভাবে কাকুতি জানাই। এলি হাসে। আমাদের মধ্যে একমাত্র সে-ই এখনও হাসতে পারে।

তারপর আমরা খানিকটা গল্পসল্প করি। বেস গুটিসুটি মেরে আমার পাশে এগিয়ে আসে, হাত দিয়ে ধরে থাকে আমাকে। সব সময় সে আমাকে আঁকড়ে থাকতে চায়। ওরা বলে, যখন আমি পাহারা দিতে যাই—ভয়ে সে ছটফট করে।

একবার বাইরে গেলে আর ফিরে আসবে না। একদিন আমায় বলে।

রবে ছ তো!

না, আর কাকেও চাইনা। সে বলে।

আমার পাশে উঠে বসে বেস। ব্রিটিশদের আক্রমণ এবং তার প্রতিবন্ধক নিয়ে আলোচনা হয়। কেনটন ছাড়া আর সবাই আছি এখানে। সে পাহারায় গেছে।

আর আক্রমণ হবে না। আমি বলি।—লড়াই খতম হয়ে গেছে। ছ'মাসের মধ্যে পল্টন উধাউ হয়ে যাবে। কেন আক্রমণ করবে বল ?

তুমি ভুল করছ আলেন। এলি বলে।

গ্রীন বলে, শুনছি ছাউনিতে এখন নাকি মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য আছে।

মিথ্যে কথা! ঝাঁঝি মেরে বলে জেকব।

তোমার মাথায় ভুত চেপেছে জেকব। এই ছাউনিতে জন আদমস্ বা স্যাম আদমস্ আছে ? টমাস জেফারসন আছে ? ডিকিনসন ? শেরম্যান ? হ্যানকক ? নিরাপদে বসে তারা ভুঁড়িতে হাত বুলোচ্ছে। একবার যুদ্ধে জিতি, তারপর ভুঁড়িতে হাত বুলোনো বার করে দেব। সত্যি বলছি, রক্ত ঘাম বার করে ছাড়ব।

চার্লি বলে, তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে! ওরা তো রাজা হবে! রাজা জন আদমস—রাজা স্যাম। আদমসকে আমি চিনিনে! ব্যাটা কুঁড়ের বাদশা। জীবনে একদিনও কাজ করে দেখেনি। আমার দোকানে এসে বলত, চার্লি, বিপ্লব নিয়ে চমৎকার একখানা পুস্তিকা লিখেছি। আদর্শের জন্য এটা ছেপে দাওনা চার্লি! কিসের আদর্শ ? হ্যানককের আদর্শ তো! ব্যাটা জোচ্চোর জলদস্যু! যদি দশ শিলিং দিয়ে কাগজ কিনতে বলতাম তো রেগেমেগে গালাগাল শুরু করত। হ্যানককের কথা বলছি শোন। ব্যাটা পাকা চোরাকারবারি। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বেশ একটি দল পাকিয়েছে। তোমরা দেশ গাঁয়ের লোক, এ ব্যাপার বুঝবে না। সব শালা চোরাকারবারি। আমরা যদি ব্রিটিশ মাল কিনতে

বাধ্য হই তো ইণ্ডিজ দ্বীপ আর ওলন্দাজদের কাছ থেকে চোরাই মাল চালান দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে যে! কিন্তু আমাদের মাল কে কিনেছে? ইংলণ্ড! কাজেই হ্যানকক আর তার বন্ধুবান্ধব আদমসকে সামনে রেখে লড়াই বাঁধিয়ে দেয়। আমিও ভীড়ে গেলাম। চাঁদপনা একটি মেয়ে আছে আমার। সে আমার মাথায় একটা মজার সুর ঢুকিয়ে দেয়। 'ইয়াংকি-ডুডল' গেয়ে সে আমাকে বিদায় দেয়। ভারি বজ্জাত মেয়ে। এখন হয়ত তারও সঙ্গী জুটে গেছে।

হ্যানককের যুদ্ধ আমি করছি না। জেকব বলে।—বন্দুক নিয়ে কি করতে হয় তা আমরা জানি। যে সব ব্রিটিশ চোখের সামনে মারা গেছে, হ্যানকক তাদের চাইতে এতটুকু ভাল নয়!

ঠিক আছে! মাথা নেড়ে চার্লি বলে। জেকবের কথায় সে খুশী ও উল্লসিত হয়। কথার মানুষ সে। কথাই তার জীবন। বোস্টনের এই বেঁটে মুদ্রাপক ভলতেয়ার, ডিফো, সুইফট ও প্লেতো (১) পড়েছে—টম পেইনের (২) সঙ্গেও জানা শোনা আছে। জেকবের কথায় সে ভারি খুশি হয়। দাঁতে দাঁত চেপে বলে, ঠিক আছে! সেই সঙ্গে পল রিভারিকেও খতম করে দিও। সেও মস্ত বীর। আমরা এখানে পচে মরছি আর খবরের কাগজগুলো পল রিভারির বীরত্বে পঞ্চমুখ। তার ঐ নাম করা ঘোড়ায় চড়ে আসায় নাকি বিপ্লব রক্ষা পেয়েছে। হলপ করে বলতে পারি, হ্যানকক জলদস্যু আর রিভারি ব্যাবসায়ী। রিভারি তামা চায়। তোমাদের মত পাড়াগেঁয়ে চাষা এ সব বুঝবে না। তামার কারবারে বরাত খুলে যায়। কিন্তু বিপ্লব না হলে তামা গলান যাবে না। তাই সে ব্রিটিশদের তাড়িয়ে খনিজ পদার্থ গলাবার

(১) ভলতেয়ার ফরাসী বিপ্লবের মহানায়ক ও দার্শনিক। ডিফো ও সুইফট ইংরেজ ঔপন্যাসিক আর প্লেতো বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক।

(২) টম পেইন: আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা।

বাধানিষেধ বরবাদ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ব্রিটিশ আর তাদের শুল্ক বিভাগের লোকজন হটাও, তাহলেই নিশ্চিন্ত। তাহলেই হ্যানকক সৎ নাগরিক হতে পারে আর রিভারির বরাতও খুলে যায়। কিন্তু মনে রেখ, ভারি চালাক ওরা। শুরু করে দিয়েই নিশ্চিন্ত। লড়াই করে মরছ তোমরা। তুমি নেহাৎ বোকা জেকব। ফোর্জ উপত্যকার এক ফুট নীচে পচে মরছ বটে, কিন্তু ইগেনের কথা ওরা মুখেও আনবে না। জেকব ইগেন সম্পর্কে খবরের কাগজে একটি কথাও বেরুবে না। ওরা তারিফ করবে পল রিভারির ঘোড়ায় চড়ার দেবতার সাজ পরাবে স্যাম আদমসকে। বুঝলে?

নতুন এক দেশ গড়ছি আমরা। গোমরা মুখে জেকব বলে।— পশ্চিমে এক বিস্তীর্ণ সম্পদশালী দেশ পড়ে আছে। ইংরেজ এদেশে থাকা অবধি কোন দিন সে দেশ আমাদের হবে না। ইংরেজরা যতদিন ইণ্ডিয়ানদের লুঠ-তরাজ ও গৃহদাহের সুযোগ দেবে, ততদিন মোহক বা হ্রদ অঞ্চলে শান্তির আশা নেই। স্বীকার করি, আমি জংলী মুলুকের চাষা; তোমাদের শহুরে কায়দাকানুন আমার জানা নেই। তবু আমি হলপ করে বলতে পারি চার্লি, এই বিরাট দেশে তোমাদের ঐ শহর ছোট বিন্দুর মত। তোমরা বোস্টনের লোকেরা নিজেদের গৌরবের দেমাকেই অস্থির। পশ্চিমের বিরাট অঞ্চল সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। এক সময় এক ফরাসীর সঙ্গে আমার জানশোনা হয়। ফাঁদ পেতে জন্তু-জানোয়ার ধরাই তার ব্যবসা। সে একবার পশ্চিম ভ্রমনে বেরোয়। বসন্ত গ্রীষ্ম শীত গিয়ে বছর ঘুরে আসে তবু সে একটানা পশ্চিম মুখো হেঁটে চলে। অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ রেখে দীর্ঘ পথ হেঁটেছে বেচারী, তবু এই বিরাট দেশের কিনারা পায়নি। মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনাভরা গোটা ইয়োরোপ থেকে বিরাট এ দেশ। বোস্টনয়ালারা এই ভুলই করে। তারা ভাবে, তাদের জন্যই লড়ছি

আমরা। দেশ সম্পর্কে কোন জ্ঞান তাদের নেই। এই দেশকে সত্যি করে জানবার জন্যই লড়ছি আমরা। দুনিয়ার প্রথম থেকে শত শত বছর ধরে মানুষ স্বাধীন ভাবে বসবাস করবার মত একটি দেশের খোঁজ করেছে। ইহুদিটিকে জিজ্ঞাসা কর, তাহলেই বুঝতে পারবে কোন প্রেরণায় মানুষ স্বাধীন হতে চায় বা মৃত্যু বরণ করে। হ্যানকক বা রিভারিকে নোংরা ব্যবসা করতে দাও! এ দেশ আমাদের।

দু'বছরেই আমরা সাবাড় হয়ে গেছি। আমি বলি।—উপত্যকা অঞ্চল তচনচ হয়ে গেছে। শুনলাম, একখানা ঘরও নাকি খাড়া নেই।

এরপর আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। সবাইর মুখেই অর্থহীন মূক আকুলতা ফুটে ওঠে। এমন কি চার্লিও বোস্টন শহরের আরামের জন্য আকুল হয়। সকলেই এলির পায়ের দিকে তাকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। দরজা খুলে না যাওয়া অবধি আমরা চুপ করে থাকি।

ডাক্তার ঘরে ঢোকে। তার গায়ে গ্রেট কোট, মাথায় পশমী টুপি। দরজায় দাঁড়িয়ে সে পা ঠোকে এবং আগুনের ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের দিকে উঁকি মারে। হাসপাতালের পরে তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। প্রথম আমি তাকে চিনতে পারিনি। আর সকলেও একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

হাসপাতালের ডাক্তার। এলি বলে।

একদম হাওয়া নেই। ডাক্তার বলে।—জানোয়ারগুলো পর্যন্ত হাওয়া খোঁজে। কি বিচ্ছিরি ভ্যাপসা গন্ধ! এটা নিয়ে এমন পাঁচটা গর্তে ঢুকলাম। এই যে ইহুদিও আছে দেখছি। চটপট করে সে হেঁটে এগোয় এবং ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একে একে আমাদের সবাইর মুখ লক্ষ্য করে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে মেয়েরা তার দিকে তাকায়। ইহুদিটির মুখে ম্লান হাসি দেখা দেয়। কিন্তু জেকবের মুখ ক্ষুব্ধ।

ক্ষুব্ধ মূক জানোয়ার যত! ডাক্তার বলে।—দান্তের মত আমায় যদি কবিতায় নরকের মহান চিত্র আঁকতে হত তো আমি এখানে আসতাম। নরকে ভয়ের বালাই নেই। মাঝে মাঝে তোমাদের কথা ভেবে আমার হিংসে হয় বন্ধুগণ! সব কিছুই তোমরা জেনেছ—সব কিছুর তলা অবধি দেখেছ। তোমরা জানোয়ার হয়ে গেছ···

মুখ সামলে কথা বলবে। জেকব ধমকে ওঠে।

খাঁটি জানোয়ার। তোমার ওই দাড়ির ফাঁকে মুখের যতটা দেখা যায় তার মধ্যে যে খুনীর ভাব ফুটে বেরুচ্ছে বন্ধু!

এ নরক আমাদের! বেরিয়ে যাও এখান থেকে! খেঁকিয়ে ওঠে জেকব।

আঃ জেকব! মাথা গরম কর না, ওকে থাকতে দাও। বিরক্ত ভাবে এলি বলে।

কিন্তু কেন এখানে এলাম মনে পড়ছে না তো! ডাক্তার বলে।—হয়ত ইহুদি বন্ধুর সঙ্গে দুটো কথা বলতে এসেছি। ও ভিন্ন-জগতের লোক। যা কাশি হয়েছে তাতে খুব তাড়াতাড়িই পাড়ি দিতে পারবে। সঙ্গীকে আমার ওখানে দিতে গিয়েই এই দশা হয়েছে নাকি?

আমাদের ঘৃণা ও দুরন্ত ক্রোধ সে নিজের চোখে দেখতে পায়। তবু সে অকুতোভয়। মনে হয়, ভয় যে কি তা জানেই না। আবার এও হতে পারে, ভয় করবার মত বোধশক্তিও হয়ত তার ভোঁতা হয়ে গেছে। আমাদের দিকে চেয়ে মুচকি হাসে লোকটি।

লোকটা মারা গেছে! সহসা সে বলে ওঠে।—সংবাদটা দেবার জন্যই এই শীতে মাইলটাক হেঁটে এসেছি। অনেকের জন্যই এতটা করি না।

ক্লার্ক মারা গেছে? জেকব জিজ্ঞাসা করে। কথাটা তার বিশ্বাস হয় না।

আপনিই তাকে মেরেছেন! আমি চেঁচিয়ে উঠি।—আপনিই মেরেছেন তাকে।

হাঁ, ভগবান আর আমি দুজনে মিলে! তোমাদের মত নোংরা ছিচকাঁদুনি ভিখিরীদের কথা ভাবতেও আমার ঘেন্না হয়। ঐ যে ইহুদিকে দেখছ, ও আর আমিই শুধু সভ্য। ওর দাড়িটা যদি ছেঁটে দি তো ওকে অবিকল খ্রীস্ট বানাতে পারি। অনেকটা রেমব্রান্টের (১) ছবির মত। লেভির কাছে এগিয়ে গিয়ে সে নিউ ইয়র্কের ওলন্দাজ ভাষায় কথা বলে।

কি গো ইহুদি বন্ধু, বেশ কাশ বানিয়েছ তো!

ইহুদিটি তার দিকে চেয়ে হাসে। ডাক্তার হাসিটা লক্ষ্য করে এবং সহজেই তার অর্থ ধরতে পারে। এ গভীর উপলব্ধি ডাক্তার ধৃষ্টতার সঙ্গে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

আপনি···আপনি আর আমি জানি। লেভি বলে।—দুজনেই মানুষ মরতে দেখেছি।

কোন ভয় করছে না তো? ডাক্তার খোলাখুলি জানতে চায়।—বল ইহুদি বন্ধু, বল তুমি ভড়কাও নি। চশমা খুলে সে সযত্নে মুছে নেয় এবং আবার চোখে পড়ে। তারপর হাতের দস্তানা খুলে ফেলে। আবার সে পীড়াপীড়ি করে, বল তুমি মৃত্যুভয় জয় করেছ!

কান পেতে আমি ওদের কথা বার্তা শুনে যাই। কোনমতেই আমি ইহুদিটির মুখ থেকে চোখ সরাতে পারিনি। আমার মনে জাগছে ক্লার্ক ভ্যানডিয়ারের কথা। এককালে সে প্রচারক ছিল। আজ বেঁচে নেই। কিন্তু মৃত্যু তো আমাদের অজানা নয়। অপরের মৃত্যু দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তবে নিজের মৃত্যু···

---

(১) বিশ্ববিখ্যাত ওলন্দাজ চিত্রকর। অননুকরণীয় আলো-ছায়ার প্রতিফলনের জন্য প্রসিদ্ধ।

জেকবও শুনছে। ক্লার্কের মৃত্যুর কথা শুনে দুঃখে তার মুখ কালি হয়ে গেছে। তবু সেও কান পেতে আছে। বেস জাপটে ধরেছে আমাকে। আপনা থেকে আমি হাত দিয়ে তার কান চেপে ধরি—যেন কথাটা তাকে শুনতে দিতে চাই না।

মৃত্যু ভয় বলে কিছু আছে নাকি? ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে লেভি।

এ তো প্রাচ্যের রীতি! জিজ্ঞাসার জবাবে পাল্টা জিজ্ঞাসা।

আমি বাঁচতে চেয়েছি। ইহুদিটি বলে।—বসন্ত ঋতুটা দেখবার সাধ ছিল। আজীবন এ দেশে আসবার স্বপ্ন দেখেছি। কত সুন্দর হবে এ দেশ!

এই জায়গা? খেঁকিয়ে ওঠে ডাক্তার।

হাঁ হে এই জায়গা! মানুষের কল্পনাতীত সৌন্দর্য ফুটে বেরুবে··· মধুময় হবে এ দেশ।

তুমি আচ্ছা স্বপ্নবিলাসী তো! ডাক্তার হেসে ওঠে।

ইহুদিটির কণ্ঠে গভীর ক্ষোভ ফুটে বেরোয়: এ রোমান্স নয়! কল্পনা বিলাস মনে করে আপনি হয়ত ঠাট্টা করতে পারেন।

আমি দুঃখিত বন্ধু! সংক্ষেপে ডাক্তার বলে।—হায় ভগবান! সারা দিনমান ওদের যাওয়া আসা যদি দেখতে! কবর দেবারও উপায় নেই। মাটি না পাথর! কাজেই কাঠের মত পাঁজা করে রাখতে হচ্ছে। সারাদিন এই কাণ্ড চলছে। তুমি নিশ্চয়ি মাথায় হাত বুলোতে বলবে না। রক্ত মোক্ষণ করিয়েও কোন লাভ নেই। তুমি আর আমিই শুধু সভ্য। আমরা এই জানোয়ারদের মত নই।

আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলবার দরকার হয় না। যে-মানুষ হাতড়ে বেড়ায় তাদের সম্পর্কে পোপ (ইংরেজ কবি) যেন কি একটা বলেছেন! ঠিক মনে পড়ছে না। আমাদের সে-অবস্থা কেটে গেছে। তুমি মরতে চলেছ, কি হবে তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলে?

জেকব চেঁচিয়ে ওঠে : দোহাই ভগবানের, এখন থাম।

গভীর ক্ষোভে ও উত্তেজনায় ডাক্তার গোমরামুখে ফিরে দাঁড়ায়। আধবোজা চোখে চিন্তায় ডুবে যায় ইহুদিটি। ফিক করে হাসে ডাক্তার। কোট গায়ে ভরে বেরিয়ে পড়ে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ইহুদিটির কাছে যায় জেকব। কিন্তু মুখে কথা সরে না। চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

স্মিথ বলে, ব্যাটার গায়ে রামের গন্ধ ভুরভুর করছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এক ফোঁটা মদ আমাদের মুখে পড়ছেনা, কিন্তু ওদের তো বেশ জুটছে।

চুপ করে বসে থাকি আমরা। বাইরে রাত্রি নামে। দরজার ফাঁকে ফাঁকে আলোর ঝিলিমিলি ম্লান হয়ে মিলিয়ে যায়। আজকাল দিন বড্ড ছোট। কেনটনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। প্রত্যাশা করবার মত আর কিছুই নেই। পাহারা থেকে ফিরে আসবে কেনটন। তার কাহিনীও মামুলি…দুরন্ত শীত আর অসাড় পা। যখন সে পা খুলবে, হয়ত দেখা যাবে যে কড়ে আঙুলটি জন্মের মত অসাড় হয়ে গেছে।

বসে থাকতে থাকতে সহসা কেনটনের পায়ের শব্দ শোনা যায়। দৌড়োচ্ছে। দমকা হাওয়ার মত সে ঘরে ঢুকে পড়ে। সারা গায়ে রক্ত! মুখে রক্ত, হাতে রক্ত—সারা কোটে রক্তের ছিটা। হাতে একখানা ছোরা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। চোখ দুটো পাগলের মত উদভ্রান্ত। বলে, দুটো মদ্দা সম্বর! ইয়া বড় আর হৃষ্টপুষ্ট হরিণ! আমি তাদের শিঙের শব্দ শুনতে পাই। ফিলাডেলফিয়া রোডের পর গুঁতোগুঁতি করতে করতে শিঙে শিঙে আটকে যায়। দুটোকেই মেরেছি।

হেনরি উদভ্রান্তের মত তাকে ধরে ঝাঁকতে থাকে। আঙুলে রক্ত নিয়ে চেখে দেখে : হরিণ? হরিণ?

মিথ্যে কথা বলছে। বেসকে বলি।—নিশ্চয় মিথ্যে কথা।

দোহাই ভগবানের, চটপট চল। না হলে তোমরা পৌঁছোবার আগেই বাঘে টেনে নেবে। ছোরা ঘুরিয়ে বলে কেনটন। তার চেহারায় এক বিভীষিকাময় বীভৎসতা ফুটে বেরোয়।

অমনিই জামাকাপড়ের জন্য হুড়োহুড়ি লেগে যায়। যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ি। ভ্যানডিয়ার, ডাক্তার বা ইহুদিটির কথা তখন কারও মনে থাকে না।

বাইরে বেরিয়েছি কিন্তু শীত লাগছে না তো! এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। কেনটন আগে আগে ছুটতে থাকে; আমরাও দৌড়োই তার পেছু পেছু। তারপর সে নীচে নামে। আমরা থেমে পড়ি। শ্বাস-প্রশ্বাসে ধোঁয়া বেরোয়। দুর্বল রুগ্ন আমরা। আস্তে আস্তে হেঁটে চলি। মেয়েরাও আছে সঙ্গে। আচমকা দু একটা আর্তনাদ করে ছুটছে। বেসের হাত ও মাথা নাঙ্গা।

এলি আমাদের হুঁশিয়ার করে দেয়: আস্তে, আস্তে চল। না হলে ফিরতে পারবে না।

পাগলের মত হাসাহাসি করছি আমরা। একই সঙ্গে হাসছি আর কাঁদছি। সহসা হরিণ দুটি নজরে পড়ে। বেশ বড় দুটো হরিণ পড়ে আছে বরফের পর। কেনটন আঙুল দিয়ে দেখায়। উন্মত্তের মত সে ছোরা চালাতে থাকে? একবার মুঠি অবধি ছোরাখানা সেঁধিয়ে দেয়।

এই ভাবেই গুঁতোগুঁতি করছিল। সেই সুযোগে সাবাড় করেছি।

এলি চীৎকার করে বলে: তুমি পাগল হয়ে যাবে! এখনও হরিণের কাছ থেকে সরে এস বলছি। খানিকটা রক্ত এনে আমি মুখে দিই! এলি আমার রগে জোর গাট্টা মারে। আমার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। বেকুবির জন্য মাফ চাই।

সবাই মিলে টেনে টেনে হরিণ দুটো নিয়ে আসা হয়। স্ত্রী-পুরুষে মিলে অক্লান্ত চেষ্টায় কোনমতে বরফের পর দিয়ে নিয়ে আসি। যে করেই হোক, খবরটা রটে যায়। দলে দলে লোক বেরিয়ে আসে পেনসিলভানিয়ানদের পরিখা থেকে। প্রতিটি জন্তুর পর কমসে কম একশোখানা হাত পড়ে। পুরুষদের মধ্যে হাসাহাসি ও গানের হুল্লোর পড়ে যায়।

টানতে টানতে হরিণ দুটোকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে আসা হয়। কেনটন শিকার দুটির ওপর দাঁড়ায়। পেনসিলভানিয়ার লোকজনদের সরিয়ে রাখবার জন্য আমরা সকলে গোল হয়ে দাঁড়াই।

সবাই খাবে!

নিশ্চয়ি সবটা তোমরা নিজেদের জন্য রাখবে না!

এক টুকরো টাটকা মাংসের অভাবে মরে যাচ্ছি।

যতটা মাংস আছে তাতে সবাইর হয়ে যাবে।

সহসা জেকবের গম্ভীর গলার চেঁচানি শোনা যায়, কেনটন শিকার করেছে, তাকেই বলতে দাও।

সবাইর মুখে তখন কেনটনের নাম। ভীড় ঠেলে মেয়েরা কেনটনকে ছোঁবার চেষ্টা করে।

সত্যিই বাহাদুর কেনটন!

ভারি চমৎকার লোক।

চোখ দেখেই বুঝছি, তোমার দয়া-মায়া আছে কেনটন। নিশ্চয়ি সবটা নিজে রাখবে না।

আমার কাছে রাম আছে। মাংসের বদলে রাম দেব কেনটন।

কেনটন মর্যাদা বজায় রাখে। হতচ্ছাড়ার মত শীর্ণ খোঁচাখোঁচা দাড়িওলা চেহারা এবং হলদে চুলে রক্ত মাখা থাকলেও সে গাম্ভীর্য হারায়নি…হাতের ইশারায় সবাইকে নীরব হতে বলে। তারপর

গলা চড়িয়ে বলে, আমরা শুধু একখানা রাঙ্‌ নোব। তাতে নিশ্চয়ই কারও আপত্তি হবে না। বাকী সবটা রোষ্ট কর। চটপট মস্ত একটা আগুন জ্বালাও।

জনতা কেনটনের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। আলুথালু মৃত্যু-ভীতা মেয়েরা নখ দিয়ে আঁচড়ে আমাদের বেড়া ভেঙে তাকে স্পর্শ করবার জন্য ছুটে যায়। আমরা একখানা রাঙ্‌ কেটে নিই। হেনরি টুকরোখানা আস্তানায় নিয়ে যায়। আগুন জ্বালাবার জন্য তখন কাঠ সংগ্রহ করা হয়। পলকের জন্য অবসাদ ঘুচে যায়। ক্রমে ক্রমে কাঠের টাল পড়ে। আস্তানার চাল ও গাছের সঙ্গে একখানা কাঠ টাঙিয়ে ঝলসাবার শিক বানান হয়। চটপট হরিণ ছুটোর ছাল ছাড়ান হচ্ছে। নাড়ি-ভুঁড়ি খুলে আলাদা করে রাখা হয়। ওগুলো আলাদা ভাবে ঝলসান হবে। এক নাগাড়ে রাম টানছে কেনটন। সঞ্চিত রাম যাদের আছে তাদের প্রায় সকলেই দিয়েছে কিছু কিছু। সে কোন কাজ করছে না, জ্বলন্ত আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে রাম টেনে যাচ্ছে। বেশ নেশাও হয়েছে। হরিণ মারার কাহিনীটি তাকে দশ বারো বার বলতে হয়েছে। আমাকে ডেকে বলে: জান আলেন, পেনসিলভানিয়ানরা খুব খারাপ লোক নয় তো! তোমার জন্য মোটাসোটা খুবসুরত একটা মাগী যোগাড় করেছি। চমৎকার জার্মান বলতে পারে। কোন রকম আপত্তি শুনব না।

আমি হেসে উঠি। মেজাজের অবস্থাও হাসবার মত। রামও মুখে পড়ে খানিকটা। বেস আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

আলেন, সব রাত আমার সঙ্গে থাকবে বল! বল, পেনসিলভানিয়ার জার্মান মেয়ে পেয়ে আমায় ছেড়ে যাবে না!

কোন মেয়ের জন্য না। আমি বলি।

শিক বিঁধিয়ে হরিণটাকে ঝলসাবার জন্য প্রস্তুত করা হয়। বেশী

উত্তাপ পাবার জন্য আমরা আগুনটা ছড়িয়ে দিই। সবাইর মুখে হাসি ফোটে। অনেকদিন এমন হাসি হাসতে পারিনি। পাহাড়ের পর অফিসারদের ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনেও আমরা হাসাহাসি করতে থাকি।

মুলার এসে হাজির হয়। লেফটন্যাণ্ট কোলবি এবং ক্যাপ্টেন ক্রিস্টোনও আছে তার সঙ্গে। ঘোড়া থেকে নেমে তারা ভীড় ঠেলে এগোয়।

এসব কি হচ্ছে? মুলার জানতে চায়।

জবাব জেকবই দেয়। দেখতেই তো পাচ্ছেন হরিণ রোষ্ট করা হচ্ছে।

লুঠের মাল রসদখানায় জমা পড়বে। মাংসটা নিয়ে যাও কোলবি। জন বারো লোক নিয়ে এটা রসদখানায় নেবার ব্যবস্থা কর।

অফিসারদের পেট ভরাবর জন্য! গর্জে ওঠে জেকব।

চুপ কর বেজন্মা ভুত!

তবে রে শালা শূয়োর………

কেনটন তারস্বরে বলে: কবে থেকে হরিণ লুঠের মাল হল? বনের স্বাধীন জন্তু শিকার করেছি। ছোরাখানা দেখিয়ে বলে, দরকার হলে হরিণ মারার চাইতেও ভাল কাজে লাগিয়ে দেব।

অফিসারদের কাছে ছোট হাতিয়ার আছে। আমাদের মধ্যে মাস্কেট আছে কারও কারও। সবাই ঘৃণায় উন্মত্ত। মেয়েরা আমাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। অফিসারদের চাইতে অফিসার-গৃহিণীদের তারা বেশী ঘৃণা করে। কোয়েকারদের পাশাপাশির পাথুরে ঘর-বাড়ীতে কর্তাদের সঙ্গেই বসবাস করছে ফিটফাট সাজ-পোশাক-পরা সযত্নে লালিত এই গৃহিনীর দল। ছাউনিতে তারা বড় বেশী আসে না। মাঝে মাঝে খানিকটা দূর থেকে দেখে-শুনে কৌতূহল চরিতার্থ করে

যায়। আসে মেয়ে-মদ্দা জানোয়ার দেখতে। আমাদের সঙ্গিনীরা বেদম ঘৃণা করে তাদের।

একজন তারস্বরে বলে ওঠে: কেমন করে হরিণ মেরেছিলে ব্যাটাদের একবার দেখিয়ে দাওনা কেনটন। ভাল করে হাতের খেলটা দেখিয়ে দাও।

অফিসারদের সাহস আছে বলতে হবে। আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে একে একে সবাইর মুখ লক্ষ্য করে। মুচকি মুচকি হাসে মুলার। এলি তাদের দিকে এগিয়ে যায়। শান্তভাবে বলে, খুন-খারাবি কাণ্ড ঘটাবার মত বোকা নিশ্চই আপনারা নন।

মোড় ঘুরে গটমট করে আমাদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যায় মুলার। আর দুজনও যায় তার পেছু পেছু। আমরা তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি। আমার মনে হয়, ঘটনাটা ওরা ভুলবে না।

আমাদের পারচালনা করবাব যোগ্যতা নেই। এলি বলে।—আমাদের বোঝেই না।

সব ব্যাটা নিরেট। আমি বলি।

জন ছয়েক মিলে মাংসটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আস্তে আস্তে রোষ্ট হচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা চর্বি ঝরে আগুনের মধ্যে নীল-হলদে শিখা সৃষ্টি করে। আধ-সেদ্ধ কাঁচা অবস্থাতেই আমরা মাংস কেটে নিতে শুরু করি এবং সঙ্গে সঙ্গে হাভাতের মত মুখে পুরে দিই। 'আজাদীর হাসিখুশি ছেলের দল' নামে বোস্টনের একটি গানের 'প্যারোডি' গাইতে শুরু করে চার্লি গ্রীন। আমরাও যোগ দিই। গানটা ভারি ভাল লাগে। আমরাও গাইতে শুরু করি:

আয়রে আমার আজাদীর হাসিখুশি ছেলের দল—
আয় সব হিয়া এক করে।
সহজে ভয় পাবার মত শত্রু নয়, তবু আমাদের

চরম নোংরামি ভড়কে দেয় তাদের ;
আমাদের খালি পেট বশে আনতে হবে,
এই তো সময় তার, কোনদিন হবে না তাহলে।
এই আদর্শ সার্থক হোক সবার জীবনে—
ঝরে যাক সব মল।

'গৌরবোজ্জল পয়লা আগস্ট' গানের সুরে আমরা গানটি গাই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই পদ বার বার গাইতে থাকি। শেষ অবধি পদগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে। খালি পেটে মাংস পড়ে সবাই মাতাল বনে যাই। জনকয়েক অসুস্থ হয়ে পড়ে। শেষ অবধি হোঁচট খেতে খেতে আস্তানায় ফিরে আসি।

আমি পাহারা দিতে বেরিয়ে পড়ি। গভীর রাত্রি নির্মল নিঝ্ঝুম। পেনসিলভানিয়ার সৈনিকেরা হুল্লোড় করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঢিবির মত বরফ চাপা ছোট ছোট অস্তানাগুলো একেবারেই নীরব।

শীতের প্রকোপ কতকটা কমেছে। হাওয়া নেই বল্লেই চলে। ধীরে ধীরে পায়চারি করছি। মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে আস্তানাগুলোর ওধারে গাছের ফাঁকে আগুনের আভাটির দিকে তাকাই। ওটা আমাদেরই আগুনের আভা। মনে পড়ে, ক্লার্ক ভ্যানডিয়ারকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় কেমন করে ইহুদিটির ফুসফুস জমে যায়। কিন্তু এলি আর আমি তো এখনও বেঁচে আছি। দুজনেই শক্তিমান।

ক্লার্ক মারা গেছে। কবরও জোটেনি তার। কিরিচটা হাতে নিয়ে সেখানা বরফের মধ্য দিয়ে মাটি অবধি বসিয়ে দিই। পাথরের মত শক্ত মাটি। হাঁটু ভেঙে বসে মাটি খুঁড়বার চেষ্টা করি। কোনমতে সামান্য কিছু মাটি উলটে দিতে পারি।

ভয় আমাকে জয় করতেই হবে। চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভার

দিকে চেয়ে থাকি। ভাবতে চেষ্টা করি, বসন্তকালে কেমন শোভা হবে এই পল্লী প্রকৃতির! ঘুরে ফিরে ইহুদিটির কথা মনে পড়ে। আমেরিকার বসন্ত সে কোনদিন দেখেনি।

এইখানেই আমরা সাবাড় হব—এই শঙ্কা বার বার মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করি। কোনও সাড়-শব্দ নেই। সবাই মরে গেছে নাকি? জোরে চেঁচিয়ে উঠি। করুণ প্রতিধ্বনি তুলে আমারই কণ্ঠস্বর ফিরে আসে। গুলি করতে ইচ্ছা হয়। প্রবল আগ্রহ জাগে। কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে প্রতিনিবৃত্ত করি। পাহারাদারিতে এসে একই কারণে কত লোক যে গুলি ছোঁড়ে! নিস্তব্ধতা ভাঙতে চায়। গতকাল এজন্য একটা লোককে চাবকে আধমরা করা হয়েছে।

দূর পাহাড়ের মাথায় চাঁদ ওঠে। হলুদে বরফের বাঁকা ধারের মত শীর্ণ চাঁদ। কাক-জ্যোৎস্নার যাদুস্পর্শে দেশ-গাঁয়ে সৌন্দর্যের মায়াপুরী সৃষ্টি হয়। ক্রমে চাঁদ উপরে ওঠে। তখন তার রূপ হাসিভরা আধখানা মুখের মত।

—সাত—

ইহুদিটি মুমূর্ষু। স্মিথ কাউরে ভুগছে। তার রোগ সারবার জন্য কিছুই করবার উপায় নেই। এ রোগ অল্প-বিস্তর আমাদের সবাইর আছে। স্মিথের মুখখানা পচা আপেলের মত—সব কটা দাঁত পড়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে সে রোগযন্ত্রণায় কাতরায় এবং ইহুদিটিকে গালাগাল করে। কিম্বা মাঝে মাঝে নিজের হোটেলের রান্নাঘরের রোস্টের কথা স্মরণ করে যা মুখে আসে তাই বলে। বলতে বলতে তার

গলা চড়ে যায়ঃ গো মাংসের রোস্ট। এক পাউণ্ডে পনেরো মিনিটের বেশী লাগবে না। আস্তে আস্তে উলটে-পালটে দিও। আস্তে আস্তে উলটাবে আর চর্বির ফোঁটাগুলো ধরে রাখবে। মাংসের তেলে…

এ আমাদের সহ্য হয় না। আমরা তাকে বকবকানি থামাতে বলি।

ডাক্তার দুবার এসেছে। একবার সে স্মিথের জন্য এক টুকরো আলু নিয়ে আসে। তাতে খানিকটা উপকার হয় কিন্তু আলুও তো দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয়বার সে ইহুদিটিকে জিজ্ঞাসা করে, সে হাসপাতালে যেতে চায় কিনা।

মা বসুন্ধরা আমাদের রক্ষা করেছেন। ডাক্তার বলে।—এখন জায়গা খালি আছে। কিন্তু মুরগীর ছানার মত কলহ লেগেই আছে। কেউ বলে জায়গাটা নিউ জার্সির লোককে দাও, কেউ বলে ম্যাসাচুসেটস্‌য়ালাদের দাও, আবার কেউ বলছে ভারমণ্টারদের দাও। উঃ, এই ভারমণ্টয়ালারা যে কি বিচ্ছিরি লোক! পাহাড়ের মত প্রাণহীন ঠাণ্ডা আর শূয়োরের মত নিরেট। জায়গাটা আমি এক ইহুদির জন্য রাখছি, এ কি বলা যায়? তাদের কাছে বলতে পারি এ কথা? আমি ছেড়েছুড়ে চলে যাবার ভয় দেখাই। তখন আর পীড়াপীড়ি করে না। আপনার যা খুশি করুন বলে চুপ করে যায়। সেইজন্যই তো জায়গাটা এখনও আমার ইহুদি বন্ধুর জন্য রাখতে পেরেছি। তা আমার কথা শোনে। আমি বলি, আঠারো মাইল দূরে ফিলাডেলফিয়ায় এক একজন পল্টনের ডাক্তার সপ্তাহে দশটি সোনার পাউণ্ড পায়। এদিকে আমি মহাদেশীয় নোট নিচ্ছি আর তাই দিয়ে ব্যাণ্ডেজের কাজ করছি। তা ব্যাণ্ডেজের কাজও ভালমত হয় নাকি?

আর কদিন বাকী আছে ডাক্তার? ইহুদিটি জিজ্ঞাসা করে।

এখন তো যে কোন দিন হলেই হয়।

তাহলে এখানেই থাকব। ইহুদিটি বলে। তার মুখে রহস্যময় হাসি।

ডাক্তার কেমন থতমত খেয়ে যায়। মনে হয়, সত্যিই সে দুঃখিত। বলে, ভেবেছিলাম দুজনে খানিকটা আলোচনা করব। কারুর সঙ্গে কথা বলতে না পেয়ে তুমি পাগল হয়ে যেতে পার।

আপনি পাগল হবেন না। ইহুদিটি বলে।

উভয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। মনে হয়, দুজনের মধ্যেই একটা সমঝোতা আছে।

আমরা ইহুদিটির মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করি। নিজের মৃত্যুর কথা ভেবে তার যতটা ভয় হক-না-হক, আমাদের দারুণ ভয় হয়। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। জানি, খুব বেশী দেরী হবে না। একবার নাক মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ রক্ত পড়ে। তারপর সে অসাড়ের মত পড়ে থাকে—শ্বাস বইছে বলে মনে হয় না। তার মুখের চেহারা হলদে কাগজের মত—হাড়ের পর শুধু একখানা চামড়া। কিন্তু বয়স খুব বেশী বলে মনে হয় না। এলিকে জিজ্ঞাসা করি, তার অনুমান কত।

ওর কাছে বয়সের দাম নেই। আস্তে আস্তে বলে এলি।

ত্রিশটে শীতের বেশী দেখেছে বলে মনে হয় না! জেকব আন্দাজ করে।

কোন সময় ছেলে-বউর কথা বলে না তো! অদ্ভুত চাপা লোক!

আমি ক্ষুব্ধভাবে বলি, মরে না কেন? মরি মরি করেও তো এক হপ্তা কাটাল।

নিশ্চয় কেউ আমায় তুক করেছে। স্মিথ বলে।—ঐ ম্লেচ্ছ ইহুদিদের সংস্পর্শে কাউর রোগ আসে।

হামাগুড়ি দিয়ে আমি বিছানায় ফিরে আসি। বেস জিজ্ঞাসা করে, মারা গেছে?

না, এখনও মরেনি।

আলেন, এ আর আমি সইতে পারছি না। সত্যি বলছি, আর পারছি না। আমায় আর কোথাও নিয়ে চল আলেন। এখানে মরার চাইতে বাইরে কোথাও মরা অনেক ভাল। রাত্রে ঘুম ভেঙে আমি ঘামতে থাকি। মনে হয়, জায়গাটা যেন আমায় চেপে ধরেছে। দোহাই তোমার, চল আর কোথাও যাই।

ভয় করবার কি আছে? আমি প্রবোধ দিই।—কোন ভয় নেই।

তবু আমায় আর কোথাও নিয়ে চল আলেন।

মোহক পাঁচশো মাইল দূর। দীর্ঘ পথ। আমি বলি।—এতটা পথ চলবার সাধ্য আমাদের নেই। তাছাড়া মাঝখানকার জায়গা ব্রিটিশদের দখলে।

মোহকে যাবার দরকার হবে না আলেন।

কোথায় যাবে তাহলে?

খোঁজ-খবর দেবার জন্য ব্রিটিশরা ফিলাডেলফিয়ায় টাকা দিয়ে লোক রাখে। সেখানে খাওয়া থাকার……

কি সর্বনাশ! পেটে পেটে এত বজ্জাতি তোমার। দিন দিন আসল রূপ বেরুচ্ছে! আমায় দিয়ে তুমি এলির সর্বনাশ করাতে চাও… ওদের সবাইকে বিকিয়ে দিতে চাও!

শুধু তোমার জন্য আলেন, শুধু তোমার জন্য। তোমায় ভালবাসি বলেই বলছি। একান্তভাবে তোমাকেই ভালবাসি বলে বলছি!

না না, তোমার মত মেয়ে কোন পুরুষকে ভালবাসতে পারে না। ভালবাসা পাবার যোগ্যতাও তোমার নেই। তোমার মত মেয়ে পুরুষের স্নেহ……

কি বলছ আলেন?

সত্যি কথাই বলছি। মরবার সময় ক্লার্ক ভ্যানডিয়ার আমায় শাপ

দিয়ে গেছে। তার অনুমান মিথ্যে নয়! জঘন্য কুটিল স্বভাব তোমার··· পুরুষের সঙ্গিনী হবার যোগ্য নও।

না আলেন, তোমায় ভালবাসি বলেই বলেছি। ভালবাসি বলেই এ কথা মনে জাগছে। যখন জেগে থাকি, তোমায় ভালবাসি; আর যখন ঘুমোই, স্বপ্ন দেখি। দুর্বলতার জন্য দিন রাতের আদ্ধেক সময়ই তো ঘুমিয়ে থাকি। কিন্তু স্বপ্ন দেখি সব সময়। স্বপ্ন তো তুমিও দেখ আলেন। আমিও তেমনি স্বপ্ন দেখি যেন আমি এখানে নেই, চলে গেছি সাচ্চা মেয়ে-পুরুষের দেশে। ভগবানের দিব্যি, সব সময় একটা পোশাকের কথা ভাবি। সাদা শনের মিহি সুতোর একটা পোশাকের কথা ভেবে মাঝেমাঝে প্রায় পাগল হয়ে যাই। নিজেই আমি সুতো পাকাতে পারি আলেন। দিন রাত মনে মনে শনের সুতো পাকাই। চিরুণি দিয়ে শন আঁচড়ান বল, সুতো পাকান বল, বোনা বল···সবই পারি। কোন খারাপ মেয়ে এত কাজ জানে না। মনে মনে কাপড় বানাই, মাপসই পোশাক কাটি আর সেলাই করি। হলদে সুতো দিয়ে বরফের মত ধবধবে সাদা কাপড় সেলাই করি। ঠিক বাইরের বরফের মত সাদা···তেমনি ধবধবে পরিচ্ছন্ন বরফের পোশাক! তাতে কোন দাগ নেই আলেন···একটিও দাগ খুঁজে পাবে না কোথাও। একটা পোশাক পেলেই ভাল হয়ে যাব। বিশ্বাস কর আলেন, খারাপ মেয়ে আমি নই। সত্যি বলছি খারাপ নই। একটা পরিচ্ছন্ন পোশাক পেলেই ভাল হয়ে যাব। ওদের কাছে তোমায় সত্য কথা বলতে হবে না আলেন। শুনেছি, ব্রিটিশদের নাকি তেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই। তুমি যা বলবে তাই বিশ্বাস করবে আলেন। শীত কাটাবার মত থাকা ও আশ্রয় নিশ্চয়ি পাওয়া যাবে।

না না, তুমি তেমন সুবিধার মেয়ে নও···আমাকে যেতে দাও।

আলেন, সত্যি বলছি আমি ভাল। আমায় ছেড়ে যেও না আলেন। থাকা-খাওয়া পেলে এই শীতকালেই শরীরে জোর পাব···বেশ গোলগাল জওয়ান চেহারা হবে। বসন্ত আসুক, তখন আমরা দক্ষিণে রওনা হব···বুনের পথ ধরে পেনসিলভানিয়া যাব। দক্ষিণে কোন যুদ্ধের হাঙ্গামা নেই। সেখানে গেলে আবার গায়ে জোর পাব, গেরস্থালীর খাটা-খাটনির সব কাজ করতে পারব। তখন আর তোমায় ভালবাসতে হবেনা আলেন; শুধু তোমার জন্য খাটবার সুযোগটুকু দিও। তোমার জন্য কাজ করবার সুযোগ পেলে আর তোমার ঘাড়ে চেপে থাকব না।

বিছানা থেকে নেমে টলতে টলতে আমি আগুনের কাছে দাঁড়াই। বেসের শঙ্কিত চাপা-ফোঁপানি কানে আসে। আগুনের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে শিখার দিকে চেয়ে থাকি। আগুনটা নিভু নিভু হয়ে এসেছে। জ্বালানিও প্রায় শেষ হয়েছে। নিভু নিভু অগ্নিশিখা থেকে একটা কিছু খুঁজে বার করবার চেষ্টা করি।

এলি ইহুদিটির পাশে রয়েছে। সে কি যেন বলে; তারপর ঘাড় ফিরিয়ে ডাকে, এদিকে এস তো আলেন।

আমি গিয়ে বিছানার পর ঝুঁকে দাঁড়াই।

তুমি ইস্কুলে পড়েছ আলেন, নিশ্চয়ি বই-টই পড়াশোনা আছে।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিই।

তোমাদের পাঠ্য তালিকায় ইহুদিদের প্রার্থনা ছিল?

অসহায়ের মত মাথা নেড়ে জানাই যে ছিল না। তখন সে গুটিকয়েক কথা বলে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ইহুদিটি। এলি চোখ বোজে। বলে, স্বর্গ ও নরকের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার স্বভাব আমার নয়; কিন্তু ও যেখানে যাচ্ছে, সেখানে যেতে পারলেই আমি খুশি হব।

আমার মুখে কথা সরে না।

এলি বলে, চল কিছু কাঠ কেটে নিয়ে আসি আলেন। আগুনটা নিভে এসেছে।

অমনিই কুড়াল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এলি পথ দেখিয়ে আগে আগে বনের দিকে যায়। আমি একটা ছোট্ট গাছ কাটি। তারপর আমি জিরিয়ে নি আর এলি ডাল কাটে। কাজ পেয়ে বেঁচে যাই, তাতে আনমনা হওয়া যায়।

কাঠের বোঝা নিয়ে দুজনেই ফিরে আসি এবং ভাল করে আগুন জ্বালাই। জেকব হাঁটু ভেঙে ইহুদিটির বিছানার পাশে বসে আছে। উভয়েই আমরা তার দিকে তাকাই, কিন্তু কারও মুখ ফোটে না।

আবার বিছানায় ফিরে আসি। বেস সন্তর্পণে আমার মুখে হাত দেয়। তার বুকের পর মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠি।

—আট—

কেনটন ব্রেন্নার, চার্লি গ্রীন আর আমি পালাব বলে ঠিক করেছি। হুট করে এ সিদ্ধান্ত করা হয়নি। ক্রমে ক্রমে সাহস সঞ্চয় করে এবং পন্টন ছেড়ে যাবার জন্য যা যা প্রয়োজন নিজেদের মধ্যে সলা পরামর্শ করে সব কিছু ঠিকঠাক করবার পর এই যুক্তি করা হয়। কেনটন কথাটা তোলে এবং আমি রাজী হই, তারপর চার্লিও জোটে।

দুদিন পরে ইহুদিটি মারা যায়। কেনটন আর আমি পাহারায় যাই। টাটকা মাংসটা আমাদের খানিকটা চাঙ্গা করেছে, নিস্তেজ দেহে নতুন করে শক্তির নিভু নিভু ক্ষীণ শিখা জ্বালিয়েছে। আমার বিটের প্রান্তে কেনটনের সঙ্গে দেখা হয়। মাস্কেটে ভর করে সে উত্তর মুখো

পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে। ডেকে বলি, কি হে, অনেকক্ষণ এই ভাবে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছ যে, ব্যাপার কি? এতক্ষণ এক ভাবে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবলাম, শীতে জমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছ।

ভাবছিলাম, জোয়ান লোক এই বরফের মধ্য দিয়েও হেঁটে যেতে পারে।

কোথায়? হেঁটে কোথায় যাবে?

উত্তরে—মোহকের দিকে। এই উপত্যকা অঞ্চলের দিকে তাকাতেও আমার ঘেন্না করে।

পাঁচশো মাইল খেয়াল আছে? এডওয়ার্ড জমে গেছে—গাছের গুঁড়ির মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাকে নিয়ে এসে যখন শুইয়ে দিল, সারা গায়ে বরফ জড়ান। ঠোঁট দুখানা বরফ দিয়ে সীল করা। সে দৃশ্য আমি জীবনেও ভুলব না।

এডওয়ার্ড একলা ছিল, তাই!

তখন আমি তার চোখের দিকে তাকাই। স্পষ্ট বুঝতে পারি যে নিজের মনটাও যেন উতলা হয়ে উঠেছে। বিড়বিড় করে বলি, ইঁদুরের মত খাঁচায় ধরা পড়েছি আমরা—শক্তি-সাহস চুলোয় গেছে।

সেই রাত্রেই চার্লির কাছে কথাটা পাড়া হয়। বোস্টনের লোক চার্লি—শহুরে মানুষ। অদ্ভুত ধরণের লোক। বেশ কয়েকশো বই পড়েছে। উপোস করেও গায়ের জোর লোপ পায়নি।

তিন বছর আগে আমরা পল্টনে নাম লিখিয়েছি। চার্লি বলে।

হাঁ, তিন বছর হল বটে! ভেবে দেখ, তিনশো লোক ছিল তখন। কিন্তু এখন ঠেকেছে ছয় জনে। তিন বছর পরে ইংরেজদের ফাঁসিকাঠে ঝুলবার জন্য একজনও পাওয়া যাবেনা। সে পুরস্কার কারও বরাতে জুটবে না।

এখানে এক সঙ্গিনী আছে। বিড়বিড় করে বলে চার্লি।—চলে গেলে অনেক রাত একলা কাটাতে হবে।

চলে গেলে তোমার কথা ভাববেও না, বেশ্যা তো!

বাড়ীর জন্য মনটা কেমন আনচান করে।

পথে খাবারের অভাব হবে না। আমি সাগ্রহে বলি।—যাবার পথে শস্যভরা একটা দেশ পড়বে। ভাল ভাল খাবার পাওয়া যাবে।

টাকা কোথায়? আমাদের মহাদেশীয় মুদ্রার হাজার ডলার দিলেও এক টুকরো রুটি পাওয়া যায় না।

টাকার কি দরকার? মাস্কেট সঙ্গে থাকবে তো! বন্দুক থাকলে খাবারের অভাব হবে না।

চুরি করতে পারব না। জোর দিয়ে বলে চার্লি।—নচ্ছার হতচ্ছাড়া হয়ে গেছি বটে, কিন্তু চোর নাম কিনতে পারব না।

লুঠ করব কেন? লুঠের কথা আমি বলিনি চার্লি। বলেছি, সাবেক সৈনিকদের সামান্য খাবারের অভাব হবে না।

তিনজনেই আগুনের পাশে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। মাঝে মাঝে ধোঁয়ায়-কালো ছোট্ট আস্তানার চারদিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছি। এলি পাহারা দিতে গেছে। তার কথা মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করি। শুধু মুক্তির উপায় চিন্তা করতে চাই। কি করে এই দুঃসহ একঘেয়েমি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তার কথাই ভাবি। গায়ে ক্লোক জড়িয়ে জেকব তার বিছানায় শুয়ে আছে। লাঠির মত দেখতে ছেঁড়া পট্টি জড়ান পা দুখানা বেরিয়ে আছে। চোখ বুজে অসাড়ে পড়ে আছে সে। স্থির আস্তে আস্তে কঁকাচ্ছে। হেনরি লেন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। আজ কয়েক সপ্তাহ হল সে ভুগছে এবং নীরবে রোগ-যন্ত্রণা সয়ে জীবন্মৃতের মত নিজের বাঙ্কে পড়ে আছে।

আমরা তিনজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি এবং পরস্পরের মনোভাব বুঝতে চাই।

তারপর আমি বলি, আর কত সয়? এখানে মরতে আমার ভয় করে। বাইরে যে কোথাও মরি না কেন, কোন দুঃখু নেই। বরফের পর ঘুমিয়ে আর যদি ঘুম না ভাঙে তো কোন খেদ নেই। ঘুমিয়ে থাকব বরফের পর! খুবই সহজ! মরবার সময় এডওয়ার্ডের মনে নিশ্চয়ি কোন দুঃখু ছিল না।

খালি পেটেই রওনা হতে হবে তো! চার্লি বলে।

হাঁদার মত হাসে কেনটন, সে তো গা-সওয়া হয়ে গেছে।

তোমরা মোহক যাবে?

শীত শেষ না হওয়া অবধি বোস্টনেও থাকতে পারি।

কোন মেয়ে…

অপলক দৃষ্টিতে আমি তাদের দিকে তাকাই। তারাও তাকায় আমার দিকে। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বেস জেগে আছে কিনা।

না, কোন মেয়ে থাকবে না। ছাড়া ছাড়া ভাবে কেনটন বলে।

আমি উঠে পড়ি এবং বিছানায় যাই। বেস হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে। সে যে জেগে আছে আমি যেন তা টের পাইনি—এই ভান করে আগুনের দিকে চেয়ে থাকি। কোন রকম নড়া-চড়া না করে চুপটি করে পড়ে থাকি। অনেকক্ষণ কেটে যায়। শেষে মনে হয়, বেস হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

এলি ফিরে আসে। অতি কষ্টে আস্তে আস্তে সে জামা কাপড় খুলে ফেলে। খুবই ক্লান্ত এলি। চোখ মুখ বসে গেছে। প্রতি পদে সে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করছে। এক একবার মনে হয়েছে যে এলিকে আমাদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করি। কিন্তু তার পায়ের যে অবস্থা তাতে দশ বারো মাইল পথও সে চলতে পারবে না।

আগুনে খানকয়েক চেলা কাঠ দেয় এলি। সেইখানে খানিকটা দাঁড়িয়ে, চোখ রগড়ে সে জেকবের বিছানার কাছে যায়। জেকব আর সে আমাদের চাইতে বয়সে বড়, থাকেও আলাদা ভাবে। ঘুমন্ত জেকবের দিকে চেয়ে সে তার গলা অবধি ক্লোকটা টেনে দেয়। স্মিথ কঁকিয়ে ওঠে। খাবার যখন পাওয়া গেছে সেই সময় ভুট্টার খানিকটা পাতলা জাউ বানিয়ে আমরা আগুনের কাছে রেখে দিয়েছি। এক কাপ জাউ নিয়ে এলি স্মিথের মুখে ধরে। লোকটি সামান্য দু এক ঢোক খায়। তারপর এলি পকেট থেকে কি একটা জিনিস বার করে। স্মিথকে বলে, এক টুকরো পেঁয়াজ। খানকয়েক মহাদেশীয় নোট দিয়ে মাসাচুসেটসের একটা লোকের কাছ থেকে এনেছি। জিনিসটা দুর্লভ, কাউর রোগে খুব উপকার দেয়।

তারপর সে আগুনের পাশে বসে পা ছড়িয়ে দেয় এবং উরুতে হাত রেখে চোখ বুজে ঠেসান দিয়ে বসার ভঙ্গীতে পিঠ বাঁকায়। আমি একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকি। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তারপর ডাকি, এলি!

সে মুখ ফেরায়।—আলেন? তুমি জেগে আছ টের পাইনি তো!

তখন আর কিছু বলতে পারিনা।

কিছু চাইছিলে?

না তো!

আমি মোড় ফিরি। বেসের ঘুম ভেঙেছে। কাল চোখ টান করে চেয়ে আছে। কানে কানে বলে, কখন তোমরা যাবে আলেন?

যাব মানে? কোথায় যাব?

আলেন, সেদিন রাতে প্রথম যখন তোমার কাছে এলাম, আমার পা দিয়ে রক্ত ঝরছিল। সারা গা টনটন করছিল। তখন তুমিই আমার পা বেঁধে দিয়েছিলে আর বলেছিলে, আমি তোমার সঙ্গিনী।

অন্যে যাতে তোমার দিকে হাত না বাড়ায় সেই জন্যই বলেছিলাম।

যাই হোক, বলেছিলে তো! আমিও হলপ করেছিলাম যে তোমার উপর কোন দাবী করব না। বলেছিলাম, যতদিন বাঁচব তোমাকেই ভালবাসব; কিন্তু কোন দাবী জানাব না। ওরা সবাই ভাবত যে আমি খারাপ মেয়ে—গানকি। কিন্তু ভার্জিনিয়ার লোকেদের কথায় কিছুই আসে যায় না আলেন। আমাকে তারা পেয়েছে, সেটাও বড় কথা নয়। কিন্তু তোমার পরে আর কেউ নেই আলেন! তুমি চলে গেলে আমি বাঁচব না।

কি করতে পারি বল! খেড়ে গলায় আমি খেঁকিয়ে উঠি। আমরা যদি স্বামী-স্ত্রী হতাম তো তুমি দাবী করতে পারতে। কিন্তু আমি তো আর স্ত্রীকে ফেলে যাচ্ছি না।

কোন দাবীই আমি করিনা আলেন।

আর এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যেতে পারি—আমার ভেতরটা পচে যাবে।

আমিও এখানে থাকতে চাইনা আলেন। তোমাকেও এখানে থাকতে বলি না। আজ দুবছর জোর লড়াই চলেছে, তবু বুঝতে পারছি না কেন লড়াই করছি। কিন্তু যুদ্ধকে আমি ঘৃণা করি। পুরুষের জীবন বলি দিয়ে আর আর মেয়েদের জীবনে স্থায়ী দুঃখের ছাপ এঁকে কি লাভ আলেন?

আমি বলতে পারব না। বিমর্ষভাবে বলি।

তুমি উড়ুরে লোক আলেন; তোমার মনটাও উড়ুরেদের মত ঘরছাড়া।

কিন্তু সঙ্গে কোন মেয়ে নিয়ে আমি যেতে পারব না।

বেশ, কোন অনুযোগ করব না। কিন্তু আজকের রাতটা আমায় জড়িয়ে ধর—অন্তত আজকের রাতটার মত ভালবাস।

বিছানায় পড়ে থাকি কিন্তু চোখে ঘুম নেই। আদ্ধেক রাত ঘুম আসে না। অবশেষে বলি, তোমায় না নিয়ে যাব না।

পরদিন রাতে আমরা প্রস্তুত হই। কেনটনকে যখন জানাই যে বেস আমাদের সঙ্গে যাবে, মাথা বাঁকিয়ে সে আপত্তি করে। আমি তার সঙ্গে তর্ক করি। বলি, সঙ্গে মেয়ে থাকলে খাবার পাওয়া সহজ হবে।

সে এতটা হাঁটতেই পারবে না।

দেখতে কাহিল হলেও বেস পোক্ত আছে। আমি বলি।

কিন্তু তুমি নেহাৎ বুদ্ধু আলেন। স্ত্রী হবার যোগ্য ও নয়। ও তো খানকি! কিসের জন্য একটা খানকির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছ?

তা হলে যে চুলোয় খুশি যাও। আমি যাচ্ছি নে!

বেশ, একটা মেয়ের ব্যাপার নিয়ে তো আর ঝগড়া করা যায় না। একান্তই যদি খানকিটাকে সঙ্গে নিতে চাও তো নিয়ে চল।

তারপর আমরা রওনা হবার উদ্যোগ করি। কেনটন ও গ্রীনের সঙ্গিনীরা উঠে বসে আমাদের লক্ষ্য করে কিন্তু কোন কথা বলে না। কেনটনের সঙ্গিনী ইতিমধ্যেই জেকবের দিকে নজর দিতে শুরু করেছে। মেয়ে নিয়ে থাকবার মত মরদের অভাব কি?

জেকব কোন কথা বলেনি। আগেই সে টের পেয়েছে যে আমরা চলে যাচ্ছি; তবু কিছু বলেনি। জীর্ণ বাস, একগাল দাড়ি ও চুলে-পাকধরা লোকটা বিছানায় বসে আমাদের লক্ষ্য করতে থাকে। তার চোখের দিকে তাকাবার সাহস আমার নেই।

হেনরি লেনও সাগ্রহে লক্ষ্য করছে। বলে, মোহক অঞ্চলে পৌঁছে আমার কোন আত্মীয়ের সঙ্গে যদি দেখা হয় তো আমার অসুখের কথা বল না। বল, স্বাভাবিকভাবে পট করে মৃত্যু হয়েছে।

কেনটন বলে, তোমার মরবার কি হয়েছে হেনরি? ক্রমে ক্রমে খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ছ এই যা।

কিন্তু তোমরা বল, পট করে মারা গেছি।

তার দিকে চেয়ে আমরা হাসবার চেষ্টা করি। তারপর সযত্নে পায়ের পট্টি বেঁধেনি। বেশ বুঝতে পারি, সবাই চেয়ে আছে আমাদের দিকে। এলি এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমাদের দিকে তাকাচ্ছেনা।

আমাদের উপর রাগ করবে না তো এলি? আমি জিজ্ঞাসা করি।

সে জবাব করে না। আমরা তোড়জোড় করতে থাকি। সযত্নে মাস্কেটে গুলি ভরে নিই। প্রত্যেকের দশ রাউণ্ডের মত গুলি আছে। কিন্তু খাদ্য নেই একটুও। মনে মনে যদি মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করি তো গোটা প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট ব্যর্থতা অভিভূত করে ফেলে। তৈরী হয়ে আমরা জটলা করে দাঁড়াই এবং পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। কেউ দরজার দিকে পা বাড়াচ্ছে না। এতদিন যে আস্তানায় কেটেছে শেষবারের মত তার ধোঁয়ায় কালো কাঠ, দেয়ালের গায়ে বানান বিছানা এবং পাথরের মত মেজে দেখে নিই। আমাদের নিজেদের হাতেই এ সব তৈরী হয়েছে।

কোথায় চলেছি আমরা?

কেনটন বলে, যাবার সময় হল।

শেষ অবধি আমি বলে উঠি, চলে এস এলি। কোন অন্যায় কাজ করছি না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোন মাইনে পাইনি, রাম পাইনি কিম্বা কোন খাবারও জোটেনি। বছর দুয়েক তো পরের হয়ে লড়লাম! চলে এস।

এলি মাথা ঝাঁকায় কিন্তু কোন জবাব করে না।

তার স্বরে জেকব বলে, আঃ যীশু! দাঁড়িয়ে আছ কিসের জন্য? যে চুলোয় খুশি চলে যাও। তোমাদের মত মেরুদণ্ডহীন ভীরুর সঙ্গ থেকে অব্যাহতি পাওয়াও আশীর্বাদ। একবার মনে হয়েছিল আলেন

যে, তোমার মধ্যে সাচ্চা মানুষ হবার উপাদান আছে। কিন্তু এখন দেখছি, বোস্টনের ওই নিরক্ত মুদ্রাপক আর তুমি এক। কেনটনের কথা ছেড়ে দাও। মন বা বুদ্ধির বালাই ওর নেই। কিন্তু কোনদিন ভাবিনি যে তুমি বোস্টনয়ালার পথ ধরবে।

জেকব !

কোন কথার দরকার নেই। বেরিয়ে যাচ্ছ না কেন ?

যাচ্ছি। বিষণ্ণভাবে আমি বলি।

চার্লি দরজার দিকে এগোয় এবং কবাট খুলে ফেলে। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢোকে। হাত নেড়ে চার্লি তার সঙ্গিনীর কাছ থেকে বিদায় নেয়। কেনটন তার পেছনে যায়। তারপর বেসের হাত ধরে আমিও বেরিয়ে পড়ি এবং কবাট বন্ধ করে দিই।

রাত্রির অন্ধকারে কয়েক পা এগিয়ে আমরা আস্তানার দিকে ফিরে তাকাই। মনে হয় যেন কোন স্পন্দন, কোন জীবনের চিহ্ন দেখতে চাই। লম্বা সার বেঁধে পরিখার আশ্রয়গুলো তৈরী করা হয়েছে। ক্রমে আমরা আস্তানার লাইন ছাড়িয়ে যাই।

বেসের মুখের দিকে ফিরে তাকাই। প্রসন্নতায় উজ্জ্বল তার মুখ। খানিকটা দূরে দূরে হাঁটছে। যেন বুঝিয়ে দিতে চায় যে এখনও তার গায়ে জোর আছে। বলে, আমি হাঁটতে পারি অ্যালেন। আমার জন্য ভেব না। পাকা হাঁটিয়ে আমি।

মনে মনে খুশি হবার চেষ্টা করি। মুক্ত আমরা। আর পেছন ফেরা নয়।

যদি কেউ রোখে ? কেনটন বলে। তখন কি হবে ?

দৃঢ়ভাবে আমরা মাস্কেট চেপে ধরি। পেনসিলভানিয়ানদের ছাউনি পেরিয়ে এসেছি। আমাদের ডাইনে জেনারেল পুয়োরের লোকজনের ঘাঁটি। পাতলা জঙ্গলা জায়গাটির মধ্য দিয়ে আমরা

খোলা জায়গায় বেরিয়ে পড়ি। পাহাড়ের পর দাঁড়ান একটি শান্ত্রী আমাদের দেখতে পায়।

দৌড়ে পার হবে? গ্রীন জিজ্ঞাসা করে।

দৌড় দিলে গুলি করবে। কেনটন বলে। ও তো অফিসার নয়। সোজা কথায় বলব।

ও অবুঝ হবে না। আশায় বুক বেঁধে বলি।

বেস আমার গাঁ ঘেঁষে চলতে থাকে। আরও আস্তে আস্তে হাঁটি। শান্ত্রীটির কাছে ঘেঁষে দাঁড়াই। কি বলব ঠাহর করে উঠতে পারি না।

কোথায় যাচ্ছ? সে জানতে চায়।

পেনসিলভানিয়ার লোক আমরা।

তখন সে বুঝতে পারে যে বেস মেয়ে। তার চোখ টান হয়ে ওঠে। সেও আমাদের মত দাড়িওলা উসকো-খুসকো। আসলে আমরা যা, তা বুঝতে তার ভুল হয় না।

আমি মরিয়া হয়ে বলি, আমরা দল ছেড়ে যাচ্ছি। 'আর ফিরব না। যদি মরতে চাও তো আমরাও মরতে প্রস্তুত। গ্রীন তার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে।

দলত্যাগী! খাপছাড়াভাবে লোকটি বলে।

কি, জবাব দাও। কেনটন জানতে চায়।

এগিয়ে যাও! হা যীশু খ্রীস্ট, কোন লোককে আমি আটকাব না।

আমরা এগিয়ে চলি। পেছন ফিরে দেখি শান্ত্রীটি তখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। গালফ্ রোড পার হয়ে আমরা প্যারেডের মাঠে পড়ি। আকাশে চাঁদ উঠেছে। বরফের পর লম্বা লম্বা ছায়া পড়ে।

বেস তখন খোঁড়াতে শুরু করেছে। তার একটা পায়ের পট্টি খুলে যায়। আমি বেঁধে দিই। গজ গজ করে গ্রীন বলে, আগেই বলেছিলাম মেয়ে সঙ্গে এন না।

হাতটা খুলবার সঙ্গে সঙ্গে অসার হয়ে যায়। বাতাস নেই কিন্তু দুরন্ত শীত। পায়ের পট্টি ধরে আমি হাতড়াতে থাকি এবং কোনমতে বেঁধে দিই। আবার এগিয়ে যাই। সামনে একখানা ধূসর পাথুরে বাড়ী পড়ে।

বোধহয় ভারনামের বাসা। কেনটন বলে।—পাশ কাটিয়ে যাব।

পেছন ফিরে আমরা দুর্গটি এড়িয়ে যাই। আর এক লাইন আস্তানার পাশ দিয়ে চলতে থাকি। লাইনটির প্রান্তে আর একজন শান্ত্রীর সঙ্গে দেখা। সে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায় কিন্তু আমাদের দিকে এগোয় না।

চল। কেনটন বলে।

আমরা তার পাশ কাটিয়ে যাই। ঘার ফিরে সে আমাদের লক্ষ্য করে, কিন্তু থামাবার চেষ্টা করে না। আমরা দৌড়োতে শুরু করি এবং হাঁপাতে হাঁপাতে বনের মধ্যে ঢুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই। বেস ডুকরে কেঁদে আমায় জড়িয়ে ধরে।

নদীটা কি করে পার হব? কেনটনকে জিজ্ঞাসা করি।

সে বিস্ময়ে ঘাড় ঝাঁকায়। বলে, এইভাবে মরে-যাওয়া অনেক ভাল। অনেক ভাল গুলিতে মরা। নদীতে নামলে জমে মারা যাব।

আমিই তোমাকে পালাবার বুদ্ধি দিয়েছি আলেন। ফুঁপিয়ে কাঁদে বেস।

আমায় তুমি দোষ দেবে যে আমিই বুদ্ধি দিয়েছি।

আঃ খ্রীস্ট— চুপ কর! ফিসফিস করে গ্রীন বলে।

আবার চলতে শুরু করি। হুমড়ি খেয়ে গড়াগড়ি খেয়ে গাছ জড়িয়ে ধরে জামা কাপড় ছিঁড়ে এগিয়ে চলি। বরফ জড়িয়ে মাস্কেট গুলো অকেজো হয়ে যায়—বারুদ ভিজে যায়। আমাদের গায়ের জোর ইতিমধ্যেই খতম হয়ে এসেছে। তবু টলতে টলতে কোনমতে বনের

মধ্য দিয়ে শুয়েলকিলের পারে নামি। নদীর পারে এসে বরফের পর শুয়ে পড়ি এবং জোরে জোরে হাঁপাই। কারও নড়বার ক্ষমতা নেই।

পুলে পাহারা আছে। আমি বিড়বিড় করে বলি।—পুল দিয়ে পার হবার জো নেই।

হায়রে গাধা, নদীটা জমে গেছে!

যে করেই হোক, কথাটা কারো মনে পড়েনি। হাঁদার মত হেসে উঠি। বেস আমায় আদর করে। বলে, আমি আর ভয় করিনা আলেন। ওখান থেকে তো বেরিয়েছি!

প্রচণ্ড শীত। সেখানে শুয়ে মনে হয়, আমার শরীর অবশ হয়ে আসছে। ঝিম আসে। চোখ বুজবার সঙ্গে সঙ্গে অবসাদে শরীর আচ্ছন্ন করে ফেলে। ঘুমোতে ইচ্ছে হয়। বেসকে কোলে টেনে নিই।

কেনটন আমার ঘাড় ধরে। বলে, এখুনি সরে পড়তে হবে আলেন। শান্ত্রীরা নদীর পারে পাহারা দেয়।

টলতে টলতে আবার উঠে দাঁড়াই। নদী পারে বিরাট বরফের স্তুপ। হোঁচট খেতে খেতে এগোই। বেস প্রায় হারিয়ে যায়। তার পর নদীর বুকে নামি। বাতাসের ঝাপটায় কোথাও কোথাও বরফ সমতল হয়ে গেছে। আমরা তখন হামাগুড়ি দিয়ে এগোই। পথ ঠিক করে চলবার মত শক্তি কারো নেই। গ্রীন মাস্কেট ফেলে তাই ধরে ধরে এগোয়। সেই সময় প্রচণ্ড ভয় হয় যে পেছনের নদী পার থেকে হয়ত আমাদের দেখা যাবে।

অবশেষে নদীর কিনারে পৌছোই। পাড়ে উঠতে প্রাণান্ত কষ্ট হয়। সন্তর্পনে আস্তে আস্তে হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে চলি। সামনে আবার একটা বন পড়ে। বনের মধ্যে গভীর অন্ধকার। আমরা হোঁচট খাই, হুমড়ি খেয়ে পড়ি। গা হাত পা কেটে যায়। এই ভাবে আবার এক ফালি মাঠে পড়ি।

তখন কেনটন বলে, আঃ, আর পারছিনা। দম ফুরিয়ে গেছে। আজ রাতে আর বেশী দূর যাওয়া যাবে না।

কিন্তু থামাও চলবে না। হাঁপাতে হাঁপাতে বলি।

বেস আমার দিকে তাকায়। তার মুখে অবসাদের ছায়া। খুব আস্তে আস্তে চলছি আমরা, তবু সে পেছনে পড়ছে। আমাদের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। মাঝে মাঝে দৌড়ে সে আমাদের ধরে, আবার পেছনে পড়ে।

আগেই মানা করেছিলাম স্ত্রীলোক সঙ্গে এন না। চার্লি বলে।

ছাউনিতে ছিল, সেইখানেই থাকত। ছাউনি ছেড়ে পালান কি সহজ ?

বেস বলে, আমি তোমার সঙ্গেই থাকব আলেন। কোন কষ্ট হচ্ছে না।

আবার সে পড়ে যায়। নেতিয়ে থাকে বরফের পর। পেছন ফিরে দেখি, প্রাণপণে সে উঠবার চেষ্টা করছে।

আগেই বোঝা উচিত ছিল। কেনটন ঘাড় নেড়ে বলে।

ফিরে গিয়ে তাকে তুলে ধরি। সে আমার হাত ধরে। বলে, আমায় ক্ষমা কর আলেন। সত্যিই আমি যোগ্য মেয়ে নই।

আবার আমরা হেঁটে চলি। ক্রমেই টের পাই যে বেস আমার পর ভর করছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আধপেটা খেয়ে কাটাতে হয়েছে আমাদের। তায় আবার অসুস্থ। কারও জুতো নেই। পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। প্রথমে কাপড় দিয়ে জড়ান, তার উপরে হাঁটু অবধি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আমাদের ব্রিচেজও ছেঁড়া। কোটগুলো কাগজের মত পাতলা। কেনটনের মাথায় পরিত্যক্ত একটা টুপি। আমার ও গ্রীনের মাথায় টুপি নেই। আমাদের মাথায় মোরগের মত ঝুটি বাঁধা।

তার পর আমরা একটা সরু নোংরা রাস্তায় পড়ি এবং পথ বরাবর চলতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতেও যেন ঘুমোচ্ছি বলে মনে হয়। সহসা ঘোর কেটে যায়। কেনটন সামনে হাঁটছে। চার্লি থেমেছে। আমার দিকে তাকাচ্ছে সে। ফিরে দেখি, বেস একটা দলার মত বরফের পর নেতিয়ে পড়ে আছে। তার কাছে ফিরে যাই।

এগিয়ে চল আলেন। সে বলে।

আমি তাকে কাছে টেনে আনি। আমায় জড়িয়ে ধরে সে কোটে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। আবার আমরা চলতে শুরু করি। কেনটন ও গ্রীন আগে আগে চলে।

রাত কাটাবার জন্য আমরা থেমে পড়ি। শুয়েলকিল থেকে দুই-এক মাইলের বেশী এগোতে পারিনি। কতটা এগিয়েছি ঠিক বলতে পারব না। আদ্ধেকটা সময় তো দুঃস্বপ্নের ঘোরেই কেটেছে। কিন্তু নদী থেকে খুব বেশী দূর এসেছি বলে মনে হয় না। শীতে প্রায় অসাড় অবস্থায় আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করি।

তখন শুধু এডওয়ার্ড ফ্লাগের কথাই মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে তার ঠোঁটে বরফের চাপের কথা। বেশ গাট্টাগোট্টা জোয়ান লোক এডওয়ার্ড। তবু সে কাঠের গুঁড়ির মত শক্ত হয়ে যায়।

ডাল ভেঙে আর জ্বালানি কুড়িয়ে জড়ো করা হয়। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বেস গুটিশুটি মেরে বসে। চার্লি আগুন ধরাবার চেষ্টা করে। চকমকি দিয়ে মিনিট কয়েক ধরে সে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে কিন্তু কোন লাভ হয় না। অসাড় হাত থেকে চকমকিখানা পড়ে যায়। হাত রগড়ে সে অসাড়তা কাটাবার চেষ্টা করে।

তখন পায়ের পট্টি থেকে এক টুকুরো নেকড়া ছিঁড়ে আমি তার উপর খানিকটা বারুদের গুঁড়ো দিই। কেনটন চকমকিখানা তুলে নেয় এবং একটি ফুলকিতে আগুন জ্বলে ওঠে। সযত্নে আমরা আগুনটি

জ্বালিয়ে রাখি, তার তদারক করি—ফুঁ দিই। ক্রমে আগুনটি বড় হয় এবং শেষে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

দেখা যাবে। কেনটন বলে।

কিন্তু আগুন যে চাই। আগুন না হলে আজকের রাত কাটাতে হবে না।

আগুনটি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার চারপাশে এগিয়ে আসি এবং সর্বাঙ্গে তাত লাগাই। বেস একদম আগুনের কাছে এগিয়ে যায়। তার মুখে প্রসন্নতার ঝিলিক। হাঁদার মত হাসে কেনটন। বলে, এডওয়ার্ড একলা এসে ভারি ভুল করেছিল। একলা কোন লোক কি করে যে উত্তরে যেতে পারে, এ আমি ভেবেই পাই না।

এডওয়ার্ডের কথায় কাজ নেই।

কেন, বললে দোষ কি? পরিহাসচ্ছলে সে বলে।

আমার পেটটা খিঁচে ধরেছে। কিছু নেই। চার্লি বলে।—এক টুকরো মাংস যদি এখন পাই তো দশ বছর চাকর খাটতে রাজী আছি।

খাবারের অভাব হবে না; কাল পর্যন্ত খাবার মিলবে।

আগুনের কাছেকাছেই থাকি। আগুনটা জ্বালিয়ে রাখবার জন্য পালা করা হয়। ভাল করে সাফ সাফাই করে আমরা নতুন করে বন্দুকে গুলি ভরে রাখি।

কেনটন প্রথম পাহারা দেয়। আমি বেসকে কোলে নিয়ে শুয়ে পড়ি। চার্লি খানিকটা দূরে সরে আছে। বেশ বুঝতে পারি যে, আমি মেয়ে নিয়ে শুয়ে আছি বলে কেনটনের হিংসে হয়।

আমার বুকের মধ্যেও ঠকঠক করে কাঁপছে বেস। আমি তাকে গরম করতে পারিনি। তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি। নিজেকে

প্রবোধ দেবার ছলে বলি, আমরা জমে যাব না। কিন্তু কেনটন যদি ঘুমিয়ে পড়ে আর আগুন নিভে যায়?

আমি যোগ্য স্ত্রীলোক নই আলেন। মনে হয় বেস পড়া মুখস্ত বলছে।

আমাকে সঙ্গে এনে ভুল করেছ। আমি তোমার বোঝা বই আর কিছুই নয়।

এক সঙ্গেই যাব। আমি বলি।—বিশ্রাম করবার মত একটা জায়গা খুঁজে নেওয়া যাবে। তারপর আবার একসাথে চলব। আজকের রাতের মত এত কষ্ট আর হবে না।

তুমি ভাল লোক আলেন। জোয়ান সাচ্চা লোক বলেই আমার পর এত দরদ দেখাচ্ছে।

আমিই তো তোমায় আসতে বলেছি। বলেছি যখন, আমিই দেখাশোনা করব। প্রচ্ছন্ন গর্বে ভরসা দিয়ে বলি।

তোমার যত্ন আমি চাইবনা আলেন। আমার নিজেরটা আমি নিজেই দেখে নিতে পারব।

আমি তোমায় রক্ষণাবেক্ষণ করব। নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর মত দেখব। বুঝলে?

সত্যিই একদিন আমায় বিয়ে করবে আলেন?

অনেক কিছুই তো করব ভাবছি।

তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ে। আমি তাকে বুকে করে রাখি আর একদৃষ্টে চেয়ে থাকি নক্ষত্রের দিকে। লক্ষ্য করি অন্ধকার আকাশের বুকে ফুলকির মত তাদের উদয় ও আলো বিকিরণের রহস্য। এলি ও জেকবের কথা মনে পড়ে। ভাবি, আর তাদের সাথে একসঙ্গে থাকার উপায় নেই। আমরা চলে আসবার সময় এলির অবস্থার কথা এই প্রথম আমার মনে পড়ে।

নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কেনটন আমায় জাগাচ্ছে।

তোমার পালা আলেন। সে বলে।

আমি উঠে পড়ি। বেসকে ছেড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে হি হি করে কাঁপ ধরে। ঘুমের ঘোরে সে আমার নাম ধরে ডাকে।

কিছু দেখতে পেয়েছ ?

কিছুই না। কেনটন বলে।

তারপর সে গুটিসুটি মেরে আগুনের প্যাশে কাত হয়। আমি মাস্কেটে ভর করে আগুনের শিখার দিকে চেয়ে থাকি।

—নয়—

ভোরবেলা ছাউনির বিউগলের আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙে। খুব দূরে আসতে পারিনি তো! বিউগলের আওয়াজ ক্ষীণ, তবু প্রভাতী হাওয়ায় বেশ স্পষ্ট শোনা যায়।

বেস চোখ মেলে আমার দিকে তাকায় এবং ফিক করে হেসে ফেলে। আমি পাশে আছি বলে তার হাসির মধ্যে একটা গভীর সন্তোষের ভাব ফুটে বেরোয়। আমার মুখ স্পর্শ করে সে দাড়িতে হাত বুলোয়।

খানিকটা ভাল লাগছে ? জিজ্ঞাসা করি।

হাঁ। পেটে ক্ষিদে আছে বেশ ; কিন্তু ক্ষিদে আমি সইতে পারি আলেন। ক্ষিদের ভয় করি না।

চালি আগুনটা জ্বালিয়ে রাখছে। একটু বাদেই গোটা কয়েক ভুট্টা নিয়ে কেনটন মাঠ থেকে ফিরে আসে। ডেকে বলে, আজ এই দিয়েই উপোস ভাঙব।

আমি উপোস ভাঙার কথা ভাবছি না। ভাবছি এখান থেকে

সরে পড়বার কথা। চার্লি বলে।—ছাউনির বেশ কাছাকাছিই আছি, এখনও দল ছাড়তে পেরেছি বলা যায় না।

আর আমাদের রুখতে পারবে না। আমি বলি।—কালকের রাতই যখন কেটেছে, তখন আর থামাতে পারবে না।

আমরা উত্তর-পূবে যাব। গম্ভীরভাবে বলে কেনটন।—আসির নীচের দিকে ভাল ভাল রাস্তা আছে।

এখন যদি ঘোড়া থাকত!

চার্লি আমাদের দিকে তাকায়।

হয় ঘোড়া যোগাড় করতে হবে, না হয় বরফের পর মরণ নিশ্চিত। আমি বলি।

ভুট্টাকটা আগুনে সেঁকে নিই। এ শূয়োরের খাদ্য, তবু হাভাতের মত তাই খেয়ে ফেলি।

এগুলো বরফের তলা থেকে খুঁড়ে বার করেছি। কেনটন বলে।—এতকাল যে আছে এই তো আশ্চর্য। ঝেঁটিয়ে সব ভুট্টা কেটে নিয়ে গেছে।

আমরা পূবমুখো নোরিস টাউনে যেতে পারি। ওদিকে ভাল ভাল খাবার আছে।

নিঃশেষে ভুট্টাকটি শেষ করে বন্দুক নিয়ে পরখ করে দেখা হয়। তারপর আবার রওনা হই। আস্তে আস্তে চলেছি কিং অফ প্রুশিয়া রোডের দিকে। গত রাত্রে, বেশ শিক্ষা হয়েছে। বেশ বুঝতে পারি, সামান্যই শক্তি আছে আমাদের এবং তা বাঁচিয়ে চলা আবশ্যক। আজ সকালেও দুরন্ত শীত, তবু কালকের রাতের মত অতটা নয়। আকাশে সূর্য দেখা যায়। পরিষ্কার উজ্জ্বল সূর্য। লম্বা লম্বা নীল ছায়া পড়ে বরফের বুকে। ঝিকমিক করে বরফ। প্রতিটি দানা আমাদের চোখে ধারালো আলোর বাণ হানে।

বেসের মুখে সহাস্য দীপ্তি। আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে দেখায় যে কতটা লম্বা লম্বা পা সে ফেলছে।

আমি পাকা হাঁটিয়ে আলেন। বেশ পাকা হাঁটিয়ে।

তা বটে। আমি সায় দিই।

সবাই উৎসুক। কেনটন সামনে যাচ্ছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে মাস্কেট ঝুলিয়ে বেশ আত্মপ্রত্যয়ের ভাবে হাঁটছে। কেনটন পথ দেখাচ্ছে বলে সবাই খুশি। আমার থেকে চার বছরের বড় সে—বেশ জোয়ান লোক। বেস দেখতে অনেকটা বালকের মত। লিকলিকে। তার লম্বা কালো চুলের থোপনা কোঁকড়ান! চার্লি একটা গানের দু একটা কলি গাইছে।

বেস বারবার আমার দিকে তাকায়। বলে, কোন অনুশোচনা হচ্ছে না তো আলেন ?

না।

এলির কথা মনে পড়ছে। চার্লি বলে।—এলির মত লোকেদের আমি কোনদিন বুঝতে পারি না। অদ্ভুত সহ্যগুণ।

সেও এলে পারত।

জেকবকে ছেড়ে সে কিছুতেই আসবে না। জেকব যতই বদ মেজাজি হক না কেন, ওদের দুজনের মধ্যে একটা সমঝোতা আছে। ইহুদিটিকে বাদ দিলে, অত ভাল আর কাউকে বাসে না জেকব। ঠিক বুঝতে পারি না, তবে ইহুদিটি মারা গেলে জেকব যত দুঃখু করেছে, তাকে অমন দুঃখু করতে আমি দেখিনি।

ইহুদিদের ভয় করে আমার। বেস বলে।—পনেরো বছরের আগে কোনদিন ইহুদি দেখিনি। মা বলতেন যে একদিন একজনকে দেখিয়ে দেবেন ; তাহলেই নাকি ভালভাবে বাইবেল বুঝতে পারব।

বোস্টনে অনেক ইহুদি আছে। চার্লি বলে।—স্যাম আদসম্ তাদের

নিঙড়ে পয়সা আদায় করতে ভারি ওস্তাদ। বিপ্লবের কথা বলে সে ওদের শেষ শিলিংটি পর্যন্ত আদায় করে নিত। তার ওই গাল-গল্পের চাইতে ইহুদিদের নিঙড়াবার কায়দার জন্য লোকে তাকে বেশী শ্রদ্ধা করত।

শুনছি হ্যামিলটনও নাকি ইহুদি?

চোখের ভাব দেখে তো তাই মনে হয়।

ততক্ষণে আমরা রাস্তার কাছে এসে পড়ি। কেনটন আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে কান পেতে শোনে।

কি শুনছ? আমি জিজ্ঞাসা করি।

শিবিরের খুব কাছাকাছিই আছি আমরা। ভাবছি, বনের পথে আরও খানিকটা ঘুরে গেলেই বোধহয় ভাল হয়। গাছের আড়াল অনেক নিরাপদ।

রাস্তার উপরেও কোন অসুবিধে হবে না।

চারদিকে কোয়েকারদের বাস। ও ব্যাটাদের আমি বিশ্বাস করি না।

ভয় করবারও কিছু নেই। আমি দৃঢ়ভাবে বলি।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলি আমরা। বেস আমার পাশে। আবার খোলা রাস্তায় পড়ে নতুন করে দূরত্ব অনুভব করি। বুঝতে পারি, বরফে ঢাকা পাহাড়-ঘেরা মোহক অঞ্চল শত শত মাইল দূরে। বেস আমার গা ঘেঁষে আমার মুখের দিকে তাকায়। বেশ বুঝতে পারি, আমার মত সেও মনে মনে বুঝছে যে এত দূর পথ অতিক্রম করা তার সাধ্যাতীত। অতটা শক্তি তার নেই। ছোট্ট ভীতু বালকের মত সে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, মাঝে মাঝে আমার বেজায় ভয়-করে আলেন। আমায় ধর।

কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? কেনটন জিজ্ঞাসা করে।

আমি মাথা নাড়ি। পথ ধরে আমরা নোরিস টাউনের দিকে এগিয়ে চলি। খুব আস্তে আস্তে হাঁটছি। ঠাণ্ডাটা ক্রমেই যেন বেশী লাগছে। শ'খানেক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াই।

ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনছি। কেনটন বলে।

ও পণ্টনের নয়। শব্দটা আমিও তখন শুনছি। বরফের পর অস্পষ্ট ঠকঠক আওয়াজ।

বেস আমার দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকায়।

না, পণ্টনের না। চার্লি চীৎকার করে বলে।—পথ দিয়ে যাচ্ছে।

একটার বেশী ঘোড়া।

চাষীরা অমন ভাবে চলে না তো!

শিগগির গাছের আড়ালে ঢুকে পড়। কেনটন চেঁচিয়ে ওঠে।

কিন্তু রাস্তার দুই দিকেই মাঠ। যেদিক থেকে শব্দটা আসছে, শুধু সেই দিকেই গাছ আছে। বরফের একটা ঢিবি দেখে বোঝা যায় যে নীচে পাথুরে দেয়াল আছে। রাস্তার উপর লম্বা লম্বা ছায়া এবং বরফের ঝিকিমিকি এমন এক দৃশ্য সৃষ্টি করে যে অনেকদিন সে দৃশ্য আমার মনে থাকে।

জড়পিণ্ডের মত আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। বেস বলে, আমিই তোমাকে বিপাকে ফেলেছি আলেন। ভগবান আমায় ক্ষমা করুন!

পথ ছেড়ে কেনটন আবার সামনে চলে। চার্লি তার পেছনে। কেনটন হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় আর চার্লি তাকে তুলে ধরে। বেসের হাত ধরে আমি তাকে পাথুরে দেয়ালের গায়ে জমাট বরফের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যাই। দেয়ালটা বেয়ে উঠি। গুলি খাওয়া মানুষের মত বারে বারে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কেনটন। পেছন ফিরে দেখি, জন বারো ঘোড়-সওয়ার আমাদের দিকেই ছুটে আসছে।

ম্যাকলেনের হানাদার দল। কেনটন কেঁদে ফেলে।

সওয়ারদের একজন সামনে এগিয়ে আসে। শুনতে পাই সে আমাদের থামতে বলছে। জোর কদমে ছুটছে তারা। অশ্বখুরের আওয়াজ আমার কানে ড্রামের শব্দের মত বাজে। তবু বেসকে টানতে টানতে এগিয়ে চলি। কেনটন আর চার্লি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা বেশ বুঝতে পারছে যে বেসকে নিয়ে সওয়ারদের আগে আমি বনে পৌঁছোতে পারব না। তবু তারা অপেক্ষা করে এবং মাস্কেটে তাক করে।

আমি চেঁচিয়ে বলি, দোহাই ভগবানের, গুলি কর না। পালাও।

আমরা প্রায় গাছের কাছাকাছি এসে পড়ি। মনে হয়, ঢুকে পড়তে পারব। দৌড়োবার ব্যাথায় আমার কান্না পায়। গুটিকয়েক ঘোড়া বরফের মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়ে। সামনের লোকটা চেঁচিয়ে বলে, থাম, না হয় গুলি করব।

জাহান্নামে যাও। তারস্বরে খেঁকিয়ে ওঠে কেনটন।—দৌড়োও আলেন। ওরা বরফের মধ্যে পথ হারিয়েছে।

আবার আমি ফিরে তাকাই। চার্লি ও কেনটনের কাছাকাছি এসে পড়েছি। মাস্কেটে তাক করে ওরা বনের দিকে ছুটছে। সহসা লোকগুলো ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। আমাদের পেছনে গুলির আওয়াজ হয়। বেস আমার হাত থেকে ছিটকে যায়···কাঁদতে থাকে।

সবই দেখে কেনটন। গালাগাল দিতে দিতে সে আমার দিকে ছুটে আসে। চার্লিও আসে তার পেছু পেছু। আমি ঘুরে দাঁড়াই। অশ্বারোহীরা তখন আমাদের ঘিরে ফেলছে। সব কিছু আমার চোখে তখন লালমত ঝাপসা লাগে। আমি গুলি ছুঁড়ি। কেনটন আর চার্লিও ছোড়ে। যন্ত্রের মত আপনা থেকে তাদের মাস্কেট থেকে গুলি ছুটে যায়। একটি ঘোড়সওয়ার আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ে। তার সেই পড়ে-যাওয়ার ছবি চিরকালের মত আমার মনে উৎকীর্ণ হয়ে যায়।

তখন বেসের দিকে তাকাই। কি হয়েছে, ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করি। বরফের পর কুঁকড়ে পড়ে আছে বেস।

ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। তখন লড়াই করা নিরর্থক। কেন যে গুলি করলাম ভেবে অবাক হয়ে যাই। ওরাও আমাদেরই মত দাড়িয়ালা জীর্ণ জামা-কাপড়-পরা। আমাদের মতই ওদের পায়ে রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আমাদের মতই ওরা শীর্ণ ও ক্লান্ত।

অশ্বারোহীরা আমাদের পাকড়াও করে। জোরাজুরি করে আমি বেসের কাছে যাবার চেষ্টা করি। বলি, ওর কাছে যেতে দাও। যখন ধরে ফেলেছ তখন আর কি! যেতে দাও!

ম্যাকলেন আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। ছোট্ট একটি গোঁফ ছাড়া গাল কামান যুবক। পরণে সাদা ব্রিচেজ আর ভাল একটা নীল কোট…তরোয়াল পিস্তল আর ভাল একটা টুপি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে সে। মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

পল্টন ছেড়ে পালাচ্ছিলি? সে জিজ্ঞাসা করে। যাকে আমি পড়ে যেতে দেখেছি, দুটি লোক তাকে ম্যাকলেনের পেছনে বয়ে নিয়ে আসে। বোঁ করে ঘুরে ম্যাকলেন জিজ্ঞাসা করে…নাম কি?

ডেভ সিলি।

আহত হয়েছে?

সবই দেখছি। লোকটির মাথায় গুলি লেগেছে। বেসের কথা ভাবতে ভাবতে চট করে মনে হয়, কার গুলি লাগল? কার গুলি ওটা?

শালা শূয়োর কা বাচ্চা! ম্যাকলেন আমাদের বলে।—নচ্ছার ভীরু শূয়োর কোথাকার! নিজের হাতেও যদি তোদের ফাঁসিতে লটকাতে হয় তাহলেও এজন্য তোদের ঝুলতে হবে।

বিমর্ষভাবে কেনটন চেয়ে থাকে। চার্লি বলে, ওকে ওর সঙ্গিনীর কাছে যেতে দাও। ওর সঙ্গিনীকে গুলি করেছ তোমরা।

আমি হাত ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। জনকয়েক মিলে বেসকে চিৎ করে দিচ্ছে। তারস্বরে আমি চেঁচিয়ে উঠি, হাত দেবে না! হা খ্রীস্ট, ওকে একলা থাকতে দাও।

এটা মেয়েছেলে। তাদের একজন বলে ওঠে।

আমি তখন অনুনয় করি: ওর কাছে যেতে দাওনা একবারটি। তোমরা তো ধরেই ফেলেছ, এখন আর কি? যেতে দাও।

চুপ কর শালা!

যেতে দাও বলছি…। টানাটানি করে আমি ছাড়িয়ে যাই। কেমন করে হাত ছাড়ালাম বলতে পারি না। কেউ আমাকে আটকায়নি। ছুটে আমি বেসের কাছে যাই। যে-কটি লোক তার উপর ঝুঁকে দেখছে, আমাকে দেখে তারা সরে দাঁড়ায়। হাঁটু ভেঙে আমি তার পাশে বসি। দেহের কোথাও গুলি লেগেছে। সামনের দিকের জামা কাপড় রক্তে চুপচুপ হয়ে গেছে। আমি তার গাল রগড়াই। বেস চোখ মেলে। বারবার তার গাল ঘষতে থাকি।

আলেন। সে ডাকে।

কোন জবাব মুখে জোগায় না। দু বছর পল্টনে থেকে যুদ্ধ করলে কোন আঘাত প্রাণান্তকর তা বুঝতে কষ্ট হয় না। চোখের চাহনি দেখেও বোঝা যায়। সেও বুঝতে পেরেছে। সে গভীর উপলব্ধির ছাপ তার চোখে ফুটে উঠেছে। কি বলব আমি?

সে বলে, আমার জন্যই তোমার এই ঝামেলা আলেন। পুরুষের যোগ্য স্ত্রীলোক আমি নই।

মাথা ঝেঁকে আমি তাকে প্রবোধ দিই। সে হয়ত বুঝতে পারে যে আমি চলে যাচ্ছি, তাই ফিস ফিস করে বলে, আর একটুখানি থাক আলেন।

আস্তে আস্তে আমি উঠে দাঁড়াই। গলা ছেড়ে বলি, আমারই বোঝা উচিত ছিল যে মেয়েছেলের পক্ষে এতটা দূর হাঁটা সম্ভব নয়।

তখন অশ্বারোহীরা আমাকে ধরে নিয়ে আসে। বাঁকা চোখে ম্যাকলেন লক্ষ্য করছে আমাকে। কেনটনের মুখে পরিপূর্ণ হতাশার ছবি। তাদের কাছাকাছি এলে চার্লি গ্রীন আমাকে ধরবার জন্য হাত বাড়ায়।

আলেন!

মনে ভাবি, এ গুলি তো আর-যে কারও গায়ে লাগতে পারত! মোটেই অসম্ভব নয়। মনে মনে বলি, আবার ফিরে যেতে হবে।

ও ভাবে মরায় খুব কষ্ট হয় না। দরদী কণ্ঠে চার্লি বলে।

আমি দুঃখু করছি না। ওর জন্য আমি দুঃখু করছিনে। মরিয়া হয়ে বলে উঠি।

শান্ত হও আলেন।

হাঁ হে শান্ত হও! শিগগিরই ওর সঙ্গে মিলতে পারবে। ম্যাকলেন বলে।

চীৎকার করে ওঠে কেনটন, দোহাই ভগবানের, ওকে খুঁচিও না। ওকে না হয় বিদ্রূপ নাই করলে।

আবার আমাদের রাস্তায় নিয়ে আসে। আমি পেছন ফিরে তাকাই। রোদে ঝলমল ঠাণ্ডা প্রভাতের রূপে চোখ ঝলসে যায়। রাস্তায় এসেই দেখি, একদল সৈন্য হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে। ছাউনিতে বসেই তারা গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। সৈনিকেরা আমাদের ঘিরে ধরে। ঘটনাটি নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়।

পেনসিলভানিয়ার দলত্যাগী।

দুটি লোক বেসকে নিয়ে আসছে। আমারই পাশাপাশি হাঁটছে তারা।

ওয়েন গর্ব করে বলে যে তার দলের কেউ দল ছেড়ে পালায়নি।

এইবার খানিকটা দেমাক ভাঙবে।

মোহকে চলেছি আমরা! কেনটন হেসে ওঠে।—হা ভগবান, খুব মোহকে যাচ্ছি!

ম্যাকলেন তখন ব্রিগেডের ফৌজদারটির হেপাজতে আমাদের দিয়ে দেয়। বলে, এদের ছাউনিতে নিয়ে যাও। আটকে রাখবে। আমার এক সওয়ারকে খুন করেছে। আমি নিজেই ওদের সোপর্দ করব।

আমরা খুনী নই। গ্রীন চেঁচিয়ে ওঠে।—আপনার লোকজন গুলি করবার পরেই আমরা গুলি করেছি।

শালা শূয়োরদের নিয়ে যাও। ম্যাকলেন খেঁকিয়ে ওঠে।

সৈনিকেরা আস্তে আস্তে নিয়ে চলে। সৈন্যদলের যুবক অফিসারটির নাম ক্যাপ্টেন কেনেডি। লোকটা খুব কড়া নয়। এরাও মাসাচুসেটসের লোক। কেনটন এদের জনকয়েককে চেনে। তাই পথে বিশেষ দুর্ভোগ ভুগতে হয়নি। অফিসারটি বুঝতে পারে কত দুর্বল আমরা। তাই আস্তে আস্তে মার্চ করিয়ে নিয়ে আসে। তবু দীর্ঘ পথ চলতে হবে। কেনটন এগিয়ে এসে আমার ঘাড়ে হাত দেয়। বলে, কাল রাতে খুব ফাঁকি দিয়েছিলাম, কিন্তু এত শিগগির যে ফিরতে হবে তা ভাবিনি। সরাসরি কোন অশ্বারোহীর হাতে ধরা পড়ব, এ ভাবতেও পারিনি।

তোমায় দুষছি না কেনটন।

মেয়েটি মারা গেল! সেজন্য তুমি হয়ত আমাকে দোষ দেবে আলেন। ওর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।

না, কারুকেই দুষছি না আমি।

কিং অফ প্রুশিয়া রোড ধরে আমরা চৌমাথায় এসে পড়ি এবং ডাইনে মোড় ঘুরে ছাউনির দিকে চলতে থাকি। ভারনামের সৈন্যদলের

আস্তানার পাশ দিয়ে যাবার বেলা কেনেডি একজন ড্রাম বাজিয়ে ডাকতে পাঠায়। পেনসিলভানিয়া আর নিউ জার্সির লাইনের কিছু কিছু লোক আমাদের দেখবার জন্য ভীড় করে। নিহত ও দণ্ডিতের স্মরণে ড্রাম বাজিয়ে চাপা একঘেয়ে বাজনা বাজায়। কেউ কেউ মাথা হেঁট করে। আমরা ধীরে ধীরে এগোই। শুনি একজন বলছে···বেচারী!

চলবার সময় ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের অস্থির করে তোলে। রোদে ঝিকমিক-করা বরফে চোখ ধেঁধে যায়। ও নিয়ে আমি বড় বেশী ভাবছি না। বুঝতে পারছি, বেস মারা গেছে এবং ইতিমধ্যেই সে আমার পল্টনের জীবনের স্মৃতির অংশ হয়ে পড়েছে। ওরা যায়-আসে, ডাক্তার বলেছিল একদিন। এমনি করেই মস ফুলারও মারা গেছে। আর ভাবতে পারি না।

আমরা এক পরিখার আস্তানায় ঢুকে পড়ি। ঠাণ্ডা কাঠের ঘরে একখানা ক্যাম্প টেবিলের পাশে কর্ণেল ভারনাম বসে আছেন। কেনেডি সেলাম করে। সৈনিকেরা 'এটেনশন' হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমরা একেবারেই অবসন্ন হয়ে পড়েছি। কুঁজো হয়ে হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

দলত্যাগী স্যর। কেনেডি বলে।—ক্যাপ্টেন ম্যাকলেন পাকড়াও করেছেন। এরা গ্রেপ্তার করবার সময় বাধা দেয় এবং ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের একজন সঙ্গী মারা গেছে। এদের মাস্কেট আমার কাছে আছে। সবকটার গুলি ছোড়া হয়েছে। ম্যাকলেনের লোকটির মাথায় গুলি লাগে। এদের সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। বুকে গুলি লেগে সেও মারা গেছে। ম্যাকলেনের লোকেরা একবার মাত্র গুলি ছোড়ে।

রেজিমেন্টের নাম কি? ছাড়া ছাড়া ভাবে বলে কর্ণেল। আমাদের ঘটনার মত এত ঘটনা ঘটে গেছে যে এখন আর এতে এমন কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে না।

চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়া।

ওয়েনের লোক ?

আমরা ঘাড় নাড়ি।

নাম কি তোমাদের ?

নাম বলি।

হতচ্ছাড়া জানোয়ার, বুঝলে কেনেডি।—জন কয়েককে শিক্ষা দিতে হবে। দেখি তাহলে যদি বশে আনা যায়!

কেনেডি কোন জবাব করে না।

এদের কয়েদখানায় রেখে দাও।

লম্বায় আড়ে চার হাত করে একটি কামরায় আমাদের নিয়ে আসে। খুপরিটির কোন জানালা নেই। গাছের গুড়ির ফাঁকে ফাঁকে ফুটো আছে। মেজে নোংরা, চাল নীচু এবং আগুনের কোন ব্যবস্থা নেই ঘরে।

ওরা দরজা বন্ধ করে দেয়। শুনলাম কেনেডি বলছে···বেচারী!

নীরবে আমরা মেজেয় বসে থাকি। ভাঙা কাঠের ফাঁক দিয়ে পাতলা আলোর ফালি ঢুকছে। কেনটনের হলদে দাড়িতে সোনার ছোপ লাগিয়ে দিচ্ছে সোনালী রোদ।

সবাই শীতে জমে গেছি। আপনা থেকেই আমরা পরস্পরের কাছে ঘেঁষে আসি। কিন্তু কেউ কথা বলে না।

আমার পা দুটো টনটন করছে। সামনে পা ছড়িয়ে বসি। থরথর করে কাঁপছে আমার দেহ। বোধহয় শীতে।

ফাঁসিতে ঝুলতে হবে এ কোনদিন কল্পনাও করিনি। শিশুর মত অবাক বিস্ময়ে বলে চালি।

—দশ—

আলো নিভে যায়—মিলিয়ে যায় কয়েদখানার আলোর ঝিলিক। তার বদলে দেখা দেয় গভীর ছায়া। বিকেলটা দীর্ঘ ও মন্থর লাগে। তারপর চটপট নেমে আসে রাত্রির আঁধার। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও বাড়তে থাকে। গাছের গুঁড়ির বেড়ার ফাঁক দিয়ে শিরশিরে হাওয়া ঢোকে কয়েদখানায়। মেজে বরফের মত ঠাণ্ডা। আমাদের হাত পা শক্ত হয়ে আসে। নড়াচড়া করে খানিকটা আরাম পাবার চেষ্টা করি।

তিন তিনবার বাইরের পাহারাওলা বদলী হয়। ভাঙা দরজার ফুটো দিয়ে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি জীর্ণবাস শীর্ণ সৈনিকটিকে।

কিছুই খেতে দেওয়া হয়নি আমাদের। ক্ষিদের জ্বালায় প্রথমে আধ পাগলা হয়ে পড়ি। প্রথম প্রথম ক্ষিদে এমনিই তীব্র হয়। তারপর গা-সওয়া পেটের জ্বালা ক্রমে কামনার রূপ নেয়, সব কিছুর জন্য ছটফট করে মানুষ। তেষ্টার মত এ জ্বালা সহ্য করা তত কঠিন নয়।

আমরা দরজায় গুঁতোগুতি করি।...পাহারাওলা, ও পাহারাওলা! দোহাই খ্রীস্টের, আমাদের কিছু খাবার আর একটু জল দাও না।

দরজার কাছাকাছি এসে সে উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকায়।

একটু জল দাও!

ভাল খাবার অপচয় করতে বলছ! সে বলে।

যা হোক কিছু, খানিকটা জল হলেও চলবে।

ভাবছ বুঝি আমিই খুব মজা মেরে খেয়েছি। তোমরা কি মনে কর, এক পক্ষের মধ্যে মাংস জুটেছে আমার? সে জিজ্ঞাসা করে?

আমাদের খানিকটা জল এনে দাও।

সে এক পাত্র জল এনে দেয় এবং আমরা ঢকঢক করে খাবার সময় লক্ষ্য করতে থাকে। বলে, সত্যিই তোমরা হতভাগা। ওয়েনের লোকজনের যে এত দুরবস্থা তা আগে শুনিনি তো!

কয়েদখানায় আমাদের রাখছে কেন?

জিজ্ঞেস করিনি তো!

রাত্রি নেমে আসে। মেজেতেই শুয়ে পড়ি। গরম হবার জন্যে কেনটন আমার গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চার্লি। কালো ছায়ামূর্তির মত দেখায় তাকে। চোখ বুজে ঝিমুতে ঝিমুতে পাশে-শোওয়া দেহটিকে বেস বলে মনে হয়। কয়েদখানাকে মনে হয় আমাদের সাবেক আস্তানা। ভাবি, বেস এখুনি হয়ত নড়ে উঠবে, আমাকে স্পর্শ করবে—আমার দাড়িতে হাত দেবে। বেসের কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করি। ঘুমের ঘোরেও হয়ত তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাব! প্রথমে তার কথার টুকরো কানে আসে···ক্রমে খানিকটা বেশী···তারপর আরও বেশী।

কেনটনকে ঝাঁকানি দিয়ে বলি, বেস? তুমি বেস?

তোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি আলেন?

না-না, স্বপ্ন দেখছিলাম। বড্ড খিদে পেয়েছে কেনটন। তোমার কি মনে হয় ওরা খাবার দেবে? খেতে না পেলে কতদিন বাঁচতে পারে মানুষ? আমাদের যদি ফাঁসিও দিতে চায় তাহলেও তো খেতে দেওয়া উচিত।

চার্লি গজ গজ করে ওঠে: আমি ফাঁসি কাঠে ঝুলছিনে। ঈশ্বরের দিব্যি আলেন, ফাঁস গলায় পড়াবার আগে আত্মহত্যা করব।

গুলি করে ভাল করিনি। কেনট নঅনুশোচনা করে।—যখন ধরেই ফেলল, তখন গুলি করা উচিত হয়নি।

বেসকে ওরা গুলি করেছে। বিড়বিড় করে বলি।

আরে বোকা, তুমি কি ভাবছ তুষার ও বরফের মধ্য দিয়ে পাঁচশো মাইল ও হেঁটে যেতে পারত? মোহকের মত অত দূরে হেঁটে যাবার মত মেয়ে সে নয়। কেন যে তাকে সঙ্গে আনলে তাই ভেবেই আমি অবাক হয়ে যাই।

দিনরাত কোন মেয়ের সঙ্গে কাটালে তার উপর একটা আসক্তি জন্মে। মেয়ে ছাড়া এমনি ভয়ানক ঠাণ্ডা রাত কাটান যায়?

সঙ্গিনী আমারও ছিল। কেনটন বলে।—কিন্তু সে বিবাহিতা স্ত্রী নয়। বরফের উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ চলব বলে মনস্থ করে কিছুতেই আমি মেয়ের বোঝা সঙ্গে নিতাম না।

থাক, এলেনকে একলা থাকতে দাও। চার্লি বলে ওঠে।—বেচারী অনেক দুঃখু পেয়েছে। মেয়েটিতো মারা গেছে, তাই না?

হাঁ, মারা গেছে।

তাহলে আলেনকে খানিকটা আনমনা হতে দাও।

কেনটনের উপর কোন বিদ্বেষ নেই আমার। শান্তভাবে বলি।—সঙ্গিনীর জন্যও কোন শোক করব না। সে তো আর আমার বিবাহিতা স্ত্রী নয়! তাছাড়া পুরুষের যোগ্যও সে নয়...। আর বলতে পারিনা। দুহাতে মুখ চেপে ধরি। আমি জানি, সেই গভীর থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্যে ওরা আমার ফোঁপানি শুনছে।

তারপর অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ করে থাকে। শান্ত্রী যেখানে পায়চারি করছে, সেদিক থেকে বরফের চুরমুর শব্দ কানে আসে। কয়েদখানার চালে বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দ। ওয়েলকিল নদীর দিক থেকে বাঘের ডাক শোনা যায়।

ছাউনি ফেলবার আগেকার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ব্রাণ্ডিওয়াইনে এক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে চার নম্বর নিউইয়র্ক রেজিমেণ্টের

তিনজন মারা যায়। তারপর থাকে নয়জন। এরপর মস ফুগার, এডওয়ার্ড ফ্লাগ আর ক্লার্ক ভ্যানডিয়ার মরে। থাকে ছয়জন। এইবার যাচ্ছে আলেন হেল, চার্লস গ্রীন আর কেনটন ব্রেন্নার। হেনরি লেনও মুমূর্ষু। ক্লার্ক মারা গেছে, কিন্তু মরবার সময় আমায় অভিশাপ দিয়ে গেছে। এডওয়ার্ডও পুড়ে যাচ্ছে আগুনের মত। ইহুদিটি সজ্ঞানে শান্তিতে মারা গেছে। সহসা তার উপর আমার হিংসে হয়। বেজায় রাগ হয়। ইহুদিটির বিছানার পাশে হাঁটু ভেঙে বসা জেকবের ছবি কল্পনা করবার চেষ্টা করি। বাকী থকে এলি—একমাত্র এলি। জোরে কঁকিয়ে উঠি।

চার্লি বলে, শান্ত হও আলেন। আমরা যা দেখেছি, এতটা দেখলে কোন মানুষের ভয় থাকে না।

কোন ভয় থাকে না। আমি পুনরাবৃত্তি করি।

কেনটন বলে, মরতে ভয় করি না, কিন্তু ফাঁসিতে মরতে ভয় হয়। জয় পাহাড়ে একটা লোকের ফাঁসি হয়। মাথা খারাপ হয়ে লোকটা তার লেফটন্যাণ্ট অফিসারকে খুন করে। এজন্য তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, পাহারা দেবার সময় দেখেছি, নেকড়েগুলো তার দেহের জন্য লাফালাফি করেছে!

চার্লি হেসে ওঠে।—আর এত জিনিসও তোমার চোখে পড়ে কেনটন।

ভগবান সাক্ষী, সত্যিই দেখেছি। দেখলাম চাঁদের আলোয় নেকড়ে গুলো লাফিয়ে অনেক উঁচুতে উঠছে।

থাক, আর বলবার দরকার নেই। আমি চেঁচিয়ে উঠি।—ইনিয়ে বিনিয়ে আর বলতে হবে না।

এর পরেকার নিস্তব্ধতা উত্তেজনা সৃষ্টি করে। আমি যে ভাবে চিন্তা করছি ওরাও যদি সেইভাবে চিন্তা করে, মানে আস্তানা ছেড়ে

আসবার পর প্রতিটি সিদ্ধান্তের কথা ভাবে, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় বলতে পারি। কেনটন ভাবছে, বেস না থাকলে আমরা অনেক দূর চলে যেতে পারতাম। বেসের মৃত্যুর পাপ যদি কেনটনের হয়তো তার মৃত্যুর পাপ আমার।

হঠাৎ আমার মনে হয় যে আজকের রাতে বেস যদি এখানে থাকত তো সে ভড়কাত না। কোন ভয় করত না। শুধু আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চাইত। তার মুখ প্রশান্ত থাকত এবং হাত দিলেই সে প্রশান্তি অনুভাব করতে পারতাম।

কেনটনকে বল্লাম, মরবার সময় বেস খুব যন্ত্রণা পেয়েছিল কি? তুমি তো তাকে পড়ে যেতে দেখেছিলে কেনটন। মুখে কোন যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল?

এখন আর কোন যন্ত্রণাই নেই। কেনটন বলে।

বুকে ব্যথা নিয়ে সে মরেছে, একথা যদি ভাবি তো আর কোনদিন মনে শান্তি পাবনা।

চার্লি বলে, আমার এক ভাই মারা গেছে। আমার বয়স তখন এগারো। বসন্তে মারা যায়। তাকে বলতে শুনেছি যে মরতে কোন যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। বারবার সে বলেছে একথা।

ফাঁসিতে মরা আলাদা জিনিস। বিমর্ষভাবে কেনটন বলে।

দরজার কাছে নড়াচড়ার শব্দ হয়। কবাট খুলে যায়। বাইরের পাতলা অন্ধকারে শাস্ত্রী এবং অপর একটি লোকের ছায়ামূর্তি দেখা যায়। একদৃষ্টে আমরা চেয়ে থাকি। অবাক হয়ে ভাবি, কে এল? তারপর বুঝতে পারি যে এলি এসেছে। আর কোন শঙ্কা থাকে না। আস্তানা ছেড়ে যাবার পর এমন শান্তি আর পাইনি। আমার পেশী-গুলো ঢিলে হয়ে পড়ে। অবশভাবে দুপাশে হাত ঝুলিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা মেজেতে উঠে বসি। চোখে জল আসে।

কেনটন জানত। মনে হয় সবাই জানতাম। কেনটন বলে, ভেতরে এসনা এলি। তার কণ্ঠস্বর অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে।

সামান্য একটু সময় থাকতে পার। শাস্ত্রী বলে।

ভেতরে ঢুকে এলি দরজার পাশে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে, আলেন আছে এখানে?

সবাই আছি এলি। কেনটন বলে।

আমি যেখানে বসে আছি সে জায়গাটা অন্ধকার। উঠে দাঁড়িয়ে এলির কাছে যাই। তার কাছাকাছি গিয়ে আমি তার মুখ দেখবার চেষ্টা করি। হাত বাড়িয়ে তার কোট ধরি। বলি, তোমায় দেখে ভারি খুশি হলাম এলি। আমাদের ঘৃণা করছ না তো?

ভেবেছিলাম তোমাদের ফিরিয়ে আনবে না। আস্তে আস্তে বলে সে।

তোমার হাতখানা দাও এলি! তুমি আমাদের উপর বিরূপ হবে না তো!

সে হাত বাড়িয়ে দেয় এবং দুই হাতে আমি তার হাত চেপে ধরি। দস্তানা-পরা হাতের স্পর্শ অনুভব করতে চাই।

এসে খুবই ভাল করেছ। চার্লি বলে।—বরফের মধ্য দিয়ে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়েছে। তবু এসে খুবই ভাল করেছ এলি!

ভাবলাম, কেমন আছ দেখে আসি। এটুকু হাঁটাতে আর কি এসে যায়।

কি করে জানলে?

ওরাই খবর দেয় যে তোমাদের ধরে এনেছে আর একজন গুলিতে মরেছে।

ওরা বেসকে গুলি করেছে।

মারা গেছে?

সেইখানেই মারা যায়। কি হবে সে জানত না। আমার হাতের মধ্যেই তার প্রাণ গেছে এলি।

বেচারী! যাক এখন ভালভাবে বিশ্রাম করতে পারবে।

কেনটন এতক্ষণ দূরে দূরে রয়েছে। এইবার সে পেছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। বলে, এলি, তুমি কি ঘৃণা নিয়ে এসেছ?

না।

যদি এসে থাক তো বলছি শোন। আমিই এর নেতা ছিলাম। আমিই আলেনকে পালাবার ফন্দি বলি। মেয়েটি বলে, আলেন যদি তাকে নিয়ে না যায় তো সে মরবে। আলেন তখন আমাকে কথা দিয়েছে। মেয়েটির মৃত্যুর পাপ আমারই এলি।

নিজেকে আর দগ্ধে মের না কেনটন। মেয়েটি এখন যে শান্তিতে আছে সে শান্তি বেচারী পেত না। মোলায়েমভাবে বলে এলি।

আমরা একজনকে গুলি করেছি এলি। ওরা হয়ত আমাদের ফাঁসি দেবে।

এলি জবাব করে না।

ওরা বলে, আমরা নাকি একজন লোক খুন করেছি। একঘেয়ে স্বরে কেনটন বলে যায়। তার গলায় কোন উত্তাপ বা আবেশ নেই। —একে হত্যা করা বলে না। আমরা মাঠ দিয়ে পালাচ্ছিলাম; তখন ম্যাকলেনের লোকজন আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। চার্লি আর আমি অপেক্ষা করছিলাম আলেন ও মেয়েটির জন্য। দেখলাম, গুলি খেয়ে পড়ে গেল মেয়েটি। তখন আমি ম্যাকলেনের একটা লোককে সাবাড় করি।

আমি জোর করে বলি, ও করেনি। কার গুলিতে মরেছে বলা যায় না।

আমার কথা যেন শোনেনি এই ভাবে কেনটন বলে যেতে থাকে,

জান এলি, বন্দুকের লক্ষ্য আমার অব্যর্থ। গোটা মোহকে কেউ আমায় হারাতে পারেনি। কেমন করে যে লক্ষ্য ভেদ করি তাতো তুমিও দেখেছ এলি। আমিই লোকটাকে গুলি করেছি। কথাটা মনে রেখ। হলপ করে বলছি!

মিথ্যে কথা বলছে। ফিসফিস করে বলে চার্লি।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে এলি। কোন কথা বলে না। আমি জানি, কি হচ্ছে তার মনের মধ্যে। বুঝছি কত শক্ত তার পক্ষে কথা বলা। আমাদের দিকে সে কয়েক পা এগিয়ে আসে। শেষ অবধি বলে, তোমাদের জন্য কয়েক টুকরো নুন দেওয়া মাংস এনেছি। কেনটন যে জন্তুটা শিকার করেছিল, এ তার মাংস। মনে আছে?

আছে। যন্ত্রচালিতের মত কেনটন বলে।

মাংসের টুকরো কটি এলি আমার হাতে দেয়। পলকের জন্য থমকে দাঁড়ায় আমার সামনে। যেন অন্ধকারে আমার চোখ দেখতে চায়। তার পর সে পেছন ফিরে বেরিয়ে যায়।

মাংসটুকু ভাগাভাগি করে আমরা আস্তে আস্তে খাই। কাঠের বেড়ায় ঠেস দিয়ে আবার বসে পড়ি তিনজনে।

চার্লি বলে, খুন করব বলে আমরা তাক করিনি কেনটন। তুমি তো কোমরের কাছে বন্দুক ধরেছিলে। কোমরে বন্দুক রেখে কেউ গুলি করে লক্ষ্য ভেদ করতে পারে না।

কেনটন জবাব করে না। আমি হাত বাড়িয়ে তার হাঁটুতে হাত রাখি। নীরবে সে আমার হাত চেপে ধরে।

—এগারো—

যে করেই হোক রাতটা কেটে যায়। যন্ত্রণা সইবার ক্ষমতার চাইতে একমাত্র বোধহয় বিস্মৃতির ক্ষমতাই মানুষের বেশী। পাত্রে খানিকটা জল ছিল, তাও জমে বরফ হয়ে গেছে। কয়েদখানা কাগজের মত পাতলা। ঠাণ্ডা মেজেয় শুয়ে কাটিয়েছি আমরা। গরম হবার জন্য গা ঘেঁষাঘেষি করে রয়েছি। ক্রমে ভোরের আলো দেখা দেয়। আমাদের অবস্থা তখন জীবন্মৃতের মত। মেজে ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করি কিন্তু সাধ্য নেই। সারা দেহ মরার মত শক্ত হয়ে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে কোনমতে দরজার কাছে এসে ধাক্কাধাক্কি শুরু করি। কেউ সাড়া দেয় না। খানিক বাদে নিজেরাই থেমে যাই। দৈহিক যন্ত্রণা সম্পর্কে কোন রকম অনুযোগ বা কাতরোক্তি না করে পড়ে থাকি।

চার্লি বলে, এমনিভাবে আর একটা রাত কাটাতে হলে আর ফাঁসির ভয় থাকবে না।

অবশেষে দরজা খুলে যায়। দেখি, দরজার সামনে প্রহরী আর এক অচেনা অফিসার। সে আমাদের উঠতে বলে।

শরীর কাঠ হয়ে গেছে। দুদিনে মাত্র এক টুকরো মাংস জুটেছে। চার হাত পায়ে কোন মতে দাঁড়ান গেল। গতকাল ভারনামের সঙ্গে যে ঘরে কথা হয়, সেই কাঠের বাড়ীতেই নিয়ে যায় আমাদের। কথা বলবার ক্ষমতা আমাদের নেই বললেই চলে। খানকয়েক চেয়ার আছে ঘরে। ধপ করে আমরা বসে পড়ি। আগুন জ্বলছে ঘরের মধ্যে। আগুনের এমনি উত্তাপ কোনদিন উপভোগ করিনি। তাতটা

বেশ নতুন এবং বিস্ময়কর লাগে। প্রথমে আগুনের কাছাকাছি যেতে ভয়-ভয় করে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই।

ফাঁসি দেওয়া পর্যন্তও টিকবে বলে মনে হচ্ছে না তো! অফিসার বলে। হা ভগবান, কি বিচ্ছিরি কাণ্ডই যে হচ্ছে! তারপর আমাদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, খাওয়া জুটেছে কত আগে?

সামান্য কিছু মাংস ছিল।

দাঁড়াও, খানিকটা ঝোল আনাচ্ছি।

ভুট্টা ও আলু দিয়ে স্টু বানান হয়েছে। কাঠের পাত্রে করে আমাদের দেওয়া হয়। তা-ই হাভাতের মত গব গব করে খেয়ে ফেলি।

অনেকদিন এমন খাবার মুখে যায়নি। চালি বলে।—এখানে তো বেশ খাবার বন্দোবস্ত দেখছি! খেয়ে শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়।

আগুনের পাশে ভীড় করে আমরা পা সেঁকে নিই। কোটের বোতামও খুলে ফেলি।

চমৎকার আগুন! এমন আগুন মেলা ভার। কেনটন বলে। তার অবস্থা এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন বলে মনে হয় না।

আজকেই হয়ত ফাঁসি দেবে, কি বল কেনটন?

ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে সে বিস্ময় প্রকাশ করে। চালি একদৃষ্টে আগুনের দিকে চেয়ে আছে। কবাট না খোলা অবধি এমনিভাবেই কথা না বলে বসে থাকি। তরুণ এক অফিসার ঘরে ঢোকে। এক রকম বালক বললেই হয়। মনে হয় চিনি-চিনি। কিন্তু মনটা ভোঁতা হয়ে গেছে বলে নামটা মনে আসে না। ভেতরে ঢুকে সে টেবিলের পাশে দাঁড়ায়। ভালভাবে লক্ষ্য করে আমাদের। অফিসারদের কেউ কেউ আমাদের মতই ময়লা ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে কাটায়।

কিন্তু এ লোকটির পরণে চোস্ত পোশাক: গায়ে নীল উর্দির গ্রেট কোট। কলার মিশমিশে কালো···গলায় রেশমী রুমাল···মাথায় কালো ঝুটিওলা টুপি···পরণে বাদামি চামড়ার ব্রিচেজ এবং পায়ে কালো উঁচু গোড়ালির বুট। তার হাতে একটা চাবুকের বাঁট। টেবিলের পর একখানা পা ভেঙ্গে দিয়ে সে চাবুকের বাঁট দিয়ে আস্তে আস্তে নিজের উরুতে বাড়ি মারছে।

বেশ একহারা চেহারার লম্বা লোকটি। চোখ দুটি গাঢ় কালো। চোখের পাতা নীচু করে চাওয়ার মধ্যে একটা বিশিষ্টতা আছে।

তোমরাই পেনসিলভানিয়ার লোক? সে জিজ্ঞাসা করে।

কেনটন ক্ষুদ্ধভাবে তার দিকে তাকায়। বেশ বুঝতে পারি, তরুণ কাপ্তেনটিকে তার মোটেই ভাল লাগেনি। আমারও বিশেষ কোন কৌতূহল নেই। জোর করে কোন কিছু না-ভাববার চেষ্টা করছি। চিন্তা-ভাবনার বালাই চুকিয়ে দিতে চাইছি। মন থেকে মুছে ফেলতে চাইছি জন্ন পাহাড়ের ফাঁসির মঞ্চের ছবি। চার্লি গ্রীন একটা সুর ভাজছে।

আবার সে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা এই তিনজনেই দল ছেড়ে ভাগছিলে?

কর্ণেল হ্যামিলটন নাকি? চার্লি জিজ্ঞাসা করে। অফিসারদের যেভাবে সে ঘৃণা করে, তা শুধু বোস্টনয়ালাদের পক্ষেই সম্ভব। কথা বলবার সময় সে মুচকি মুচকি হাসছে। কোন কিছু হারাবার ভয় তার নেই। এমন কি ভয় হারাবার ভয়ও না। কেনটন ও চার্লির ভয়লেশহীন ভাব দেখে আমার নিজের উপর ঘেন্না হয়। মনে হয় যত সব মানবীয় গুণ আমাকে তাদের সঙ্গে একত্রে গেঁথেছে, তার সব কিছুই তারা হারিয়ে বসে আছে। আমি যেন একলা পড়ে গেছি।

তেমনি কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়ে

ছেলেটি। এতক্ষণে ওয়াশিংটনের প্রিয়পাত্র আলেকজান্দার হ্যামিলটনকে চিনতে পারি। অন্য যে কোন অবস্থায় দেখা হলে হয়ত তাকে ঘৃণা করতাম না। কিন্তু আজকের এই অবস্থায় তার সাজপোশাকের পরিপাটি ও প্রসন্নভাব দেখে গা জ্বলে ওঠে। তার দামী কালো বুটের দিকে চেয়ে মনে পড়ে, মৃত মস ফুলারের পা থেকে কেমন করে আমরা জুতো খুলে নিয়েছি।

রিপোর্ট যদি সত্যি হয় তো তোমরা তিনজন চৌদ্দনম্বর পেনসিলভানিয়ার দলত্যাগী। হ্যামিলটন বলে।—হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে ভেগেছিলে এবং ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের দলের একজনকে খুন করেছ। হা ভগবান, তোমাদের দেখে পুরোদস্তুর নোংরা ভিখিরী বলে মনে হয়। আমি হলে তোমাদের ভেগে যেতে দিতাম। পল্টনে এমন লোক না রেখে জাহান্নামে পাঠাবার ব্যবস্থা করতাম।

আপনি নিজেই জাহান্নামে যেতে পারেন স্যর! চার্লি বলে।

এতেও তার উরুতে চাবুকের পিটুনি থামে না। যেমন চলছিল তেমনি ভাবেই চলতে থাকে। মনে হয় যেন গ্রীনের কথা সে শোনেনি। আমাদের মাথার উপরকার চিমনিটার দিকে এক দৃষ্টে তাকায় সে। বলে, আজ বিকেলে সামরিক আদালতে তোমাদের বিচার হবে। মহা গোলমাল বাঁধিয়েছ। জন্ম পাহাড়ের ফাঁসির মঞ্চে তোমাদের দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে।

বেশ তো! কেনটন বলে।...এখন বেরিয়ে যান।

হ্যামিলটন টেবিল থেকে সরে আসে। সরাসরি এগিয়ে যায় কেনটনের কাছে। মনে হয় এখুনি হয়ত কেনটনের মুখে সপাং করে বাড়ি পড়বে। কিন্তু না তো! ছেলেটির ধৈর্য আছে। ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে বলে, তোমাদের পক্ষ সমর্থন করতে হবে আমাকে।

চার্লি হেসে ওঠে। তার সেই হাসির তুলনায় কথা তুচ্ছ।

আমাদের পক্ষ সমর্থনের কোন দরকার নেই। কেনটন বলে।

কিন্তু আমার উপর আদেশ এসেছে।

চার্লি তখনও হাসছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে একটা জানালার কাছে সরে যাই। আস্তানার প্রাচীরের ওধারে শুয়েলকিলের পারে সার-বাঁধা গাছ অবধি বিস্তৃত বরফের ঢাকনি দেখতে পাচ্ছি। প্রভাতী রোদ তুষারের বুকে নানা রঙের তুলি বুলিয়েছে। মোলায়েম হলদে ও বেগনি ছোপের সঙ্গে মিলেছে বাদামি আমেজ আর মাঝে মাঝে দু একটু সবজে আভা। এ রঙের খেলা জীবন ও বসন্তের প্রতীক। ইহুদিটির মরবার আগেকার কথাগুলো মনে পড়ে। বসন্ত যেন এক জাগরণের মত। ধরণীর বুকে ভগবানের কল্যাণ-স্পর্শ। তার প্রসারিত হাতের আদর যেন ফুটে ওঠে বসন্তের রূপ-রসে। মাটি সরস ও নরম হয়ে যায়। মানুষ মরেও অনায়াসে ধরণীর কোলে শুয়ে থাকতে পারে।

ফিরে দেখি, হ্যামিলটন পাইপ ধরাচ্ছে। লম্বা নলের ওলন্দাজ মাটির পাইপ। আলবেনিতে দোকানের সামনে বসে শহুরে লোকে এমনি পাইপ টানে। উত্তরে যে কোন গ্রাম্য শুঁড়িখানার দেয়ালে এমনি পাইপ টাঙান থাকে। আগুন থেকে একখানা জ্বলন্ত আঙার তুলবার জন্ত সে নীচু হয় এবং তারপর জোরসে টান মেরে চালের দিকে নীলচে তামাকের ধোঁয়া ছাড়ে।

আমার চোখে মুখে ধোঁয়া লাগে। মনটা আইঢাই করে ওঠে তামাক টানবার জন্ত। বহু সপ্তাহ তামাক খেতে পাইনি। তামাকের গন্ধও মুখে যায়নি অনেকদিন।

সে আমার দিকে তাকায়। আবার তার মুখে রহস্তময় হাসি ফুটে বেরোয়। ঝোঁকের মাথায় সে আমার দিকে পাইপটি বাড়িয়ে দেয়। আমি হাত বাড়াই। চার্লি ও কেনটন আমার দিকে চেয়ে আছে। আগে যা-ই ভাবুক না কেন, এখন আমার মনোভাব তাদের কাছে

ধরা পড়ে যায়। আমি পাইপটি নিয়ে নিই। তারপর দু এক পা এগিয়ে কেনটনের দিকে বাড়িয়ে ধরি। সে নড়ে না।

চার্লি ফিসফিস করে বলে, হা খ্রীস্ট! জোরে ঘরঘরে ভাঙা গলায় বলে ওঠে। পাইপটা নিয়ে সে টানতে শুরু করে। এক দৃষ্টে ধোঁয়া লক্ষ্য করতে থাকে চার্লি। তারপর সহসা ধোঁয়ার মধ্যে হাত দিয়ে শিশুর মত ফিক করে হেসে ওঠে। আবার সে পাইপটা আমাকে ঘুরিয়ে দেয়।

আস্তে আস্তে আমি টানতে শুরু করি। মাত্র দু'একটা টান দিতেই কেনটন ইশারা করে। পাইপটা তার হাতে দিই। সে দু'একটা টান মারে। তারপর আচমকা পাইপটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মেজেয় পড়ে মাটির পাইপটি টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

হ্যামিলটন তখনও আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে। কেনটন দুহাতে মুখ চেপে ধরে। গ্রীন পায়চারি শুরু করে। আমি হ্যামিলটনকে বলি, আজকেই আমাদের ফাঁসি দেবে?

ঘাড় ঝাঁকানি দেয় হ্যামিলটন।

কোন করুণা আমরা চাই না। কেনটন চেঁচিয়ে ওঠে।—হা ভগবান! ভাল ঘরে থাকেন, ভাল ভাল জিনিস খান...কতটা খোঁজ জানেন আপনারা?

হ্যামিলটন আস্তে আস্তে বলে, আজ সকালে মাত্র দু' টুকরো শুকনো রুটি খেয়েছি। কালকে সামান্য একটু মাংস জুটেছে। জেনারেলের ডিনারেও এ-ই জুটেছে। তিনি জোর করে আমায় খাইয়েছেন।

চার্লি হেসে ওঠে।

বিশ্বাস হল না তো!

কেনটন বলে ওঠে, কেন ফাঁসি দিচ্ছেন না? ফাঁসি দিয়ে সব চুকিয়ে দিলেই তো পারেন!

নিশ্চয় ফাঁসি দেবে। হ্যামিলটন বলে।—ভাল করেই ঝোলাবে তোমাদের।

টেবিলের কাছে গিয়ে আবার সে পা ভেঙে দাঁড়ায় এবং আমাদের লক্ষ্য করতে থাকে। আমি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে বিচ্ছিরি ভাবে উঠে দাঁড়ায় কেনটন এবং খানিকটা এগিয়ে ভাঙা পাইপটা লক্ষ্য করতে থাকে।

হ্যামিলটন বলে, কি হয়েছিল বল তো!

আমরা ভেগে গিয়েছিলাম। আমি বলি।—মোহকের লোক আমরা। ভেবেছিলাম হেঁটে হেঁটে ভ্যালি অঞ্চলে চলে যাব।

সে আমার কেনটন ও চার্লির দিকে তাকায়। মানুষের পক্ষে যতটা শীর্ণ হয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব, তা আমরা হয়েছি। আমাদের অস্থিসার চেহারা, খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা মুখ, ছেঁড়া জামা-কাপড় এবং খালি পায়ের দিকে তাকায় সে। চোখ নামিয়ে আমাদের পা দেখতে থাকে।

তাহলে অতটা পথ যাবে বলেই বেরিয়েছিলে?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিই। দু'চার পা এগিয়ে বসে পড়ি। তার দৃষ্টি থেকে পা দুটো লুকোতে চাই।

সঙ্গে নিশ্চয়ি কোন খাবার ছিল না! ছিল?

না-খাওয়া তো গা-সওয়া হয়ে গেছে।

আর কেউ ছিল? না শুধু তোমরা তিনজনেই ছিলে?

একটি মেয়েও ছিল। ম্যাকলেনের লোকজন তাকে গুলি করে মেরেছে।

একটি মেয়ে! চাপা গলায় বলে সে।—এটা বাহাদুর ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে একটা নজীর বটে। মনে রাখবার মত যুক্তি। আচ্ছা, এই মেয়েটি কে? তোমাদের কারও স্ত্রী?

স্ত্রী হবার যোগ্য সে নয়। আমি বলি।—সে একজন শিবির-সঙ্গিনী।

কার সঙ্গিনী? হ্যামিলটন জিজ্ঞাসা করে।

আমার।

তৎক্ষণাৎ সে মারা যায়?

আমারই কোলে।

কেনটন চেঁচিয়ে ওঠে, ওর মুখ দেখেও বুঝতে পারছেন না? আমাদের একলা থাকতে দিন।

ম্যাকলেনের এক সঙ্গীকে তোমরা হত্যা করেছ। কেনটনের কথা গ্রাহ্য না করে হ্যামিলটন বলে।—কারা আগে গুলি করে? তোমরা না তারা?

ওরা মেয়েটিকে খুন করবার পর আমরা গুলি করেছি।

কে মেরেছ?

আমি। কেনটন বলে।

চার্লি বাধা দেয়। বলে, তাক না করে আমাদের দিক থেকে গুলি ছোড়া হয়। কার গুলিতে মরেছে জানি না।

একদৃষ্টে কেনটনের দিকে তাকায় হ্যামিলটন। আবার তাকে অপরিণত বালকের মত দেখায়। তার মুখের হাসি লুকিয়ে যায়। কেনটনের কাছে গিয়ে সে হাত বাড়িয়ে দেয়, আমার হাতে হাত দেবে?

কেনটন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নড়ে না। হ্যামিলটন তখন বেরিয়ে যায়।

—বারো—

অপেক্ষা করছি আমরা। জানিনা কিসের জন্য। প্রাণহীন দৃষ্টিতে আমরা পরস্পরের দিকে তাকাই। আগুনের পাশে বসে থাকি কিন্তু কথা বলিনা। মনে হয় যেন ফুরিয়ে গেছি—আমাদের কথাও ফুরিয়েছে।

কেনেডি ভেতরে ঢোকে। তার পেছনে দরজার ফাঁক দিয়ে জন আষ্টেক পাহারাওলা দেখা যায়। কেনেডির হাতে বগলস ঝুলান লম্বা একটা চামড়ার রাশ। সে আমাদের দিকে তাকায় না। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে চেয়ে থাকে

বলে, উঠে দাঁড়াও।

আমাদের কাছে এসে সে বগলস দিয়ে গলায় গলায় বেঁধে দেয়। আমার কাছে আসতেই আমি সরে যাই। চেঁচিয়ে বলি, আমাদের কি জানোয়ারের মত বাঁধবে নাকি?

আমার আদেশ···

হা খ্রীস্ট! না, জানোয়ারের মত কিছুতেই বগলস পরাতে দেব না। তার চাইতে তরোয়াল দিয়ে এক কোপে খতম করে দাওনা কেন! সেও বরং ভাল। নচ্ছার হতচ্ছাড়া শূয়োর কোথাকার! এর চাইতে তরোয়াল দিয়ে সাবাড় করে দিলেই তো চুকে যায়!

কেনটন আমার হাত চেপে ধরে। বলে, আর ঝামেলা কর না আলেন। দোহাই!

আমি দুঃখিত। কেনেডি বলে।

আমি হাত দিয়ে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করি। বাইরে গা কামড়ান শীত কিন্তু আবহাওয়া পরিষ্কার। ঠাণ্ডা রোদে জমাট বরফ ঝিকমিক

করছে। প্রহরীরা অস্বস্তিভরে চলছে। শীত ভেঙে গা গরম করবার চেষ্টা করছে। তাদের ঠিক পেছনে দুটি ড্রাম বাজিয়ে। আমরা বাইরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডিতের জন্য তারা বাজাতে শুরু করে।

সঙিন উঁচিয়ে প্রহরীরা আমাদের পেছু পেছু হাঁটে। মানুষ বলে এদের পরিচয় দেওয়া যায় না। এরাও আমাদের মত জন আটেক ভিখারীর একটি দল। মরচেপরা কিরিচগুলো দুমড়ান। ড্রাম বাজিয়েরা বাজাতে বাজাতে আগে আগে চলে। একবার চালি পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হুমড়ি খেয়ে পড়ি। চামড়ার ব্যাণ্ডে গলা ছড়ে যায়। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

প্রহরীরা আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। তাদের একজন পাকা দাড়িওলা বৃদ্ধ। সে বলে, আস্তে সুস্থে চল ছেলে। সময় আছে।

কেনেডি আগে আগে যাচ্ছে। ভুলেও সে পেছনে তাকায়নি। এমনকি আমরা পড়ে গেলেও না। মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে হাঁটছে সে। রাইফেলখানার পাশ দিয়ে যাবার বেলা প্রহরীরা একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু তাদের চাহনিতে বিশেষ কোন কৌতূহল ধরা পড়ে না।

পরিখার আস্তানার পাশ দিয়ে যাবার বেলা কিছু কিছু সৈনিক আমাদের দেখতে বেরিয়ে আসে। কে যেন ডেকে বলে, আজকে ভাল খাবার জুটবে হে!

হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাথুরে বাড়ীটির সামনে এসে পড়ি। ওয়াশিংটনের দপ্তর এই বাড়ীতে। চমৎকার লম্বা দোতলা বাড়ী। পাশে টানা একটা আস্তাবল। ঘুরে আমরা সদরে যাই। দরজার সামনে এসে প্রহরীরা থেমে দাঁড়ায়। ড্রাম বাজিয়েরা জোরসে এক পক্কর বাজিয়ে কাঠি দিয়ে কুর কুর শব্দ করতে করতে থেমে যায়। তখন কেনেডি আমাদের ভেতরে নিয়ে যায়।

বাড়ীর মধ্য দিয়ে হাঁটিয়ে সে আমাদের দোতলার ডানপাশের পেছনের ঘরে নিয়ে আসে। ভেতরে আগুনের কাছাকাছি মস্তবড় একখানা গোল টেবিলের চারপাশে ছয়জন অফিসার বসে আছেন। জানালার কাছে একখানা ক্যাম্প টেবিলের পাশে বসে হ্যামিলটন লিখে যাচ্ছেন। আমরা ভেতরে ঢুকতেই মুখ তুলে তিনি আমাদের স্বাগত জানান। আর একটি অফিসার মস্ত একটা ঘড়ির পাশে দাঁড়ান। দরজার পাশে আমাদের জন্য চেয়ার পাতা আছে। কেনেডি ইশারা করে আমাদের বসতে বলে। বিচ্ছিরিভাবে আমরা বসে পড়ি। গলার ব্যাণ্ডটা তিনজনকেই টানছে।

অফিসারদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়ান। এখনি ওয়েনকে চিনতে পারি। তিনি বলেন, আমার লোকজনকে একসঙ্গে বাঁধা হয়েছে কেন?

কর্ণেল ভারনামের আদেশ স্যর। কেনেডি জবাব দেয়।

চুলোয় যাক ভারনাম, সে আদেশ দেবার কে? এরা পেনসিল-ভানিয়ার লোক। তোমার ওই ভারনামকে বল, তিনি যেন আমার লোকজনের ব্যাপারে থাঁদা নাক গলাতে না আসেন।

কিন্তু এ নিয়ম। টেবিলে বসা একজন লোক বাধা দিয়ে বলে ওঠেন।

চুলোয় যাক নিয়ম। খুলে দাও।

আমাদের বাঁধন খুলে দিয়ে কেনেডি বেরিয়ে যায়। আমি হ্যামিলটনের দিকে তাকাই। আঁটসাট কেটে পরে জানালার পাশে বসে আছেন তিনি—হাসছেন। ওয়েন একদৃষ্টে টেবিলের দিকে চেয়ে আছেন। আমি তখন সেনানীদের দিকে তাকাই। কয়েকজনকে চিনি। গ্রীন, লর্ড স্টার্লিং, কর্ণেল কনওয়ে এবং জেনারেল স্কটকে চিনতে পারি। মাঝখানে একখানা খালি চেয়ার আছে। মনে হয় এরা আর একজনের জন্য অপেক্ষা করছেন। আঙুল দিয়ে টেবিলের পর টুকটাক শব্দ করছে

সকলে! ওয়েন হাতের কাগজখানা নাড়াচাড়া করছেন। এদের কেউ আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন না।

আগুন থাকলেও ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। ঘড়ির একঘেয়ে টিকটিকানি মিশে যাচ্ছে আগুনের সাঁইসাঁই শব্দের সঙ্গে। কান পেতে কিছুক্ষণ আমি ঘড়িটার টিক টিক শব্দ শুনি। তারপর অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। দেড়টা বাজে। ঘড়িটা দেখে ভারি কৌতূহল হয়। সময়ের হিসেব বহুদিন লোপ পেয়েছে। ঘড়ির মুখে সময়ের গতি লক্ষ্য করবার সুযোগ বহুদিন হয়নি। কেমন ছোট্ট ছোট্ট অস্থির ঝাঁকানি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে! আবার আমার সময় জ্ঞান ফিরে আসে। একমনে কাঁটার নড়া লক্ষ্য করবার চেষ্টা করি।

নীহারকণামাখা জানালার বাইরে ছেঁড়া জামাকাপড়পরা একটি শাস্ত্রী পায়চারি করছে। টিকটিক করে ঘড়িটা আধঘণ্টা এগিয়ে যায়।

আমি তখন চার্লি ও কেনটনের মুখের দিকে তাকাই। নাক বরাবর চেয়ে আছে তারা। কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে আসবার পর তাদের কারও মুখে রা-টি শোনা যায়নি। কেমন একটা ছেলেমানুষি খেয়াল আমায় পেয়ে বসে। ঘড়িটা, চকচকে টেবিলখানা আর অফিসারদের গলার লেসের টুকরো দেখে মশগুল হয়ে যাই। সহসা ঘরের এক কোণে সেনানীদের টুপি রাখার তাকের দিকে চোখ পড়ে। পালক লাগান টুপিতে গোটা তাক ভরতি। একটা টুপির একখানা পালক আলগা। অবাক হয়ে ভাবি, কার টুপি এটা?

দস্তার ঘড়ায় এক ঘড়া জল এবং গোটাকয়েক দস্তার কাপ নিয়ে আরদালি ঘরে ঢোকে। সবাই তার দিকে তাকায়। টেবিলের পর সেগুলো রেখে সেলাম করে সে বেরিয়ে যায়।

ঘড়িতে আরও পনেরো মিনিট চলে যাবার পর ওয়াশিংটন ঘরে ঢোকেন। লম্বা ঢিলে একটা নীল ক্লোক পরে টুপি হাতে নিয়ে ঢোকেন

তিনি। সেনানীরা উঠে দাঁড়ান। তিনি ইঙ্গিতে তাদের বসতে বলেন। কোণের তাকের কাছে গিয়ে তিনি টুপিটা রেখে দেন। তারপর ক্লোকের কলার খুলতে থাকেন। হ্যামিলটন তাঁর পাশেই আছেন। তিনি তাঁকে ক্লোক খুলতে সাহায্য করেন। জেনারেল মুচকি হাসেন। হ্যামিলটন তখন তাঁর কানে কানে কি যেন বলেন। মাথা নেড়ে সায় দেন জেনারেল। তারপর টেবিলে এসে বসেন।

ওয়াশিংটনের উপস্থিতিতে ঘরখানা গমগম করতে থাকে। বেশ লম্বা চওড়া লোকটি। মস্ত বড় মুখ। প্যারেডের মাঠে বক্তৃতা করবার সময় তাঁকে শেষবার যেমন দেখেছি তার চাইতে অনেক বুড়িয়ে গেছেন। মুখ ভেঙে গেছে।

তিনি টেবিলে বসবার পর হ্যামিলটন তাঁর সামনে এক তাড়া কাগজ দেন। আঙুল দিয়ে সেগুলো নাড়াচাড়া করে ওয়াশিংটন চশমা বার করেন এবং আস্তে মুছে চোখে লাগান। খানিকটা পড়ে তিনি আমাদের দিকে তাকান।

জেনারেল গ্রীন বলেন, জায়গাটা বেজায় ঠাণ্ডা স্যর! আমরা যদি কাজটা চটপট……

ঠাণ্ডার কথা আমারও মনে আছে জেনারেল। সংক্ষেপে বলেন তিনি।

একদৃষ্টে তিনি আমাদের দিকে চেয়ে থাকেন। তিনি ঘরে ঢুকতেই আমরা দাঁড়িয়েছি। তখনও দাঁড়িয়ে আছি। বেশ ভাল করে তিনি আমাদের লক্ষ্য করেন। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকেন আমাদের পায়ের দিকে। যখন তিনি কথা বলেন, গলাটা ভারি চাপা লাগে। নীচু গলায় তিনি বলেন, দলত্যাগ এবং খুনের অভিযোগে ঊর্ধ্বতন অফিসারদের সামরিক আদালতের সমক্ষে তোমাদের হাজির করা হয়েছে। যদি দোষী সাব্যস্ত হও, সমবেত সৈনিকদের সামনে প্রকাশ্যে

তোমাদের ফাঁসি দেওয়া হবে। আশা করি অভিযোগ এবং যে দণ্ড তোমাদের দেওয়া হতে পারে তার গুরুত্ব তোমরা উপলব্ধি করবে।

আমরা ঘাড় নাড়ি।

তখন ঘড়ির পাশে দাঁড়ান সেনানীটির দিকে ফিরে বলেন, আপনার অভিযোগ পড়ে শোনান কর্ণেল মার্কার।

লম্বা দাড়িওলা লোক মার্কার। ছোট চোখ দুটি কটা। টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে তিনি পড়তে শুরু করেন :

চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়া রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন জন মুলার অভিযোগ করেছেন যে সতেরো শো আটাত্তর সালের ষোলেই ফেব্রুয়ারী রাত্রে তার ব্রিগেডের তিনজন লোক দলত্যাগ করে। সে তিনজনের নাম যথা ক্রমে : চার্লস গ্রীন, বেনটন ব্রেন্নার এবং আলান হেল। তারা যে স্বেচ্ছায় দলত্যাগ করেছে তাও এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন রূপ সংবাদ না দিয়া এরা ছাউনির চোহদ্দি পার হয়ে যায় এবং নিজেদের সঙ্গে যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি, কিরিচ এবং মাস্কেট নিয়ে যায়। তাছাড়া এদের উর্দিপরা ছিল...

কেনটন হেসে ওঠে। জোরে খেড়ে গলায় হেসে ওঠে সে এবং সামনে পেছনে দুলতে থাকে। আমি তার হাত চেপে ধরি।

ওয়েন উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে কটমট করে তাকান। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে জেনারেলও আমাদের দিকে চেয়ে থাকেন।

হ্যামিলটন উঠে টেবিলের কাছে যান। বলে, ইওর একসেলেনসি, আমার প্রার্থনা, ব্যাপারটা আপনি উপেক্ষা করবেন। বেচারীরা আধা উপোসী ;

তাছাড়া নিশ্চয়ি উর্দিপরা নয়।

পেটভরে খাওয়া আমাদের কারও জোটে না। ওয়াশিংটন বলেন।

আদালত ওদের ক্ষমা করবেন কি ?

ঘা বারো চাবুক মারলেই হাসি বেরিয়ে যাবে। কনওয়ে বলেন।

না হয় ফাঁসির দড়ি। লর্ড স্টার্লিং পাদপূরণ করেন।

জেনারেল ঘাড় নাড়েন। তারপর মার্কারকে বলেন, পড়ে যান।

এরা যে দলত্যাগী একথা এরা যথাক্রমে ক্যাপ্টেন কেনেডি এবং কর্নেল ভারনামের কাছে স্বীকার করেছে।

ওয়াশিংটন হ্যামিলটনকে বলেন, আপনার কিছু বলবার আছে মিঃ হ্যামিলটন?

না।

আপনি যদি চান তো যে ক'জন অফিসারের নাম উল্লেখ করেছি তাদের হাজির করতে পারি। কর্নেল মার্কার বলেন।—আমার হেপাজতেই আছে।

দরকার হবে না। আপনি কোন সাক্ষী ডাকতে চান মিঃ হ্যামিলটন?

হ্যামিলটন মাথা নাড়ান।

তখন আমাদের বলেন, তোমরা এই অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার কর?

যেমন ভাবে ছিলাম সেই ভাবেই আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। কোন কিছু বলবার মত আগ্রহ নেই।

আদালতের প্রশ্নের জবাব বন্দীদের দিতে হবে।

কেনটন তখন কর্কশ গলায় বলে, মাস্কেট আমাদের নিজেদের। আমারটা আমার বাবার, আর আলেনেরটাও তার বাবা দিয়েছেন। উর্দি আমাদের ছিল না। গা ঢাকবার মত জামা-কাপড় বা পয়সাও ছিল না আমাদের কাছে। কোন দিক থেকেই আমরা অন্যায় করিনি। যুদ্ধ বিগ্রহও ছিলনা; তাই ভ্যালি অঞ্চলের কথা মনে পড়ে। সহসা তার কণ্ঠস্বর আটকে যায়।

চার্লি বলে, এঁদের অসম্মান করবার অভিপ্রায় ওর নেই মিঃ হ্যামিলটন !

ওয়েন ঠাণ্ডা মেজাজে বলেন, তোমাদের উকিলকে কর্নেল হ্যামিলটন বলে ডাকবে।

আবার আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। কারও মুখে কথা নেই। নিজেদের কেমন অসহায় মনে হয়। অস্বস্তিভরে পা নাড়া-চাড়া করতে থাকি। বার বার পায়ে জড়ান নোংরা নেকড়াকানির দিকে তাকাই।

ওয়াশিংটন বলেন, এদের সমর্থনে আপনার কিছু বলবার আছে মিঃ ওয়েন ? ওরা আপনার অধীন।

কিছুই না।

তখন হ্যামিলটন বলেন, মাননীয়গণ, আমার অনুরোধ যে আদালত যেন এদের মার্জনা করেন।

ওয়াশিংটন তখন পালকের কলম দিয়ে টেবিলের পর ঠুক ঠুক শব্দ করতে থাকেন। গ্রীন তার কানে কানে কি যেন বলেন। তখন তিনি চাপা গলায় ওয়েনকে দুচারটে কথা বলেন। ওয়েন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান। অবশেষে ওয়াশিংটন বলেন, অস্ত্র নিয়ে দলত্যাগ করবার অভিযোগে আদলত তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করেছে। মিঃ হ্যামিলটনের অনুরোধের সম্মানার্থে শত্রুর কথা বিবেচনা করে আদালত দলত্যাগের অভিযোগ প্রত্যাহার করছে। আদালত তোমাদের প্রত্যেককে বিশ ঘা চাবুক মারার দণ্ডে দণ্ডিত করছে এবং পেনসিল্‌ভানিয়ার সৈনিকদের সামনে তোমাদের এই শাস্তি দেওয়া হবে।

হ্যামিলটন কয়েক পা এগিয়ে এসে বলেন, আপনার এই অনুকম্পার জন্ম ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যর !

আমরা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকি। এতক্ষণ এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে

থাকবার জন্য পা দুটো টনটন করতে থাকে। কেনটন ও চার্লির মুখের দিকে তাকাই। মনে হয় তাদের দুজনের মুখেই মুখোস পড়ান। আমার মুখের ভাব কেমন হয়েছে তাই ভেবে অবাক হই। হাত দিয়ে তখন নিজের দাড়ি ধরি। আবার তাকাই কেনটনের দিকে। সে তখনও ধৈর্য হারায়নি। তার হলদে দাড়ি থুতনি থেকে অনেকটা নীচে নেমেছে— গোঁফটা ঝুলে পড়ছে। মনে মনে বলি, মাত্র পঁচিশ বছর তো বয়স! কিন্তু তার বয়সের যেন গাছপাথর নেই। বেশ বুড়ো বলেই মনে হয়। চোখের চারপাশে ছোট ছোট রেখার আঁচড় ভীড় করেছে।

তবু আমরা অপেক্ষা করি। প্রথম দণ্ডাদেশের অর্থ ঠিক মালুম হয় না। মনের মধ্যে কেমন আশার সঞ্চার হয়। চাবুকের ভয় করি না। যা যন্ত্রণা ভুগছি তাতে আর ব্যথার ভয় থাকে না। কিন্তু যখন জয় পাহাড়ে ফাঁসির মঞ্চের কথা ভাবি, মনে পড়ে আমাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য বাঘের লাফালাফির কথা, গা-টা কেমন ছমছম করে ওঠে। আজকে এখানে দাঁড়িয়ে জীবনের জন্য যত মায়া হচ্ছে এত মমতা কোনদিন অনুভব করিনি। এমন করে কোন দিন বাঁচতে চাইনি।

ওরা তখন নিজেদের মধ্যে জোর আলোচনা করছেন। সশব্দে চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে ওয়েন উঠে দাঁড়ান। কর্নেল কনওয়ে টেবিলের বিপরীত দিকে তার মুখোমুখি দাঁড়ান।

আমার লোকজনের পর কোন কলঙ্ক আরোপ করার চেষ্টা আমি বরদাস্ত করব না স্যর! ওয়েন বলেন।

সে উদ্দেশ্যও আমার নয়!

ওয়াশিংটন শান্ত ভাবে বলেন, ভদ্রমহোদয়গণ! আমরা এই লোক কটিকে প্রাণদণ্ডের অভিযোগে বিচার করছি। মার্কারকে বলেন, পড়ে যান!

মার্কার পড়ে যান : এক নম্বর মহাদেশীয় হালকা অশ্বারোহীদের ক্যাপ্টেন আলেন ম্যাকলেন অভিযোগ করছেন যে সতেরোশো আটাত্তর সালের সতেরোই ফেব্রুয়ারি সকালবেলা তার দল হানাদারী অভিযান থেকে ফিরবার পথে তিনজন দলত্যাগীকে বাধা দেয়। পরে এরা চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়ার লোক বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। তাদের নাম যথাক্রমে আলেন হেল, কেনটন ব্রেন্নার এবং চার্লি গ্রীন। লোক তিনটি অস্ত্র-সজ্জিত এবং উর্দি-পরা ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বারবার থামবার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও এরা সে আদেশ অগ্রাহ্য করে এবং গ্রেফতার করবার মুখে গুলি করে ডেভিড সিলি নামে ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের একজন অনুচরকে হত্যা করে। শুয়েলকিল থেকে দেড় মাইল উপরে কিং অফ প্রুশিয়া রোডের উপর এদের গ্রেফতার করা হয়। এদের সঙ্গে আর একজনও ছিল। সে স্ত্রীলোক। হালকা অশ্বারোহীদের গুলিতে সে মারা যায়।

পড়া শেষ করে কাগজপত্র তিনি টেবিলের পর রাখেন। অফিসাররা হাত ঘুরিয়ে দেখতে থাকেন। ওয়াশিংটন কাগজপত্রের দিকে নজর দেন নি। তিনি চেয়ে থাকেন আমাদের দিকে। বলেন, মিঃ হ্যামিলটন, আপনি এর কোন অভিযোগ অস্বীকার করতে চান ?

হ্যামিলটন বলেন, ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনকে আমি জেরা করতে চাই স্যর। সেদিন সকাল বেলা ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের সঙ্গে যারা ছিল তাদের মধ্যে জন দুয়েককেও আমি আদালতে ডাকতে চাই।

শেষেরটার দরকার হবে না। কর্নেল মার্কার, ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনকে ভেতরে ডাকুন!

তখন হ্যামিলটন বলেন, স্যর, ন্যায়বিচারের দিক থেকে আমি অনুরোধ করছি যে ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের সঙ্গে তার আরও দুজন অনুচরকে সাক্ষ্য দেবার জন্য আদালতে ডাকান হক।

আদালত আপনার অনুরোধ মেনে নিতে পারে না। ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের কথাই যথেষ্ট।

এ আমার দাবী স্যর। ম্যাকলেন সংস্কারাচ্ছন্ন। অশ্বারোহীদের যে কেউ পদাতিকদের বিরোধী।

আপনি নিজের কথা ভুলে যাচ্ছেন মিঃ হ্যামিলটন।

আমি মার্জনা চাইছি। আদালত এদের বক্তব্য জিজ্ঞাসা না করা অবধি লোক কটি বসতে পারে কি?

পারে।

আদালতকে ধন্যবাদ।

সকৃতজ্ঞভাবে আমরা চেয়ারে বসে পড়ি। নিজেদের পায়ের দিকে তাকাই। তারপর চেয়ে থাকি জানালার দিকে। বোবা জন্তুর মত চেয়ারে বসে আমরা জানালার দিকে চেয়ে থাকি।

সমস্ত ব্যাপারটার উপর আমার বেদম রাগ হয়। রাগ হয় বিচারের উপর, অভিযোগ পড়বার প্রহসনের উপর; আর রাগ হয় টেবিলের পাশে বসা সাজ-পোশাকপরা গরমে মৌতাতে সুখী অফিসারদের উপর। তারা কে? কি সম্পর্ক আছে আমাদের সঙ্গে? রুগ্ন জন্তুর মত সপ্তাহের পর সপ্তাহ যখন আমরা পরিখায় পড়ে রয়েছি, কে খোঁজ করেছে তখন? কি করে এরা আমাদের বিচার করবার···খুনী ও চোরের মত ফাঁসি দেবার অধিকার পেতে পারে? জানি, আমাদের ফাঁসি দেবে। সে বিষয়ে কোন সংশয় আমার নেই। শুধু সেই ব্যাপারটাকে টেনে বাড়াবার জন্য···ন্যায়বিচারের নামে এটাকে নিয়ে খেলা করবার জন্ত আর দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে এসব করা হচ্ছে।

আমরা অস্ত্র নিয়ে পালিয়েছি। কিন্তু কার অস্ত্র? উর্দি পরে ভাগতে চেয়েছি আমরা! কেনটনের উর্দির দিকে তাকাই। কম্বল কেটে তার কোট তৈরী করা হয়েছে। মাঝে মাঝে দু'এক টুকরো

কাপড়ের তালি লাগানো। নীচের দিকটা সব ছিঁড়ে গেছে। ব্রিচেজের ফুটো দিয়ে তার হাঁটুর নীলচে চামড়া দেখা যায়। এক টুকরো কম্বল দিয়ে সে দস্তানা বানিয়েছে। তার গলায় আমাদের সাবেক রেজিমেণ্টের ঝাণ্ডার একটা টুকরো জড়ানো। তবু আমরা উর্দি পরে পালাবার চেষ্টা করেছি!

ম্যাকলেন ভেতরে ঢোকে। বাহাদুর ক্যাপ্টেনের কোনদিন খাবারের অভাব হয়নি। কোয়েকার চাষীরা ফিলাডেলফিয়ার বাজারে যখন খাদ্য নিয়ে যায়, তার লোকজন ব্রিটিশদের সেই খাদ্যের ট্রেন লুঠ করে। তারা শুধু ভালই খায় না—সবাইর আগেও খায়। গটমট করে ঘরে ঢুকে সে সেলাম করে। বুকের উপর লাল পট্টি লাগান ফেল্টের বাদামী শিকারের কোট তার গায়ে। পরণে হরিণীর চামড়ার ব্রিচেজ। পায়ে পালিশকরা উঁচু গোড়ালির জ্যাকবুট আর মাথায় ছাগলের চামড়ার পালক-লাগানো কটা টুপি।

ম্যাকলেনের কোমরে পাশঅস্ত্র আছে। একখানা তরোয়াল আর একটা পিস্তল। টেবিল অবধি এগিয়ে গিয়ে সেলাম করে সে এটেনশনে দাঁড়ায়। হ্যামিলটন তখন জানালার পাশের চেয়ারে বসে পড়েছেন। জানালার উপর কনুই রেখে অলসভাবে কাঁচেলাগা নীহারকণা ঘষছেন। কাঁচের ফাঁক দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমি চেয়ে থাকি: একটি শান্ত্রী পায়চারি করছে। বরফের ঢিবির মধ্যে একটি পাহারার ঘাঁটির বেড়া চোখে পড়ছে। দুটি মেয়ে হেঁটে চলেছে পথ দিয়ে। হ্যামিলটন তখন আমাদের দিকে ফিরে হাসেন। তার হাসি অভয় দেয়। মেয়েদের মত ফিনফিনে চেহারা হ্যামিলটনের। কিন্তু লোকে বলে তিনি নাকি অকুতোভয়। ম্যাকলেনকে তিনি দেখতে পারেন না। এই হাসি তাই ম্যাকলেনের প্রতি ঘৃণার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও বটে।

প্রসন্নদৃষ্টিতে ওয়াশিংটন ম্যাকলেনের দিকে তাকান। বলেন, স্ট্যাণ্ড ইজি মিঃ ম্যাকলেন।

হ্যামিলটন উঠে দাঁড়ান—হাতের খানকয়েক কাগজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ধীরে ধীরে ঘর পেরিয়ে যান। ম্যাকলেনের দিকে তিনি কোন নজরই দেননি। হেঁটে তিনি দূরের দেয়ালের কাছে যান এবং দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুরে দাঁড়ান। সরাসরি ম্যাকলেনের দিকে তিনি তাকান নি। মেয়েদের মত লম্বা পাতায় আধবোজা তার চোখ।

তিনি বলেন, মিঃ ম্যাকলেন, এই লোকটিকে গ্রেফতার করা অবধি যাবতীয় ঘটনা আদালতের সামনে বর্ণনা করুন না। ঠিক ঐ সময়ে কিং অফ প্রুশিয়া রোডে কি করে আপনি হাজির হলেন সেই কথাটাই বলুন। মনে হয় সময়টা ভোর বেলাই ছিল।

ম্যাকলেন বলে, মাননীয়গণ, কর্নেল হ্যামিলটনের অভিসন্ধি আরোপ করার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি আমার কর্তব্য করে যাচ্ছিলাম।

হ্যামিলটন : অভিসন্ধি আরোপের কোন অভিপ্রায় আমার নেই।

আদালত : ওর প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে মিঃ ম্যাকলেন।

ম্যাকলেন : মাননীয়গণ, আপনারা জানেন পল্টনের জন্য রসদ যোগাড় করতে কি কাজ আমি করেছি। ইদানীং আমি সংবাদ পাই যে কোয়েকাররা রাত্রে চলাফেরা শুরু করেছে। ট্রেনের মত সারবেঁধে তারা ফসলের গাড়ি নিয়ে যায়। প্রত্যূষে ফিলাডেলফিয়ার কাছাকাছি ব্রিটিশ ঘাঁটিতে পৌছোবার আশায় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই তারা রওনা হয়। কাজেই আমি ভোর রাত্রে ঘোরাফেরা করবার নিয়ম করে নিয়েছি। সতেরোই ফেব্রুয়ারি সকাল বেলাটা ভারি অপয়া ছিল। নোরিসটাউন থেকে চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়ে ফিরবার পথে সশস্ত্র চারজন লোক দেখতে পাই। খোঁজখবর নেবার জন্য আমি এগিয়ে

যাই এবং চেঁচিয়ে তাদের থামতে বলি। তারা তখন মাঠ দিয়ে দৌড় মারে এবং দুর্ভাগ্যবশত আমরা বরফের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলি। তবু আমার লোকজন তাদের ধাওয়া করে। পরিশেষে যখন তারা বুঝতে পারে যে পালাবার পথ নেই, তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে করে গুলির আঘাতে আমার এক সঙ্গীকে হত্যা করে।

হ্যামিলটন বলেন, ধন্যবাদ মিঃ ম্যাকলেন। তিনি তখন আমাদের কাছে এগিয়ে আসেন এবং ম্যাকলেনের দিকে পেছন ফিরে চাপাগলায় জিজ্ঞাসা করেন, মেয়েটির হাতে অস্ত্র ছিল?

না স্যর!

তখন আবার তিনি টেবিলের কাছে হেঁটে যান এবং টেবিলের উপর হাত রেখে ম্যাকলেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা মিঃ ম্যাকলেন, আপনি চারজন দলত্যাগীর কথা বলেছেন। তারা সবাই পুরুষ ছিল কি?

না স্যর। একজন মেয়ে ছিল।

তাহলে তিনজন দলত্যাগী ছিল বলুন। আমি যতদূর জানি, আমাদের পল্টনে তো কোন মেয়ে নাম লেখায়নি!

হ্যাঁ স্যর—তিনজন লোক।

আচ্ছা, আপনি চারজন লোক হেঁটে যাবার কথা বলেছেন। মেয়েটির হাতেও অস্ত্র ছিল কি?

ম্যাকলেন ইতস্ততঃ করতে থাকে।

জবাব দিন মিঃ ম্যাকলেন। ছিল মেয়েটির হাতে অস্ত্র?

আমার মনে নেই।

আচ্ছা মিঃ ম্যাকলেন, গড়ে একটা মাস্কেটের ওজন কত?

আদালত: মিঃ হ্যামিলটন, আপনি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা না করলেই ভাল হয়। ঘটনাটির নাটকীয় রূপ দেবার জন্য

আপনি এখানে উপস্থিত হননি। ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে সাহায্য করাই আপনার কর্তব্য।

হ্যামিলটন: আদালতের অনুমতি পেলেই আমি প্রমাণ করতে পারব যে এর সব কিছুই প্রাসঙ্গিক। আমার প্রশ্নের জবাব দিন মিঃ ম্যাকলেন।

ম্যাকলেন: স্টোন খানেকের মত হতে পারে।

অর্থাৎ পানেরো কি ষোল পাউণ্ডের মত। কেমন তো! আচ্ছা, একটা মাস্কেটের ওজন যে অনায়াসেই বিশ পাউণ্ডও হতে পারে এ কি আপনি অস্বীকার করবেন?

মাস্কেট ওজন করার অভ্যাস আমার নেই।

কিন্তু আমি করি। এই যে অনশনক্লিষ্ট স্ত্রীলোকটির কথা হচ্ছে, তার ওজন বড় জোর আশী কি নব্বুই পাউণ্ড। তবু আপনি বলতে পারছেন না যে তার কাছে অস্ত্র ছিল কি না?

ম্যাকলেন বলে, মাননীয়গণ, কর্নেল হ্যামিল্টনের খোঁচা আমি আপত্তিজনক বলে মনে করি। এখানে আমার বিচার হচ্ছে না।

তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে মেয়েটির হাতে অস্ত্র ছিল না। হ্যামিলটন বলেন।

মাননীয়গণ…

মিঃ হ্যামিলটনের প্রশ্নের জবাব দিন।

পুরুষেরা সশস্ত্র ছিল।

আর মেয়েটি ছিল না। কেমন তো! মেয়েটি মারা গেছে— আপনার লোকেই গুলি করে মেরেছে। কথাটা আপনার বিবরণ থেকে বাদ পড়েছে মিঃ ম্যাকলেন। এখন বলুন তো ঘটনাটা কেন আপনি বাদ দিলেন, আর কেনই বা আপনার লোক এই নিরস্ত্র মেয়েটিকে গুলি করল? তাকে নিশ্চয়ই দলত্যাগী বলতে পারেন না!

সে যে মেয়ে তা আমরা বুঝতে পারিনি। পুরুষের মতই পোশাক পরা ছিল।

কিন্তু নিরস্ত্র ছিল। আপনার কত জন লোক গুলি করে মিঃ ম্যাকলেন?

বলতে পারি না—জন বারো হতে পারে।

আপনিই গুলি করবার আদেশ দিয়েছিলেন তো!

হাঁ। আমরা তখন কর্তব্যরত ছিলাম। আর সশস্ত্র লোক কটি গ্রেফতারে বাধা দেয়।

তবু যে গুলিটা লক্ষ্য ভেদ করল তাতে শুধু একটি নিরস্ত্র স্ত্রীলোক খুন হয়। এর কারণ কি বলতে পারেন?

সঙ্গীদের হাতের টিপ সম্পর্কে জবাবদিহি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা ঘোড়ার পিঠে ছিল এবং চলতি লোকের উপর গুলি করে।

মিঃ ম্যাকলেন, আপনি বলছেন যে আপনারা গুলি ছুঁড়বার আগেই আপনার দলের লোকটি পলাতকদের গুলিতে মারা যায়। নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন যে চলমান বারো জন লোক যখন চঞ্চল লক্ষ্যের দিকে গুলি করে তখন বারোটা গুলির মধ্যে অন্তত একটা লাগা মোটামুটি ভাল লক্ষ্যভেদ বলতে হবে। তা তারা অশ্বপৃষ্ঠে থাক কি পায়ে হেঁটে এগোক তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। এ-ও আপনি বলেছেন যে দলত্যাগীরা গুলি করবার পরক্ষণেই আপনি গুলি চালাবার আদেশ দিয়েছিলেন এবং দলত্যাগীরা তখনও চলছে। আচ্ছা ব্যাপারটা এইবার ভাল করে আমায় বুঝতে দিন: তিনজন চলমান লোক আপনার ব্রিগেড লক্ষ্য করে গুলি করে এবং তার একটা গুলি লাগে। এ থেকে আপনার কিছু মনে হয়?

তার মানে জেনারেল ওয়েনের লোকজনের হাতের টিপ আমাদের

চাইতে ভাল কি না? আমার লোকজন অশ্বারোহী—হাতের টিপ তাদের নির্ভুল নয়।

আবার এও হতে পারে যে আপনার লোকজন গুলি করে মেয়েটিকে হত্যা করে এবং তখন লোক তিনটি দাঁড়িয়ে আপনাদের দিকে গুলি করে!

আদালত: মিঃ হ্যামিলটন, অনুমান দ্বারা আদালতকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করা উচিত নয়।

হ্যামিলটন তখন ম্যাকলেনের দিকে ফিরে শান্তভাবে বলেন, মিঃ ম্যাকলেন, কারা আগে গুলি করেছে বলুন তো! দলত্যাগীরা না আপনারা?

ম্যাকলেন বলে, মাননীয়গণ, আমাকে এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে হবে কি?

দিতে হবে।

লোক কটি বনের মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি গুলি করবার আদেশ দিই।

বেশ তো, প্রথম গুলি করে কারা?

আমার লোকজন।

তবু আপনি বলছেন যে গ্রেফতার এড়াবার জন্য এরা পাল্টা গুলি করে। তাছাড়া, ইঙ্গিতে আপনি এ কথাও বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রথম ওরাই গুলি করে। ইচ্ছে করে আপনি এদের রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বলে বর্ণনা করেছেন মিঃ ম্যাকলেন।

মাননীয়গণ, সাধারণ অপরাধীর মত এইভাবে আমার উপর দোষারোপ করা উচিত কি?

ওয়াশিংটন বলেন, মিঃ ম্যাকলেনের প্রতি কোন অভিসন্ধি আরোপ করার অধিকার আপনার নেই মিঃ হ্যামিলটন। এখানে তার বিচার হচ্ছে না।

কিন্তু এমন অভিযোগে এই লোক তিনটির বিচার হচ্ছে যে দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

তখন ওয়েন বলে ওঠেন, ইওর একসেলেনসি! আমার দলের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার দোষারোপ করা হয়েছে। আমি দাবী করছি যে এ অভিযোগ প্রমান করতে হবে।

হ্যামিলটন: আচ্ছা মিঃ ম্যাকলেন, এই লোক তিনটি কি ইচ্ছে করে গুলি ছোড়ে, না স্ত্রীলোকটি খুন হওয়ায় রাগের মাথায় গুলি ছুঁড়েছে?

তারা আমার এক অনুচরকে হত্যা করেছে। এরা দলত্যাগী।

কনওয়ে তখন কাত হয়ে বলেন, আপনি কি বোঝাতে চাইছেন কর্নেল হ্যামিলটন? আমরা কোন অফিসার বা ভদ্রলোকের বিচার করছি না। বিচার করছি তিনজন পলাতকের। ওদের দিকে একবার তাকান তো! এদের সৈনিক বল্লে সৈনিক নাম অপবিত্র করা হয়।

ওয়েন তখন চেঁচিয়ে ওঠেন, আমার সৈনিকদের উপর দিয়ে কর্নেল কনওয়ে যদি কোন ব্যক্তিকে আঘাত করতে চান তো তিনি আমার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। এরা সৈনিক কিনা···

ভদ্রমহোদয়গণ! ওয়াশিংটন শান্তভাবে বলে ওঠেন।

কনওয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওয়েন কাঁপতে থাকেন। ওয়াশিংটন বলেন, বসুন জেনারেল ওয়েন। আত্মবিস্মৃত হবেন না।

হ্যামিলটন বলেন, কর্নেল কনওয়ে যদি কোন মন্তব্য করতে চান তো ব্যক্তিগতভাবে আমি তার সবকটির জবাব দিতে পারব। এমনি পাঁচ হাজার লোক আছে এই ছাউনিতে। তাদের যদি আমি সৈনিক নামে ডাকতে না পারি তো আমি আমার সামরিক পদ ত্যাগ করব।

ওয়াশিংটনের কণ্ঠস্বর হিম শীতল। তিনি বলেন, মিঃ হ্যামিলটন, ব্যক্তিগত আলোচনার জন্য আপনি আদালতে উপস্থিত হননি।

আপনার যদি হয়ে গিয়ে থাকে বলে মনে করেন তো আদালত আপনাকে চলে যাবার অনুমতি দিচ্ছে।

হ্যামিলটন ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। একবার আমার মনে হয় তিনি বেরিয়ে যাবেন। তখন তিনি বলেন, বিনীতভাবে আমি আপনার কাছে মার্জনা চাইছি স্যর! এই লোককটির ব্যাপারে আমার বিশেষ কোন স্বার্থ নেই। আমাকে এদের অধিকার রক্ষায় জন্য বলা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, সেইটেই আদালতের কর্তব্য।

ওয়েন বলেন, ইওর একসেলেনসি, আমিও মিঃ হ্যামিলটনের সুরে সুর মেলাচ্ছি। আমিও মার্জনা চাইছি।

বলে যান মিঃ হ্যামিলটন। ওয়াশিংটন সংক্ষেপে বলেন।

হ্যামিলটন বলেন, মিঃ ম্যাকলেন, যদি কেউ আপনার স্ত্রীকে গুলি করে এবং আপনার হাতে যদি গুলিভরা বন্দুক থাকে আর অপরাধীটিকে সামনে দেখতে পান—কি করেন আপনি?

ম্যাকলেন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওয়াশিংটন বলেন, এ প্রশ্নের জবাব ক্যাপ্টেন ম্যাকলেন দেবে না। আপনি যদি প্রাসঙ্গিত ঘটনার মধ্যে থাকতে না পারেন তো আমি সাক্ষীকে বিদায় করে দেব মিঃ হ্যামিলটন।

কিন্তু ইওর একসেলেনসি, আসল ঘটনাটা কি? আমি প্রমাণ করেছি যে ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের লোকজন প্রথমে গুলি করেছে। এ লোকগুলো পালিয়ে যেতে পারত। মিঃ ম্যাকলেনও স্বীকার করেছেন একথা। এই মেয়েটিকে গুলিবিদ্ধ দেখেই…

লর্ড স্টার্লিং তখন বিরক্তভাবে বলেন, আপনি কি সাধারণ এক শিবির-সঙ্গিনীকে অফিসারদের স্ত্রীর সঙ্গে তুলনার যোগ্য বলে মনে করেন নাকি? তা যদি হয় স্যর, তাহলে এ টেবিলে একলা আমিই অসম্মান বোধ করব না।

এমন কোন তুলনা আমি করিনি স্যর। তবে লর্ড স্টার্লিং যদি ঝগড়া করতে চান তো…

আর আমি আপনাকে সাবধান করে দেব না মিঃ হ্যামিলটন। ওয়াশিংটন সংক্ষেপে জানান।

আমি দুঃখিত স্যর। আমাকে জেরা করবার অনুমতি দিন।

বেশ!

মিঃ ম্যাকলেন, মেয়েটির মৃত্যুতে পলাতকদের মধ্যে কেউ শোকের লক্ষণ প্রকাশ করেছিল?

মনে হয় একজন করেছিল।

কি কি করেছিল বলুন তো!

যারা তাকে ধরেছিল তাদের হাত ছাড়িয়ে সে স্ত্রীলোকটির কাছে ছুটে যায়।

কে সে বলতে পারেন?

না।

আচ্ছা, এই লোককটির দিকে একবার তাকান তো মিঃ ম্যাকলেন। কর্নেল কনওয়ে বলেছেন যে এরা সৈনিক নাম কলঙ্কিত করেছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এরা অর্ধ-ভুক্ত এবং অর্ধনগ্ন। দু-তিন জনের হাত ছাড়িয়ে যেতে পারে এমন জোর এদের কারও আছে বলে মনে হয় না। প্রবল উত্তেজনার বশেই এদের পক্ষে এমন জোরের কাজ করতে চেষ্টা করা সম্ভব। আচ্ছা মিঃ ম্যাকলেন, আপনি কি স্বীকার করবেন যে এদের উত্তেজনা খুবই প্রবল ছিল?

জানিনা।

কিন্তু জানতে হবে আপনাকে। নিজের চোখে আপনি সবকিছু দেখেছেন!

তাহলে আমি মেনে নিচ্ছি।

ধন্যবাদ। ব্যস এই পর্যন্তই মিঃ ম্যাকলেন।

আদালত আমাকে যাবার অনুমতি দিচ্ছেন কি? ম্যাকলেন জিজ্ঞাসা করে।

তখন ওয়াশিংটন জিজ্ঞাসা করেন, আর কেউ মিঃ ম্যাকলেনকে কোন জেরা করবেন? কোন জবাব পাওয়া গেল না।—আপনি যেতে পারেন। আবার তিনি বলেন।

ম্যাকলেন লম্বা লম্বা পা ফেলে বেড়িয়ে যায়। ধীরে ধীরে হেঁটে আবার জানালার কাছে যায় হ্যামিলটন। গোটা ঘরখানা নীরব। ঘড়ির টক্‌টকানি ড্রাম বাজনার মত লাগছে।

ওয়াশিংটন বলে ওঠেন, আপনার কোন সাক্ষী আছে মিঃ হ্যামিলটন?

আদালত আসামীদের জেরা করবার অনুমতি দেবেন কি? আমাদের দেখিয়ে হ্যামিলটন জিজ্ঞাসা করেন।

বেশ!

হ্যামিলটন তখন আমার নাম ধরে ডাকেন। আমি উঠে দাঁড়াই। কেনটন ও চার্লি কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকায়।

এগিয়ে এস। মার্কার বলেন।

আমি টেবিলের কাছে এগিয়ে যাই।

তোমার নাম আলেন হেল?

হাঁ স্যার!

রেজিমেণ্টের নাম।

চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়া।

তুমি পেনসিলভানিয়ার লোক?

না স্যার! আমার জন্ম নিউ ইয়র্কে।

নিউ ইয়র্কের কোথায়?

মোহক উপত্যকায়।

সেইখানেই বরাবর বাস করেছ ?

সেখানে এবং হ্রদ অঞ্চলে।

হ্রদ অঞ্চলটা কোথায় ?

পশ্চিমে—ফিঙ্গার হ্রদের কাছাকাছি। আমরা তাকে ভ্যালি বলে ডাকি।

তোমার বয়স কত ?

একুশ বছর।

পণ্টনে কখন ভর্তি হয়েছ ?

সতেরোশো পচাত্তর সালের মে মাসের শেষের দিকে।

আড়াই বছরের মত কাজ করেছে তাহলে। আচ্ছা নাম লিখিয়েছিলে কতদিন আগে ?

তিন বছর।

পণ্টনের চাকুরীর মেয়াদের যখন আর মাস কয়েক বাকী আছে তখন পালালে কেন ?

আমি তখন মাথাটা ঝেঁকে নিই। কেমন ভারী ভারী অথচ জমাট-বাঁধা লাগে। আমি যে এইখানে দাঁড়িয়ে আছি…অফিসাররা রয়েছেন গোল টেবিলের চারপাশে এবং হ্যামিলটন যে বেগনি চোখের লম্বা পাতার আড়াল থেকে আমাকে লক্ষ্য করেছেন—এ সব কিছু আস্তানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখার মত মনে হয়।

ভেবেছিলাম দলত্যাগ করে যাব। আমি বলি।

কিন্তু কেন ?

ভাবলাম এ শীত আর কাটাবনা, তাই ভেগে পালাবার সিদ্ধান্ত করি। আচ্ছা নরকের মধ্যে ছিলাম, তাই ভ্যালি অঞ্চলের জন্য মনটা আনচান করত। ভাবলাম চলে যাব। অনেক লোকই তো ভাগছিল এবং গুজব রটে যায় যে বসন্তকালে পণ্টনের অস্তিত্ব থাকবে না।

মোহক উপত্যকায় পৌঁছোতে পারবে আশা ছিল ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিই।

অর্থপূর্ণভাবে হ্যামিলটন আমার পায়ের দিকে, আমার পরা জামা-কাপড়ের দিকে তাকান। বলেন, যখন তুমি পল্টনে ভর্তি হও তখনই কি পেনসিলভানিয়ার রেজিমেণ্টে ঢুকেছিল ?

না স্যর। বোস্টনের বাইরে খুব সামান্যই পেনসিলভানিয়ার লোক আছে। আমি চার নম্বর নিউ ইয়র্ক রেজিমেণ্টে ভর্তি হয়েছিলাম।

সে রেজিমেণ্ট এখন কোথায় ?

মারা গেছে। আমি জবাব করি।

তুমি কি বলতে চাও যে তুমি ছাড়া আর একজনও বেঁচে নেই !

আরও পাঁচজন আছে।

চার নম্বর নিউ ইয়র্ক রেজিমেণ্ট থেকে কেউ ভেগেছে ?

সামান্য জনকয়েক। বাকী আর সবাই কোন না কোন যুদ্ধে মারা গেছে।

বুঝলাম। আচ্ছা তোমরা তিনজন যখন পালালে তখন সঙ্গে মেয়ে নেবার সিদ্ধান্ত করলে কেন ? তোমরা কি ভেবেছ, তোমরা যে দীর্ঘপথ চলবে বলে স্থির করেছিলে মেয়েটিও অতটা পথ যেতে পারবে ?

কোন মেয়ে যে অতটা পথ যেতে পারবে, এ কল্পনা আমি কোনদিন করিনি। তাছাড়া ইদানীং তার গায়ে তেমন জোরও ছিল না।

তাহলে তাকে সঙ্গে নিলে কেন ?

সে যেতে চাইল বলে। বল্লে, যদি তাকে রেখে যাই তো আত্মহত্যা করবে।

সে কি তোমার স্ত্রী ?

স্ত্রী হবার যোগ্যা সে নয়। ছাড়াছাড়া ভাবে বলি। মেয়েটি শিবির-সঙ্গিনী।

তবু সে তোমায় এত ভালবাসত যে তুমি ছেড়ে গেলে সে আত্মহত্যা করত।

হাঁ।

আচ্ছা, যেদিন সকালবেলা তোমাদের গ্রেফতার করা হয়, কোথায় ছিলে তোমরা ?

নোরিসটাউনের পথ ধরে যাচ্ছিলাম।

যেতে যেতে ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের লোকজন আসতে দেখলে, কেমন তো ! আচ্ছা, প্রথম এদের চিনতে পেরেছিলে ?

তাদের নম্বর দেখে বুঝেছিলাম যে তারা পল্টনেরই লোক।

তখন কি করলে ?

বনের আড়ালে ঢুকব বলে মাঠ দিয়ে দৌড়োতে লাগলাম।

মাঠ পার হবার সময় তোমরা এক সাথে ছিলে ?

বেস পড়ে যায়। অমি তাকে ধরে তুলছিলাম। চার্লি ও কেনটন দশ বারো পা সামনে ছিল।

তারা এড়িয়ে যেতে পারত ?

দেরি না করলে পারত।

কি হল তখন ?

অশ্বারোহীদের জন কয়েক মাটিতে নেমে পড়ে। তারপর এক ঝাঁক গুলি ছোঁড়ে আমাদের দিকে। বেসের গায়ে বুলেট লাগে এবং সে আমার হাত থেকে পড়ে যায়।

গুলি করবার আগে অশ্বারোহীদের কেউ কেউ মাটিতে নেমেছিল ? তাক করে গুলি ছোড়ে।

বলতে পারব না। গুলির টিপ ওদের ভাল নয়।

হ্যামিলটন হাসেন। তারপর ইচ্ছে করেই মুখ গম্ভীর করেন। বলেন, তোরা কি করলে তখন ?

বেসের গায়ে গুলি লেগেছে দেখে আমি বোধহয় ক্ষেপে যাই। মনে হয়, তখন আর কোন জিনিসের পরোয়া ছিল না; তাই বন্দুক দিয়ে গুলি করি। কেনটন আর চার্লিও করে। মনে হয় সবাই আমরা পাগলা হয়ে গেছলাম···ফিরে যাবার কথা ভেবে মাথা বিগড়ে গিয়েছিল।

গুলি করবার সময় তোমরা তাক করেছিলে?

যতদূর মনে পড়ে, না। যেমন বন্দুক ধরেছিলাম সেই ভাবেই গুলি করি। ওরাও তাই করে।

কারা—তোমার বন্ধুরা?

হাঁ।

ধন্যবাদ। ব্যস, আর বলতে হবে না। আমি আমার চেয়ারে ফিরে আসি এবং ধপ করে বসে পড়ি। কেনটন ও চার্লি পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। নাক সোজা চেয়ে আছে এবং কোন দিকেই তাকাচ্ছে না। আমার দিকেও তাকায়নি।

হ্যামিলটন তখন চেয়ারের দিকে ফেরেন। বলেন, মাননীয়গণ, আর আমার বেশী কিছু বলবার নেই। এরা দলত্যাগী বটে কিন্তু খুনী নয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ এরা করেনি। ক্ষেপে গিয়ে গুলি করেছে। এদের অপরাধ পূর্ব কল্পিত বা স্বেচ্ছাকৃত নয়। কি দুর্ভোগ এরা ভুগছে, আপনাদের কাছে তা বলা বাহুল্য। ভগবান সাক্ষী, আপনারা সকলেই তা জানেন। এবারকার শীত নরক সৃষ্টি করেছে। আমরা পাথুরে বাড়ীতে থাকি, খাই, মদ্যপান করি, ঘুমোতে পারি এবং ভাল জামা-কাপড় পরি। কিন্তু আপনারা দেখেছেন, কেমন করে জানোয়ারের মত এরা নিজেদের আস্তানায় ঘাড় গুঁজে থাকে। সবই জানেন আপনারা।

ওয়াশিংটন বলেন, মিঃ হ্যামিলটন, এটা অসামরিক আদালত নয়।

সামরিক অপরাধের জন্য আমরা এদের বিচার করছি। এদের পক্ষে গুলি করে হত্যা করা বিদ্রোহের সামিল।

কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য সে কাজ এদের করতে হয়েছে। মানবতার বিধানে এরা নির্দোষ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এরা উপোস করেছে। কারও মাথা ঠিক ছিল না।

তাহলেও এরা খুন করেছে।

মাননীয়গণ, আমি আদালত নই। আমি শুধু ওকালতি করতে পারি। তবে এটুকু বলতে পারি যে এদের অবস্থায় পড়লে, আমিও এই-ই করতাম।

জানালার পাশে গিয়ে তিনি চেয়ারে বসে পড়েন এবং বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন। টেবিলে বসা সেনানীরা তখন চাপা গলায় আলোচনা শুরু করেন। ওয়েনের কথা কানে আসে। বলছেন, সৈনিক নিয়ে আপনি কারবার করছেন না স্যর। আস্ত জানোয়ার! কোন শৃঙ্খলা নেই। এ বারুদের পিপে নিয়ে খেলা করার সামিল।

তা যদি হয় তো তাই আমি করব। যদি একজন সৈনিকও থাকে তো তাকে আমার অধীনে থাকতে হবে।

লর্ড স্টার্লিং: আমি হলে রেহাই দিতাম না। আচ্ছা করে হিজ ম্যাজেস্টির পল্টনের মত শিক্ষা দিয়ে দিতাম।

মহামান্য রাজা আমার পল্টন পরিচালনা করছেন না স্যর। ওয়াশিংটন ফোড়ন কাটেন।

স্বপ্নাবিষ্টের মত নিশ্চল হয়ে বসে আছে কেনটন আর চার্লি। সামরিক বিচার সম্পর্কে তাদের কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। দুজনেরই শূন্য দৃষ্টি। আমি ঘড়িটার টকটকানি শুনছি—চেয়ে আছি দোলকটার দিকে। প্রতিটি শব্দ শুনছি। কেমন ক্লান্ত—ঝিমুঝিমু লাগছে। ঘুমোবার জন্য মন আইঢাই করছে। ক্রমে ঘরটা গরম

হয়ে ওঠে। মেজেয় একখানা কম্বল বিছান। ইচ্ছে হয় কম্বলের পর গা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। চোখের অর্দ্ধেকটা বুজে থাকি। মৌমাছির গুনগুনানির মত চাপা কথার গুঞ্জন কানে আসে।

হঠাৎ ওয়াশিংটনের গলা শুনে চমকে উঠি। তিনি বলেন, মিঃ হ্যামিলটন, তিনজনের মধ্যে কে ম্যাকলেনের সৈনিকটিকে খুন করেছে খোঁজ নিয়ে দেখুন তো।

হ্যামিলটন আমাদের দিকে ফেরেন। কেনটন উঠে দাঁড়ায়। ধেড়ে গলায় বলে, আমি।

দূরাগত কণ্ঠের মত চার্লির গলা কানে আসে, মিথ্যে কথা।

আমিও বলে উঠি, মিথ্যে করে বলছে। হঠাৎ বুঝতে পারি আমিই চেঁচিয়ে বলছি, কি আসে যায়? কে খুন করেছে জানতে চান? আপনারা আমাদের জানোয়ার বানিয়েছেন…জীবনটা প্রহসনে পরিণত করেছেন! জীবনের কিছুই নেই এখানে। আছে শুধু মৃত্যু—শুধু মৃত্যু! কবর দেবার ব্যবস্থাও আপনারা করেন না। গাছের গুঁড়ির মত বরফের উপর পাঁজা করে রাখেন। হঠাৎ বুঝতে পারি, সেখানে বসে বসে নির্বোধের মত হি হি করে হাসছি।

কেনটন আমায় জড়িয়ে ধরে। ফিসফিস করে বলে, শান্ত হও আলেন, শান্ত হও!

চার্লি স্পষ্টভাবেই বলে, গোল্লায় যান! সবাই জাহান্নামে যেতে পারেন।

সেখানে বসে বসে মনে হয়, আমি যেন তাদের থেকে অনেক দূরে…কোন ব্যথা বা তাদের একতেয়ারের অনেক বাইরে চলে গেছি। ওরা খানিকটা অবাক হয়ে পড়েন। পুতুলের মত টেবিলের পাশে বসে থাকেন। হ্যামিলটন মুখ কোঁচকায়—লোপ পায় তার বালকের মত মুখের ভাব।

ওদের বাইরে নিয়ে যান মিঃ হ্যামিলটন। নিরুত্তেজ ক্লান্ত স্বরে ওয়াশিংটন বলেন।

আমরা উঠে দাঁড়াই। হ্যামিলটন দরজা দিয়ে আমাদের নিয়ে বেরিয়ে আসেন। প্রহরীরা ঘিরে ধরে এবং হ্যামিলটন আমাদের পাশের ঘরে নিয়ে যান। বলেন, এখানে বস। আর দাঁড়িয়ে থাকবার দরকার হবে না। আমি ফিরে যাচ্ছি; হয়ত আমাকে আরও কিছু বলতে দেবেন। ঠিক বলতে পারি না! পকেট থেকে একটা পাইপ এবং একটি ছোট্ট তামাকের থলি বার করে টেবিলের পর রেখে বলেন, ইচ্ছে করলে খেতে পার।

তিনি বেরিয়ে যান। আমরা বসে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। চার্লি বলে, অনেক বকর বকর...

আমার ভয় হচ্ছে। আমি বলি।...হা খ্রীস্ট!

ফাঁসিতে মরা বড় কষ্টের! কেনটন বলে।—ফাঁসিতে মরতে হবে এ কোনদিন কল্পনাও করিনি। এই ভীষণ ঠাণ্ডায় ফাঁসিতে ঝুলে থাকা যে কি ভয়ানক!...

ফাঁসি না-ও হতে পারে।

নাঃ। মনে মনে ফাঁসি দেবে বলেই ঠিক করেছে।

হ্যামিলটন লোকটা আমাদের জন্য খুব বলেছে। এত সময় যে বলবে, এ আমি ভাবতেই পারিনি।

বোধ হয়, ম্যাকলেনকে ঘৃণা করে।

বেশ ভাল কথাই বলেছে।

আবার আমরা পরস্পরের দিকে তাকাই। নীরবে চেয়ে থাকি একদৃষ্টে। তারপর হঠাৎ চোখ ঘুরিয়ে যার যে দিকে খুশি তাকাই। পাশের ঘরে বসেও যেন ঘড়ির টকটক শুনতে পাচ্ছি বলে মনে হয়।

ঘড়িতে সময়ের চলা দেখতে ভারি মজা লাগে।

আমরা যে ঘরে বসেছি সেখানে গোধূলির ছায়া নেমেছে। বাইরে শীতের সন্ধ্যা নেমে আসছে। নিভু নিভু একটা আগুন জ্বলছে ঘরে। উৎসুক চোখে আমরা সৌখিন আসবাব পত্র ও মেজের বিছান রাগ খানার দিকে তাকাই। কেনটন বলে, কোয়েকার ব্যাটারা বেশ আরামে থাকে।

আমি পইপটার জন্য হাত বাড়াই। বলি, আমাদের খাবার জন্যই তো দিয়ে গেছে!

খাবারের জন্য প্রাণ আইঢাই করছে, তামাক টানতে ভাল লাগে না। বিড়বিড় করে চালি বলে।

তামাকে দু'চার টান মারলে সময় তো কাটবে!

ওরা নিশ্চয়ি সাজা দেবে।

আমারও তাই মনে হয়।

পাইপে তামাক ভরে আমি আগুনের কাছে যাই এবং একখানা জলন্ত আঙার তামাকের পর দিই। তামাকে টান দিয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। পাইপটা তখন চালির হাতে দিই।

পাইপটার দিকে চেয়ে চালি বলে, তামাক টনতে এলি ভারি ওস্তাদ। যখন তামাক পাওয়া গেছে, দিন রাত তার মুখে পাইপ থাকত। মনে পড়ে?

অনেক বছর আগের কথা বলে মনে হয়।

তামাক টানতে সে যেমন ওস্তাদ তেমনটি আর কাউকে দেখিনি।

তা বটে।

এলি আমাদের মরতে দেখবে, এ ভাবতেও কেমন লাগে! ছোটটি থেকে আমাকে সে বড় হতে দেখেছে। কেনটন বলে।

আমি বলি, আমাদের যদি ফাঁসিই হয় তো আমি মানুষ থাকব না কেনটন। ভয়ে কাঠ হয়ে যাব।

ফাঁসিতে মরা বড় ভয়ানক!

তিনজনেই বসে আছি আর তামাক খাচ্ছি। ঘরটা আরও অন্ধকার হয়। আগুনের শিখা আঁকাবাকা ছায়া ফেলে। মনে হয় আমরা যেন কাঁপছি আর উশখুশ করছি।

হা ভগবান, বড় ক্ষিদে পেয়েছে আমার। চার্লি ফিসফিস করে বলে।

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়েছে। ভারি ইচ্ছে করছে পরিষ্কার এক গ্লাশ জল খেতে।

এতক্ষণে তো ওদের কথাবার্তা হয়ে যাওয়া উচিত। ভয়ে ভয়ে আমি বলি।

নিশ্চয় ফাঁসি দেবার মতলব আঁটছে।

হা খ্রীস্ট, একটু থাম না কেনটন। বিড়বিড় করে চার্লি বলে।

পাইপটা কেনটনের হাতে। বিষণ্ণভাবে সে বলে, আগের পাইপটা ভেঙে বোকার মত কাজ করেছি। পাইপটা ও আমাদের ঠাট্টা করবার মতলবে দেয়নি।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা যায়। আমরা দরজার দিকে তাকাই। হ্যামিলটন ঘরে ঢোকেন। পেছনে প্রহরী। ছাড়া ছাড়া ভাবে বলেন, আমার সঙ্গে এস।

ব্যাপারটা সবাই আমরা বুঝতে পারি। হ্যামিলটনের পেছু পেছু আমরা বিচার কক্ষে ঢুকি। টেবিলের উপর খান কয়েক মোমবাতি জ্বালা। মোমবাতির পেছনের মুখ কখানা নড়ছে…বারবার রঙ বদলাচ্ছে।

মার্কার বলে—এটেনশন্!

হ্যামিলটন জানালার কাছ যায়। ঘরের দিকে পেছন ফিরে পেছনে হাত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওয়াশিংটনের বড় মুখখানা দেখতে পাচ্ছি।

মনে হয় তাঁর পেশীগুলো ঢিলে হয়ে গেছে। প্রশান্ত ভাবের পরিবর্তে মুখে ফুটে উঠেছে বেদনার আঁকাবাঁকা রেখা। ওয়েন মাথা নীচু করে টেবিলের দিকে চেয়ে আছেন। গ্রীন চেয়ে আছে উপরের দিকে। লর্ড স্টার্লিং নখ কামড়াচ্ছেন। তার মুখেও কেমন একটা শূন্যতা। শুধু কনওয়ের মুখেই কেমন ধারা হাসি-হাসি ভাব।

এরপর মার্কার পড়ে যায়: 'এই আদালতের বিচারে আলান হেল, কেনটন ব্রেন্নার এবং চার্লি গ্রীন রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। আদলত তাহাদের প্রতি এই দণ্ড বিধান করিতেছে যে, গোটা পেনসিলভানিয়ার লাইনের সামনে ড্রাম বাদ্য সহ তাহাদের প্যারেড করাইয়া রেজিমেণ্ট হইতে বহিস্কার করিতে হইবে, সর্বসমক্ষে অস্ত্র ও পরিচয় চিহ্ন হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে এবং অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত গলায় ফাঁস পরাইয়া ফাঁসি দিতে হইবে।'

কেনটন মুচকি হাসে। চার্লি গ্রীন আমার হাত চেপে ধরে···মাংসের মধ্যে আঙুল কেটে বসে। আপনা থেকেই আমি চীৎকার করে উঠি। তারপর আমার গলা আটকে যায়—আর কিছুই বলতে পারি না। প্রহরীরা চটপট ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেনানীরা সার বেঁধে বেরিয়ে পড়ার সময় তারা আমাদের ঘিরে থাকে।

হ্যামিলটন বলেন, ভগবান রক্ষা করুন, আমি দুঃখিত। বিশ্বাস কর?

আমাদের মুখে কথা জোগায় না। তিনি বেরিয়ে যান। আমরাও প্রহরীদের পাহারায় চলতে থাকি।

—তেরো—

হানটিংডন কেল্লার কয়েদখানায় আছি। ঘরটিতে কোন জানালা বা আগুন নেই। চারটি কাঠের বেড়ার উপরে চ্যাপটা একখানা চাল। চালও দেয়ালের মাঝখানে বাতাস ঢুকবার মত সামান্ত একটু ফাঁক। হাওয়ার অভাব নেই। এবারকার অন্তহীন প্রচণ্ড শীতের ঠাণ্ডা চুঁইয়ে ঘরে ঢুকছে।

কমাণ্ডাণ্ট ভেতরে আগুনের ব্যাবস্থা করে দেয়। বলে, না হলে আজকের রাতে জমে যাবে যে! ফাঁসির আগে শীতে মরতে দেবার কোন মানে হয় না।

বাক্সের মত চুল্লীটি জ্বলন্ত কয়লার আভায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। বড় জোর ঘণ্টা তিনেক এর উত্তাপ থাকতে পারে। আমরা চুল্লীর চারপাশে বসে পড়ি। চালের ফুটো দিয়ে এক ফালি আকাশ দেখা যায়। সরু এক ফালি আকাশ আর একটি মাত্র তারা দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে আমিই তারাটির দিকে তাকাই। তারপর ওরা দুজনে তাকায়—তারপর তিনজনে মিলে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি। বসেই আছি। আমাদের মূক কামনা ঘরখানি ভরে দেয়। মহাশূন্যের হিমলোকের প্রতি অর্থহীন আকর্ষণ।

কালকে…। কেনটন বলতে শুরু করে। তারপর তার কণ্ঠস্বর ও চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। এখন আমাদের বেশ চেষ্টা করে কথা বলতে হচ্ছে! প্রতিটি শব্দ যেন এক একটি সতন্ত্র ও সুস্পষ্ট চেষ্টার ফল। আগুনের কাছে বসেও কাঁপছি। তাতে সামনের দিক পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু পিঠ ঠাণ্ডা। কেনটন বলে, অনেক কথা হয়েছে…

আমি ভেবেছিলাম উত্তর দিকে ফিরে যেতে পারব। আমি

বলি।—কোন সময় ভাবিনি যে ধরা পড়ব। ভেবেছি, আমাদের যাবার পথেই বসন্ত আসবে।

আমিও তাই ভেবেছি। কেনটন সায় দেয়।

ওদের সামনে ঐ ভাবে কথা বলে ভাল করিনি। বিড়বিড় করে বলে চার্লি।—কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তাতে আর কি হয়েছে?

ফাঁসিতে ঝুলবার কথা ভাবলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। মনে পড়ে, ছোটবেলা মা আমাকে বলতেন যে ফাঁসিতে ঝুলবার জন্যই আমার জন্ম। অবশ্য কথাটা তিনি রহস্য করেই বলতেন।

তোমার মা বেঁচে আছেন? চার্লিকে জিজ্ঞাসা করে কেনটন।

যদি বেঁচে থাকেন তো বোস্টনে থুড়থুড়ি বুড়ী হয়ে আছেন। আর যদি মারা গিয়ে থাকেন তো ফাঁসির পর আমাকে ধমকাবেন। যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী তিনি। হা খ্রীস্ট, যুদ্ধকে কি ঘৃণাই যে করতেন! ছাপার ব্যাপারে স্যাম আদমস একবার যখন আমার কাছে ঘিনঘিন করতে আসে, মা তাকে কাঠ নিয়ে তাড়া করেছিলেন। লাঠি দিয়ে আচ্ছা করে পিঠের ধুলো ঝেড়ে দিয়েছিলেন। তখন সে বলে, ঠিক আছে টোরি বুড়ী! মা বলেন, হাঁ ঠিকই আছে! বেজন্মা ভিখিরি কোথাকার। আমার ছেলের মাথা খেতে চাস তো ভাল হবে না। আর কোন দিন এ বাড়ীতে ঢুকবি না বলে দিলাম।

কেনটন হেসে ওঠে। ধীরে ধীরে বলে, মৃত্যুর পর কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করিনা। ভয় করবার মত কিছুই নেই। এই ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট শীতের কাঁপুনি বা উপোস—কোন কিছু থাকবে না।

কিন্তু আমি না ভেবে থাকতে পারছি না। আমি বলি।—মরবার কথা কোন সময় মনে জাগেনি। এখন মনে হচ্ছে, আমার বয়স একুশ বছর এবং এই বয়সেই আমি যেন অনন্ত অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি।

চার্লি শান্তভাবে বলে, একলা তো আর যাচ্ছ না আলেন! একলা যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না ছোকরা। আমি আর কেনটন তো রইলাম। পথে আরও অনেক ভাল ভাল লোকের দেখা মিলবে।

হাত দিয়ে আমি মুখ চেপে ধরি। মনটা কেমন শিউরে ওঠে। এমন ভয়ানক ভয় করে যে গলা ছেড়ে চেঁচাতে ইচ্ছে হয়। আবার যখন মুখ তুলি, আগুনের আভায় আমাদের মুখ চিকচিক করতে থাকে। কেনটন ও চার্লি অবাক চোখে চেয়ে থাকে আমার দিকে। আমি ফিসফিস করে বলি, ভাবছ বুঝি আমি ভয় পেয়েছি?

তারা মাথা নাড়ে। আবার হাতে মুখ ঢেকে আমি কান্না চাপবার চেষ্টা করি।

এর ঘণ্টাখানেক পরে হ্যামিলটন আসেন। নীল গ্রেটকোট জড়িয়ে তিনি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। আগুনের আভায় তার মুখের ধোঁয়া লালচে দেখায়।

তোমাদের জন্য কিছু মাংস এনেছি। একটা কাঠের পাত্র বাড়িয়ে ধরে বলেন। কেনটন হাত বাড়িয়ে নেয়। বলে, আমাদের জন্ত আপনি ভাল সওয়াল করেছেন। আমরা অকৃতজ্ঞ নই।

আমি দুঃখিত। জবাবে তিনি জান'ন।

সেনানীরা আমাদের ছেড়ে দেবে, এ চিন্তা কোন সময় করিনি।

এখনও তোমাদের মরবার কিছু হয়নি। জেনারেল আজ রাতে আমার সঙ্গে কথা বলবেন বলেছেন। বাঁকা চোখে তিনি আমাদের দিকে তাকান। একজন আমার সঙ্গে এস। জেনারেলের প্রাণটা কঠোর নয়।

তুমিই যাও আলেন। কেনটন বলে। চার্লিও সায় দেয়। আমি মাথা ঝাঁকাই।

যাও না। শান্তভাবে আবার বলে কেনটন।

কেনটনের কাঁধে ভর করে আমি উঠে দাঁড়াই। শীর্ণ ভাঙাপরা বুড়িয়ে যাওয়া মুখে সে আমার দিকে চেয়ে থাকে। আগুনের আভায় তার দাড়ি লালচে দেখায়। চার্লি পাগলের মত মাথা নাড়ে।

বাইরে শান্ত্রী আমাদের থামায়।—এদের দেখাশোনার জন্য আমার উপর আদেশ দেওয়া হয়েছে কর্নেল হ্যামিলটন।

আমি এর জামিন রইলাম। হ্যামিলটন বলেন। অদ্ভুত তার কথা বলার ধরন। যেন তিনি সন্দেহের অতীত। তারপর আবার তিনি হেঁটে চলেন। আমি তার অনুসরণ করি। তার আরদালি আমাদের পেছনে আসে।

পাথুরে বাড়ীটির দরজার সামনে তিনি আরদালিটিকে অপেক্ষা করতে বলেন। শান্ত্রীরা তাকে দেখে 'এটেনশন' হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ভেতরে ঢুকে যান এবং আমাকে বলেন, ওঁকে ভয় করবার কিছু নেই। অদ্ভুত ধরনের কঠোর লোক ; কিন্তু ওকে ভয় করবার কিছু নেই।

যে ঘরে আমাদের বিচার হয়েছে সেই ঘরের দরজায় টোকা মারেন হ্যামিলটন। তার পর ভেতরে ঢুকে যান। ওয়াশিংটন একলা রয়েছেন। টেবিলের পাশে বসে লিখছেন। আমরা ভেতরে ঢোকামাত্র তিনি মুখ তুলে চান নি। তাঁর গায়ে পশমী জ্যাকেট, মাথায় ছোট্ট একটা টুপি। টেবিলের উপর খান কয়েক মোম জ্বলছে। বেশ দেখতে পাচ্ছি লেখার সময় কত আস্তে আস্তে তার হাত নড়ছে।

কে ? তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

কর্নেল হ্যামিলটন।

ভেতরে এস ছোকরা। দরজাটা বন্ধ করে দিও। হাওয়া আছে।

হ্যামিলটন বলেন, ধন্যবাদ ইওর একসেলেনসি! আস্তে তিনি দরজা বন্ধ করে দেন। আমরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। বেশ বুঝতে

পারছি যে হ্যামিলটনের ভয় ভয় করছে। নিজের হাতের দিকে চেয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন তিনি।

অনন্যমনে লিখে যাচ্ছেন ওয়াশিংটন। চোখ কুঁচকে চেয়ে আছেন চশমার মধ্য দিয়ে। তাঁকে দেখে জ্যাকেট ও টুপি-পরা বৃদ্ধ বলেই মনে হয়। মুখের খাঁজগুলো ছায়ায় ঢাকা। অবশেষে পালকের কলমটা রেখে তিনি আধ হাসিভরা মুখে চোখ তোলেন। হাসি মিলিয়ে যায়। তার জায়গায় ফুটে ওঠে ক্ষুব্ধ কঠোর কাঠিন্য।

এর মানে কি মিঃ হ্যামিলটন? তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

আমি ভেবেছি……

সত্যি বলছি, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি কর কর্নেল হ্যামিলটন। এই লোকটাকে আমার কাছে নিয়ে আসবার অর্থ কি? কোথায় তোমার অনুমতিপত্র দেখি? সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ান। আকস্মিক ক্রোধে সারা দেহ দৃঢ় হয়ে ওঠে।

কোন অনুমতি পত্র নেই স্যর।

তাহলে ওকে নিয়ে যাও।

আমি যাবার উদ্যোগ করি, কিন্তু হ্যামিল্টন যেখানে ছিলেন সেই-খানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি মাথা হেঁট করেন। মোলায়েমভাবে বলেন, নিশ্চয়ি নিয়ে যাব ইওর একসেলেনসি। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার কমিশনও ত্যাগ করতে চাই। এখানে আমার স্থান নেই।

চট করে আমার মনে হয় যে টেবিল উলটে ফেলে ওয়াশিংটন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি কেটে পড়েছেন মনে হয়। তারপর হঠাৎ ফুটো ব্লাডারের মত তাঁর ক্রোধ চুপসে যায়। অবসন্নের মত ধপ করে চেয়ারে বসে পড়েন এবং শূন্য ক্লান্ত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে থাকেন। টেবিলের পর কনুই রেখে তিনি হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেন।

তোমার কমিশন ত্যাগ করবে? তিনি বলেন। কথাটা তার বিশ্বাস হয়েছে বলে মনে হয় না।

করতে আমি বাধ্য।

তাঁর মুখ ভেঙে পড়ে। চট করে যে মুখের এমন করুণ চেহারা হতে পারে তা এর আগে কোনদিন দেখিনি। অসহায়ের মত হাত প্রসারিত করে বিড়বিড় করে বলেন, শেষে তুমিও! আমার বোঝা উচিত ছিল। স্টার্লিং নিজের কেরামতির গল্প শোনায়, কনওয়ে ষড়যন্ত্র করে, ভারনাম বিদ্রূপ করে আর ওয়েনটা আধ পাগলা। শেষ পর্যন্ত তুমিও ছেড়ে যাবে! হা ভগবান! একলা, আমি একলা। এ সওয়া যায় না।

জানি না তিনি অভিনয় করছেন কিনা। যদি অভিনয় হয় তো তাঁকে অতুলনীয় অভিনেতা বলতে হবে। টেবিলের পর হাত ছড়িয়ে সামান্য হাঁ-করে তিনি শূন্য দৃষ্টিতে হ্যামিলটনের দিকে চেয়ে থাকেন। মুখ কাঁপতে থাকে। ফিসফিস করে বলেন, যাও, চলে যাও! আমায় একলা থাকতে দাও। ভগবান সাক্ষী, আমি একলা—বরাবর নিঃসঙ্গ। ভেবেছিলাম, তোমার আস্থা আছে। কিন্তু এখন দেখছি, তুমিও আলাদা নও, কোন বিশিষ্টতা নেই তোমার মধ্যে।

আড়চোখে আমি হ্যামিলটনের দিকে তাকাই। তার মুখেও জেনারেলের মুখের প্রতিচ্ছবি—আধ-বোজা বেগনি চোখ গভীর দুঃখে তেমনি ব্যাথাতুর। হাত খানিকটা সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

চলে যাও! গাঢ়কণ্ঠে ওয়াশিংটন বলেন।

তবু কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকেন হ্যামিলটন; তারপর আস্তে দরজার দিকে পা বাড়ান।

দাঁড়াও! ওয়াশিংটনের মুখ শুকিয়ে যায়। বুড়ো মানুষ বেচারী!

ছাড়া ছাড়া ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, কেন পদত্যাগ করছ? কেন চাইছ আমাকে ছেড়ে যেতে?

আপনাকে ছেড়ে যেতে আমি চাইনে স্যর। বিশ্বাস করুন…মাথার উপরে ভগবান রয়েছেন…আপনাকে ছেড়ে গেলে আমার বাঁচবার কোন অর্থ হবে না স্যর। আমাদের আদর্শ আর আপনার জন্য ছাড়া আমার বাঁচবার কোন সাধ নেই স্যর।

ওয়াশিংটনের মুখে আশার ঝিলিক খেলে—হ্যামিলটনের জন্য ভালবাসা ও আকুতি ফুটে বেরোয়। তিনি একখানা হাত বড়িয়ে দেন। বলেন, ছেড়ে যেও না!

স্যর, আন্যায়ভাবে একটি জীবনও যদি নেওয়া হয়, ঈর্ষা-দ্বেষের জন্য একজনকেও যদি প্রাণ হারাতে হয় তো তাতেই আদর্শ কলঙ্কিত হয়। আদর্শ আর বেঁচে নেই। তার জন্য লোকে আর দুঃখবরণ করতে পারে না। এইখানেই সমস্ত দুঃখবরণের শেষ সীমা, সমস্ত…

ওয়াশিংটন উঠে দাঁড়ান—দড়াম করে ঘুষো মারেন টেবিলের উপর। তাঁর এই ভাবান্তর যেমন আকস্মিক তেমনি প্রচণ্ড। অনেকটা হঠাৎ-মাথা-খারাপ লোকের মত। আমরা ঘাবড়ে যাই—পেছনে সরে আসি। ঘরটা নেহাৎ ছোট ছোট লাগে। টেবিলের ওধার থেকে বেরিয়ে এসে তিনি হাঁপাতে থাকেন। চেঁচিয়ে বলেন, দুঃখবরণের কথা বলছ? হা ভগবান, তুমিও দুঃখ ভোগের কথা শোনাচ্ছ! কি জান তুমি? কতটা দুঃখু সয়েছ? কেউ বিশ্বাস করে আমাকে? কারুকে বিশ্বাস করতে পারি আমি? সব সময় কোন মানুষকে যদি একলা থাকতে হয়, সবাই যদি তাকে ভয় করে, ঘৃণা করে—কি অবস্থা তার হয় বোঝ? কার কাছে আসে? আমার কাছে কাকুতি জানাতে আসে—কাঁদতে আসে। লোকে উপোস করছে! আজ খাবার ছুঁতে দেখেছ আমাকে? ঘুমোই আমি? বিশ্রাম করি? মরণের আগে পর্যন্ত কোন শান্তি

আছে আমার? কোনদিন পাব শান্তি? ইংলণ্ডে একটা ফাঁস ছাড়া কোন ভবিষ্যত আমার আছে? ওরা উচ্চাশার কথা বলে—রাজা ওয়াশিংটনের কথা বলে। হা খ্রীস্ট! অস্বীকার করি না। আমি প্রাণহীন…বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে সিংহাসনের আশায় আছি। ওই জানালা দিয়ে তাকাও, তাহলেই বরফ-ঢাকা জয় পাহাড়ের মাথায় আমার সিংহাসন দেখতে পাবে। হাউ (১) হলপ করেছে, ঐখানে আমায় ফাঁসি দেবে। কে আমার পাশে থাকবে তখন? কাকে বিশ্বাস করতে পারি আমি? চিরকাল কোন লোক একলা চলতে পারে? পারে সইতে…

ক্ষোভের এমনি আকস্মিক প্রকাশে অবসন্নের মত সেইখানেই তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। ঐ বিরাট চেহারা বড়ই করুণ দেখায়। হাত দুটো অবশ ভাবে ঝুলে পড়ে। টুপিটা আগেই মেজেয় খসে পড়েছে। চশমা হাতড়ে তিনি টেবিলের পর রেখে দেন। টলতে টলতে চেয়ারের কাছে গিয়ে তিনি ঘর পার হয়ে আগুনের দিকে এগিয়ে যান। কাঁপতে কাঁপতে আগুনের তাতে গা গরম করবার চেষ্টা করেন। আমরা যে ঘরের মধ্যেই রয়েছি এ খেয়ালও তাঁর আছে বলে মনে হয় না। হ্যামিলটন বিড়বিড় করে বলেন, আমি দুঃখিত স্যর!

আমারা সয়ে যাব। শান্ত ভাবে বলেন তিনি।—তবু সইব আমরা। আবার তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। ফিরে এসে চেয়ারে বসে পড়েন। বলেন, আমি দুঃখিত কর্নেল হ্যামিলটন। তোমার কাছে আমার মাফ চাওয়া উচিত। যদি তুমি পদত্যাগ করতে চাও তো সে তোমার নিজের ব্যাপার। আমার কিছু করবার নেই।

আছে স্যর! শুধু বলুন, আপনি চান আমাকে।

ভগবান সাক্ষী, নিশ্চয়ি চাই।

(১) ব্রিটিশ ফৌজের প্রধান সেনাপতি।

আমার কথা শুনবেন তাহলে ?

বল কর্নেল হ্যামিলটন।

স্যর, এ লোকটির মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। এ কথা আপনি জানেন। ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের এক অনুচরকে হত্যার অভিযোগে এ এবং আর দুজন পলাতকের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। আপনার সিদ্ধান্তকে পরিহাস করবার জন্য আমি একে নিয়ে আসিনি স্যর! আমি এসেছি আপনার করুণা ভিক্ষা করতে। আমি আপনাকে দেখাতে চাই যে যুদ্ধ ও দুঃখ একুশ বছরের একটা ছেলেকে কি করেছে। আমি বলছি, ছেলেটি তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছে…আর দুজনেও করেছে।

কিন্তু পল্টনে তো দয়ামায়ার স্থান নেই।

ন্যায় বিচারের আছে।

ওরা তো অপরাধ স্বীকার করেছে।

কিন্তু স্যর, কাজটা ওরা উত্তেজনার মাথায় করে বসেছে… আত্মরক্ষার জন্য করেছে।

আমি তো তোমায় আগেই বলেছি কর্নেল হ্যামিলটন যে অসামরিক আইন রণক্ষেত্রে খাটে না। ব্রিটিশরা দলত্যাগীদের ফাঁসি দেয়।

কিন্তু আমরা ব্রিটিশ নই।

নিশ্চয়ি না। আমরা এক শৃংখলাহীন জনতা—পল্টনের প্রহসন। কিন্তু যতদিন একটি লোকও থাকবে, তাকে আমার অধীনে থাকতে হবে। যদি সে উলঙ্গ কি নিরস্ত্রও হয়, তবু তাকে আমার অধীনে থাকতে হবে।

তাহলে একজনের ফাঁসি দিন। একজনই যথেষ্ট। ম্যাকলেনের দলেরও একজনই মরেছে।

জেনারেল ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকান। বলেন, যে ন্যায়বিচার তিন বছর পল্টনকে একসাথে রেখেছে, আমি শুধু সেই ন্যায়বিচারই জানি

কর্নেল হ্যামিলটন। জানি আমরা নরকে আছি। আর এও সত্য, সে বড় কঠিন ঠাঁই।

স্যর, এ নরক হলেও আমরা মানুষ। একবার যদি মনুষ্যত্ব হারাই তো আর চলবার কি সার্থকতা থাকে?

মোম পুড়ে আলো কমে আসে। ক্লান্তভাবে আমি দাঁড়িয়ে থাকি—চেষ্টা করি কোন আশা না করবার। চেষ্টা করি পায়ের ব্যথা ভুলে থাকবার। মোমের আলোয় জেনারেলের মুখ ঝাপসা হয়ে আসে। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলে না। মোমের পেছনে হতবুদ্ধির মত তিনি বসে থাকেন। তিনি যেন দুনিয়ার সব কিছুর বাইরে…যেন কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না দুনিয়ার হাল-চালের সঙ্গে। নাক সোজা চেয়ে থাকেন জেনারেল—কোন কিছুর দিকেই তাকান না। অবশেষে ছাড়াছাড়াভাবে বলেন, জুতোর জন্য আমি কংগ্রেসের কাছে লিখছি কর্নেল হ্যামিলটন। কংগ্রেসের কাছে জুতো আছে। হাজার জোড়া জুতো আছে। কিন্তু আমি খুব সবিনয়ে লিখতে পারছি না। ও আমার আসে না। আমার হয়ে এটা লিখে দেবে?

দেব স্যর।

তখন তিনি আমার দিকে তাকান। আমার পা ও মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। মনে হয়, তিনি যেন আমাকে পাঁচ হাজার লোক থেকে আলাদা করে দিতে চান।—তোমাদের মধ্যে কে গুলি করেছে? তিনি জিজ্ঞাসা করেন। খুব মোলায়েমভাবে নয়।

আমি মাথা ঝাঁকাই। বলি, জানি না স্যর।

ঠিক করে নাও। তারপর হ্যামিলটনের দিকে ফিরে বলেন, দুজনের মুক্তির মত একটা আদেশনামা লেখ কর্নেল। চাবুকের ব্যবস্থা করে আবার ওদের নিজ নিজ ব্রিগেডে পাঠিয়ে দাও।

হ্যামিলটনের মুখে কথা যোগায় না। টেবিলের পাশে বসে একটা পালকের কলম তুলে নিয়ে তিনি লিখতে শুরু করেন। লেখা শেষ করে গম্ভীর গলায় বলেন, আপনি সই করবেন তো স্যর?

সই করে ওয়াশিংটন পালকের কলমটা ফেলে দেন। মনে হয় আর নিজের মাথার ভার বইতে পারছেন না। হ্যামিলটন দরজার কাছে যায়। তিনি দরজা খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াশিংটন ডাক দেন, ফিরে আসছ তো কর্নেল? আমার ঘুম আসে না। তুমি এলে খানিকটা আলোচনা করব।

নিশ্চয়ি আসব স্যর। এখন আর ধন্যবাদ জানাব না। এখুনি ফিরে আসছি।

আমরা বেরিয়ে পড়ি। শান্ত্রীর হেফাজতে আমাকে না দেওয়া অবধি হ্যামিলটন কথা বলেন না। শান্ত্রীটিকে তিনি কেল্লায় যাবার হুকুম দেন। তারপর বলেন, ভোরের আগে ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা কর। এর চাইতে অন্য রকম হলেই সুখী হতাম।

আমি কথা বলবার চেষ্টা করি, কিন্তু গলা আটকে যায়। তিনি হাতখানা বাড়িয়ে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি চেপে ধরি। তারপর তিনি চলে যান।

বরফের মধ্য দিয়ে শান্ত্রীর সঙ্গে হাঁটছি। বাতাস বেজায় ঠাণ্ডা আর কনকনে। জীবনের কথা ভাবি। বরফের ঠাণ্ডা আর বাতাসের গা-কামড়ানি অনুভব করছি। শুধু জীবনের কথাই ভাবি—ভুলে যেতে চাই যে আমাদের একজন মারা যাবে। যেভাবে বাড়ী যেতে চেয়েছি, ঠিক তেমনি ভাবে এখন পরিখায় ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়।

—চৌদ্দ—

কেনটন ও চার্লি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমাকে দেখতে চায় অন্ধকারের মধ্যে। কি করে যে সব কথা খুলে বলব, বুঝে উঠতে পারি না। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকি। ছায়ায় আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চাই।

কেনটন বলে, এস, বস আলেন।

পায়ের ব্যথায় অস্থির লাগে। আগুনের বাক্সটার কাছে গিয়ে বসে পড়ি। ব্যথার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি যে বেঁচে আছি। ব্যথার মধ্যে জীবনের স্বাক্ষর পাই। ব্যথার চাইতে সেইটেই বড় কথা।

কেনটন বলে, তোমার জন্য কিছুটা মাংস রেখে দিয়েছি আলেন। চমৎকার নুন দেওয়া শূয়োরের মাংস। আমি গরম করে খেয়েছি।

বড্ড খিদে পেয়েছে। আমি বলি। খানিকটা মাংসের জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করছে। মাংসটুকু নিয়ে আমি খেয়ে ফেলি। কেনটন আমাকে খানিকটা জল খেতে দেয়। একটা লোকের যতটা দরকার তার চাইতে বেশী মাংসই আছে। মনে হয়, ওরা সামান্য কিছু খেয়ে বেশীটা আমার জন্য রেখে দিয়েছে। খাবার সময় ওরা আমার দিকে চেয়ে থাকে কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

বেশ ভাল মাংস। আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি। চমৎকার নুন দেওয়া শূয়োরের মাংস।

চার্লি বলে, বোস্টন রাউণ্ড নামে একরকম শূয়োরের মাংস আছে, মুখে দিলে মাখমের মত গলে যায়।

মোহকের লোকেরাও ভাল একরকম মাংস তৈরী করে।

বোস্টনের শূয়োরের মাংস দেশগাঁয়ের শূয়োরের মাংসের চাইতে

অনেক ভাল—এ আমি হলপ করে বলতে পারি। অজ পাড়াগাঁয়ের লোকেরা ভাল করে থাকতে জানে বলে বড়াই করলে আমার হাসি আসে। ধাড়ী ধাড়ী লোক, অথচ নিজের নামটা পর্যন্ত সই করতে জানে না। বুনো রেডদের সঙ্গে এদের তফাৎ কি?

আলেন পাড়াগেঁয়ে ছেলে কিন্তু সে লেখাপড়া জানে। কেনটন বলে।—লেখাপড়া শেখাটা খুব ঝামেলার কাজ নয়। কিন্তু আমার বরাবরই লেখাপড়ার পর একটা ঘেন্না ছিল।

চার্লি হেসে ওঠে। আমি খাওয়া শেষ করে পাত্রটি একপাশে সরিয়ে রাখি। তারা আমার দিকে তাকায়; তবু কোন প্রশ্ন করে না। ফাঁসির কথা ভুলে যে কি ভাবে এমন করে হাসি-গল্প করতে পারে—ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই। আমার বলতে সাহস হয় না।—বুঝতে পারছি না কি করে বলব।

আগুনের বাক্স থেকে একটা রাঙাটে আভা আমাদের মুখে হরেক রকম দাগ সৃষ্টি করেছে···আগুন ধরিয়েছে কেনটনের দাড়িতে। আমি আমার দাড়ি ও খাটো কোঁকড়ান চুলে হাত দিই। আস্তে আস্তে আঙুল দিয়ে আঁচড়াই। চার্লি আমার বাহুতে হাত দেয়। শান্তভাবে বলে, মৃত্যুকে আমরা উপহাস করিনি আলেন, শুধু ভয় তাড়াতে চেয়েছি।

তোমাকে পাঠান উচিত হয়নি আলেন। কেনটন বলে।—এই ভাবে না খেলিয়ে ব্যাটারা ফাঁসি দিয়ে সব চুকিয়ে দিলেই তো পারে।

হ্যামিলটন আমাদের বাঁচাতে চেয়েছে। আমি বলি।—যা করা সম্ভব, সবই করেছে। ওয়াশিংটনের কাছে সে আন্তরিক আবেদন জানিয়েছিল।

ওয়াশিংটনের মত কঠোর লোক আমি দেখতে পারি না। চার্লি বলে।

সত্যিই কঠোর।

আলেন যাবার সময়েও তেমন কোন আশা আমি করিনি।

কি হল আলেন?

আমাদের মরতেই হবে?

তখন আমি ধীরে ধীরে বলি, একজনকে মরতে হবে। কে মরবে আমাদের ঠিক করতে হবে। বাকী দুজনকে চাবুক মেরে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু একজনের ফাঁসি হবেই।

ওরা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকায়, একজনকে?

আমি ওদের দিকে তাকাতে পারি না। মাথা ঝেঁকে চীৎকার করে উঠি, আমি কিছু করিনি। ভাবছ হয়ত তোমাদের সঙ্গে মরবার সাহস আমার নেই!

আমরা জানি আলেন! কেনটন বলে।—তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আলেন! তার গলায় একটা পূর্ণ স্বস্তির ভাব ফুটে বেরোয়। কথা বলবার সময় মুচকি হাসে। এ হাসি পরিতৃপ্তির।

চার্লি কোন্দুলে গলায় বলে, দুজনকে ছেড়ে দিল কি বলে? এ কি করে হল আলেন?

আমি তখন সব কথা খুলে বলবার চেষ্টা করি। কি কি হয়েছে সব জানাই। বলতে বলতে আমার কান্না আসে। দেখি, ফুঁপিয়ে কাঁদছি।

ঠিক আছে। কেনটন বলে।—কান্নার কিছু হয়নি আলেন।

তোমরা ভাবছ, এ আমার কাজ। ভাবছ, আমি বাদ পড়তে চেয়েছি। শুধু তোমাদের একজন মরবে। ভাবছ, ফাঁসিতে মরবার সাহস আমার নেই। তাই রেহাই পাবার জন্য এই সোজা পথ বেছে নিয়েছি। বলেছি, দুজনের হয়ে একজন মরবে। নিশ্চয় একথা ভাবছ তোমরা। না হলে কেন অমন করে চাইছ আমার দিকে?

আলেন, আলেন—শান্ত হও!

আমি ভয় পাইনি।

আলেন, তোমাকে ব্যথা দেবার কোন ইচ্ছাই আমাদের নেই।

তোমরা আমাকে ঘৃণা করছ।

আলেন, আমাদের দুজনের প্রাণ বেঁচে ভালই হয়েছে। ফাঁসিতে মরা বড় ভয়ানক। এ সম্পর্কে ভাবা বা স্বপ্ন দেখা বড় বিভীষিকাময়।

আমি তখন ক্ষীণকণ্ঠে বলি, কে মরবে? কে মরবে তিনজনের মধ্যে।

তিনজনেই চুপ করে বসে থাকি—পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। সহসা চার্লি উঠে দাঁড়ায় এবং হনহন করে দরজার কাছে গিয়ে কবাটের পর দমাদম ঘুষি মারতে থাকে। তার ঘুষির চোটে দরজা কেঁপে ওঠে। তখন সে কবাটে ঠেস দিয়ে হাঁপাতে থাকে।

হাত ছড়ে যাবে চার্লি, চলে এস। কেনটন অনুনয় করে।—ফিরে এস চার্লি!

জাহান্নামে যাক ব্যাটারা! একি জানোয়ার নিয়ে খেলছে নাকি? আমরা কি আর মানুষ নই যে জানোয়ারের মত দগ্ধে মারবে!

চলে এস!

চার্লি ফিসফিস করে বলে, আমিই বয়সে বড়। আমার বয়স ত্রিশ বছর।

সে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। কয়লা প্রায় পুড়ে গেছে—আগুন নিভুনিভু। সেই স্তিমিত আভায় দরজার কাছে দাঁড়ান চার্লিকে একটা আকারহীন কালো ছায়ার মত দেখায়। আমি সেই কালো মূর্তিটির দিকে তাকাই। মানুষের কোন লক্ষণ নেই তার মধ্যে—যেন ভয়ের প্রতিমূর্তি! এক একবার মৃত্যুর শঙ্কায় আঁৎকে উঠছে, আবার সে আতঙ্ক কেটে যাচ্ছে। আমার তখন কিছুদিন আগেকার

একটি বেঁটে মোটাসোটা মানুষের কথা মনে পড়ে। ছাপা-খানায় কালিমাখা আঙুল নিয়ে সে বোস্টনে আমাদের রেজিমেণ্টে যোগ দেয়। ছোট্ট একটি গোঁফ ছিল তার…লাল গাল…মাথায় পালক লাগান কালো টুপি…গায়ে কালো কোট…নীল চোখ। রেজিমেণ্টে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের উপহাস ও ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়ে। শিকারীর সবজে কোট-পরা দেশগাঁয়ের লোক দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যেত। তার সঙ্গে ছিল হাতির হাড়ের কাজ করা একটি মাস্কেট। যত্ন করে রাখবার মত ছোটখাটো ভারি সুন্দর বন্দুকটি। পল রিভারির তৈরী একটি নস্যের কৌটোও ছিল সঙ্গে। লেসের কাফ পড়ত লোকটি—চেষ্টা করত ফুল বাবু সাজবার, কিন্তু বাবু না বলে তাকে ট্রল (১) বলাই ভাল। দরজার সামনে দাঁড়ান লোকটির দিকে চেয়ে বার বার আমার সেই মানুষটির কথা মনে পড়ে…কালো ছায়ামূর্তিটির মধ্যে খুঁজি সেই বছর কয়েক আগেকার মানুষটিকে।

আমার বয়স তিরিশ বছর। আবার বলে চার্লি।—তিনজনের মধ্যে আমিই বড়। তারপর সে আমাদের দিকে ফিরে আসে এবং ধপ করে মেজেয় বসে একদৃষ্টে আগুনের দিকে চেয়ে থাকে। বেঁটে শীর্ণ দাড়িওলা নোংরা মানুষ।

আমাদের জন্য তুমি ফাঁসি যাবে, না চার্লি? আমাদের জন্য মরতে কোন ভয় করবে না তো? কেনটনের কণ্ঠস্বর মোলায়েম ও রহস্যময়। দুনিয়ার পরম বিস্ময় যেন লুকান রয়েছে তার কণ্ঠে।

ফাঁসিকাঠে মরতে ভারি ভয় করে আমার। বেদম ভয় হয়। অকপটে বলে চার্লি।

তুমি তো সাহসী লোক হে। কেনটন বলে।

সাহসী হবার ধরন আলাদা। কোনদিক থেকেই আমি সাহসী

(১) স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত দিলদরিয়া কিন্তু কুচুটে বামন।

নই। ভাবছি, আজকে এলি যদি এখানে থাকত তো তার বদলে কোন কমবয়সীকে সে মরতে দিত না।

অদ্ভুত লোক এলি। ভয়ের বালাই নেই।

চার্লির মুখে হাসি হাসি ভাব ফুটে বেরুতে চায়। ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসিরেখা ফুটে ওঠে—আস্তে নড়তে থাকে ঠোঁট দুখানি। এগিয়ে এসে সে আমার হাত ধরে। আমি তার দিকে তাকাতে পারি না। সে আমাকে ধরেই থাকে। বলে, অনেক পথ—অনেকটা পথ একসঙ্গে মার্চ করেছি। হা খ্রীস্ট, তিনজনেই আমরা ভাইয়ের মত!

কেনটন বলে, আর কোন ভয় নেই আমার। সঙ্গী জুটবে—ভাল সঙ্গীই পাব। ঘৃণাভরে আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে এমন লোক আর নেই। কেউ আর বলবে না, যে-লোক ফাঁসিতে মরে সে আমাদের সঙ্গী হবার যোগ্য নয়।

আমরা লটারি করব। মরিয়া হয়ে আমি বলি।

না, লটারি হবে না।

কেন? আর ভয় নেই আমার। ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, আর আমি ভয় করি না। আর কোন ভয় করি না…

এ ভয়ের কথা নয় আলেন। কেনটন শান্ত ভাবে বলে।—বেঁচে থেকে একথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারব না যে আমার বদলে তুমি প্রাণ দিয়েছ। মোহকে ফিরে গিয়ে একথা কিছুতেই বলতে পারব না যে আমাকে বাঁচাবার জন্য একুশ বছরের আলেন হেল ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছে।

কিন্তু আমি ফিরে গিয়ে…

আলেন, আমিই লোকটাকে গুলি করেছি। ভগবান ও যীশুর নামে শপথ করে বলতে পারি, আমিই মেরেছি তাকে। বন্দুকে তাক করে আমিই ইচ্ছে করে তাকে খুন করেছি। তার মৃত্যুর পাপ

আমার—তার খুনে আমার হাত রঞ্জিত। আমার পাপের জন্য অন্য কোন লোক যদি দুঃখবরণ করে, তাহলে কোনদিনই কি আমি শান্তি পাব আলেন ?

মিথ্যে কথা বলছ তুমি। ফিসফিস করে বলে চার্লি।—আমি তোমার পাশেই ছিলাম, কোন ডাক তুমি করনি।

চার্লি তার পকেট থেকে একটা মুদ্রা বার করে। ময়লা একটা শিলিং। বার বার সে মুদ্রাটি উলটাতে থাকে। বলে, তুমি জোয়ান লোক কেনটন। ভালবাসতে বা ঘৃণা করতে তোমার মত লোক মেলা ভার। আর আমরা তর্ক করব না।

রাজার মুণ্ডু পড়লে তুমি বাঁচবে।

বেশ।

মুদ্রাটি তখন সে এমন ভাবে শূন্যে ছোড়ে যাতে সেটি আগুনের বাক্সের উপর পড়ে। কিন্তু কেনটন মুদ্রাটি শূন্যেই ধরে ফেলে। আঙুল দিয়ে কয়েক মুহূর্ত নাড়াচাড়া করে সে ঘরের অন্ধকার কোণে মুদ্রাটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমি টেনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। কেনটন তখন হাসছে।

এ তোমার ভারি অন্যায় কেনটন। চার্লি বলে।

বাঁচা-মরার প্রশ্ন নিয়ে মুদ্রাক্ষেপণ ছেলেখেলা। কোন মানুষ মনে মনে যদি মরতে চায় তো···

কিছুতেই তোমাকে আমি মরতে দিতে পারি না।

কেনটন তখন চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে বলে, উত্তরে যাবার পরিকল্পনা আমিই ঠিক করেছি ; আমার পরিকল্পনার জন্য আর কাউকে আমি শাস্তি পেতে দেব না।

এ দৃশ্য আর আমার সহ্য হয় না। হাতে মুখ চেপে আমি ফোঁপাতে শুরু করি। ওরা আমাকে থামায় নি। আগুনের কাছ থেকে সরে গিয়ে আমি সটান মেজেয় শুয়ে পড়ি।

খানিক বাদে কেনটন আমার কাছে আসে। হয়ত ঘণ্টা খানেক কি তুঘণ্টা বাদে। আগুন প্রায় নিভে এসেছে। স্তিমিত আভা বেরুচ্ছে আগুনের বাক্স থেকে। হাঁটু ভেঙে বসে কেনটন আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে। ফিসফিস করে ডাকে, আলেন।

আমি জবাব করতে পারি না।

আমার কোন ভয় নেই আলেন। আমি হলপ করে বলছি ফাঁসিতে মরতে কোন ভয়, কোন লজ্জা বা অনুশোচনা আমার নেই।

আমায় একলা থাকতে দাও। আমি চেঁচিয়ে উঠি।

তবু সে কথা বলে যায়। তার কণ্ঠস্বর সহজ ও শান্ত।

আলেন, বারো তেরো বছর আগে একদিন তুমি আমার বিরুদ্ধতা করেছিলে। সেজন্য আমি তোমায় বেদম মেরেছিলাম। তোমার চাইতে আমি তখন মাথায় ফুটখানেক ঢ্যাঙা। সেদিন তুমি হলপ করেছিলে যে মারের কথা তুমি ভুলবে না···

আমি নিশ্চল হয়ে থাকি। কেনটন তখন দূরে সরে যায়। হাতড়ে আমি তাকে খুঁজি এবং তার বাহুবন্ধনে পড়ে থাকি। আর একটি ছায়া এগিয়ে আসে। চার্লি গ্রীন এসে বসে আমাদের পাশে।

তোমার কাছে ক্ষমা চাইব ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে তোমাকে আমার বারুদ রাখার শিঙ্‌টা দিয়ে যাব।

তারপর তিনজনেই এক সাথে বসে থাকি। আর কোন কথা হয় না। গরম হবার জন্য আমরা জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকি।

—পনেরো—

কেনটন বিদায় নেয়। আবছা সকাল। বড় বড় বরফের ফালি ঝরে পড়ছে ধীরে ধীরে। চালির মুখ বেদনা কুঞ্চিত। চোখের জলের ধারায় গালের ময়লা ধুয়ে যায়। কেনটনের দিকে কিছুতেই সে তাকাবে না। একদৃষ্টে মাটির দিকে চেয়ে আছে মাথা হেঁট করে। মাঝে মাঝে হাত মুঠ করছে আর খুলছে। অস্থিরভাবে নড়ে উঠছে কখনও···কাঁপছে।

কেনটনের মুখ থেকে দুশ্চিন্তা লোপ পেয়েছে। হ্যামিলটনের দেওয়া লম্বা মাটির পাইপটি টানছে আর আমাদের দিকে নীলচে ধোঁয়া ছাড়ছে। কেনটন বলে, তুমি একলাও যদি মোহকে ফিরে যাও আলেন, তাহলেও ওরা টের পাবে না তো যে আমি ফাঁসিতে মরেছি?

কোন দিন টের পাবে না।

লজ্জার জন্য বলছি না আলেন। একে আমি লজ্জার কথা বলে মনে করি না। কিন্তু লোকে একে কলঙ্ক বলে মনে করতে পারে।

আমি মাথা নেড়ে তাকে অশ্বাস দিই···চোখ মুছে হাত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরি। আমরা বেরিয়ে যাই। কেনটন ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। হাত নেড়ে সে আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানায়।

হ্যামিলটন এবং কেল্লার কমাণ্ডার বাইরে অপেক্ষা করছে। হ্যামিলটন আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। চারজন প্রহরী আমাদের পেছনে দাঁড়ায়—একটি ভেরী বাজিয়ে সামনে যায়। আস্তে আস্তে ভেরী বাজতে সুরু করে। ভেরীর উপর বরফের ফালি ঝরে পড়ছে—ছিটকে যাচ্ছে কাঠিতে লেগে। চালি আমার পেছনে। পা টেনে টেনে এগোচ্ছে কোনমতে। কেনটনের কাছে ফিরে যাবার, তার সঙ্গে

থাকবার একটা পাগলা খেয়াল আমায় পেয়ে বসে। চার্লির দিকে তাকাই। তার চোখেও ব্যগ্রতার ছবি দেখতে পাই। সে মাথা ঝাঁকাতে থাকে।

ব্যাপটিস্ট রোড দিয়ে মার্চ করে এগোচ্ছি। তারপর গ্রাণ্ড প্যারেডে পড়ে চাবকাবার খুঁটোর দিকে যাই। আরও জোরে বরফ পড়ছে এখন। তুষারপাতের মধ্যে পেনসিলভানিয়ার সৈনিকদের ছায়ার মত দেখায়। মাথা হেঁট করে তারা মার্চ করে যাচ্ছে এবং সার বেঁধে দাঁড়াচ্ছে।

তুষারপাতকে গালি পাড়ছে তারা—গালাগালি দিচ্ছে আমাদেরও।

এমনি দিন বেছে নিলি কেন বেজন্মা ভুত যত! চীৎকার করে বলে তারা।—এমন নচ্ছার দিনে কাউকে বাইরে আনতে আছে?

তারা আমাদের ঘিরে দাঁড়ায় খুব বেশী উৎসাহী বলে মনে হয় না। শীত ও বরফের জন্যই অস্থির! কাঁপছে হিহি করে। গায়ের কাছাকাছি মাস্কেট ধরে আছে···বগলে হাত দিয়ে আছে গরম হবার আশায়। বাতাসের ঝাপটা এড়াবার জন্য তারা মাথা হেঁট করে আছে। সৈনিকের চেহারা এদের নয়, এমনকি মানুষের মতই দেখায় না! আমি এলিকে খুঁজি। কিন্তু দাড়িওলা ছেঁড়া জামা-কাপড় পরা লোকের কি আকাল আছে? সবাইকেই প্রায় এক রকম দেখায়। বরফের ঘুর্নিপাকে হারিয়ে যায় তাদের পরিচয়।

ঘোড়ায় চড়ে সেনানীরা এগিয়ে আসে। উবু হয়ে পাশাপাশি ছুটছে। সামনে পেছনে ছুটা-ছুটি করে পিটে তারা সৈনিকদের সার বেঁধে দাঁড় করায়। আঁটসাট ভাবে ক্লোক জড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন ওয়েন। ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে তার সারা গায়ে, তার বাহনের উপর।

সহসা জোরসে ভেরী বেজে ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে বাজনার

শব্দ মিলিয়ে যায়। তখন শুধু লোকজনের চাপা কলগুঞ্জনেই নীরবতা ভাঙছে। প্যারেডের মাঠ বহুদূর অবধি ছড়িয়ে আছে। বরফ-ঢাকা বরফের দেয়াল দিয়ে ঘেরা বিস্তীর্ণ সমতল মাঠ। একটি লোক আবৃত্তি করছে: খালি পিঠে বিশ ঘা চাবুক মারতে হবে, বেইজ্জতির জন্য…। চার্লি আমার খানিকটা আগে। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বার বার মাথা ঝাঁকাচ্ছে সে। কেনটন আছে কয়েদখানায়—একলা। নিঃসঙ্গতার মধ্যে ডুবে আছে বেচারী। আবার আস্তে আস্তে ভেরী বেজে ওঠে। এ যেন ভিখারীদের বল নাচের আসর—নাচ হবে ভিখারীদের। আমি যেন নাচছি বেসের সঙ্গে। বরফের পর্দার ওধারে মস্ত বড় একটি দল রয়েছে যেন। বেস আছে তার স্বামীর সঙ্গে। সে কি আমাকে ভাল বেসেছে, না ভালবেসেছে তার স্বামীকে? এ কি কেনটনের ভালবাসার মত? পুরুষের ভালবাসা না নারীর ভালবাসা?

আমাদের জামা-কাপড় খুলে ফেলে! আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। শীত ও ব্যথার ভয়ে প্রাণ শিউরে ওঠে। এই একই ভয়ে কেনটন মৃত্যু বরণ করেছে। কেনটনের জায়গায় যদি আমি হতাম?

চার্লিকে লক্ষ্য করছি। খোসার মত তার ছেঁড়া জামা খুলে ফেলা হয়। বোস্টনের নাদুসনুদুস লোক ছিল চার্লি। গোলগাল মোটাসোটা চেহারা। অজ পাড়াগেঁয়ে লোক নিয়ে গড়া রেজিমেণ্টের সৈনিকদের তামাসার জিনিস ছিল তার চেহারা। শিকারীর সবজে শার্টপরা লম্বা লম্বা লোক বেরিয়ে আসছে মোহক থেকে। নিজের হাতে-বোনা কাপড় দিয়ে শার্ট সেলাই করছেন মা; আর আমাকে নিষেধ করছেন যেতে। আবাদ হয়ে গেছে। আসছে শীতেই ফিরে আসব। লড়াই খতম হয়ে যাবে। গোটা দেশ সশস্ত্র বিদ্রোহ করবে। তাহলেই খতম হয়ে যাবে লড়াই। চার পাঁচ মাসের ব্যাপার। বড়জোর মাস দশেক লাগতে পারে।

ওরা চার্লির পিঠ খুলে ফেলে। আমার পিঠও খোলা হয়। শীতে কাঁপতে শুরু করি। গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। মনে হয়, রক্ত জমাট বেঁধে আসছে।

চাবুকে শরীর গরম হবে...

চার্লির মাংসের মধ্য দিয়ে হাড় বেরিয়েছে। টান চামড়ায় মোড়া হাড়। গায়ে সারা শীতের জমাট ময়লা। কিন্তু বরফে গা ধুঁয়ে দেবে। দাঁতে দাঁত চেপে আমি ঠোঁট কামড়ে ধরি। চামড়ার পর বরফ গলছে। ভেজা জায়গায় বাতাস লাগতেই ছুরি দিয়ে কাটছে বলে মনে হয়।

আমাদের তখন পাশাপাশি ছুটো খোঁটায় বেঁধে দেওয়া হয়। খোঁটার মাথায় এক একটি লোহার আংটি ঝুলান। হাত বেঁধে তার সঙ্গে আমাদের লটকে দেয়। চার্লির দেহটা চামড়া ছাড়ান মুরগীর মত দেখায়। বেদম হাসি আসে আমার। শীতের বড় ভয় কেনটনের! সে কয়েকখানাতেই আছে।

অতিকষ্টে মোড় ঘুরে আমি সৈনিকদের দেখতে চেষ্টা করি। জামা কাপড় পরে বেশ গরমেই আছে। গরম...

পয়লা চাবুক পড়ে। চার্লি পা মোচড়ায়। আমার মনে হয় যেন চামড়ার উপর দিয়ে ছুরি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তেমন যন্ত্রণা বোধ করিনা। শীতের তুলনায় এ যন্ত্রণা কিছুই নয়। শীত আমাকে ঘিরে এমন প্রাচীর সৃষ্টি করেছে যে তার মধ্য দিয়ে কিছুই প্রবেশ করতে পারে না। বেস যদি আমার পাশে শুত তো তার উত্তাপে গা বেশ গরম হত। বেস আস্তানায় আছে। না তো, মারা গেছে। এখন আমি কেনটনের সঙ্গিনীকে নিতে পারি। কেনটনও মরে গেছে বল্লেই হয়। আস্তানায় ফিরে কেনটনের সঙ্গিনীকে দিয়ে শরীর তাতাব।

আবার একটা—তৃতীয়—চতুর্থ। তাজ্জব হয়ে আমি চার্লি'র পিঠের লাল দাগগুলোর দিকে তাকাই। শীত এত বেশী যে রক্ত ঝরছে না।

আমার পিঠেও অমনি দাগ পড়েছে নাকি? খালি পিঠের মাঝে মাঝে লাল দাগ! চাবুকের চতুর্থ ঘায়ে চার্লি'র মুখ থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরোয়। জানোয়ারের মত চাপা একটা গোঙানি। তার বাঁধা হাত মোচড়াতে থাকে। পঞ্চম ঘায়ে পিঠের ময়লার উপর রক্ত গড়িয়ে পড়ে। খুনে ধুয়ে যাবে পিঠের ময়লা।

নিজের পিঠেও যন্ত্রণা বোধ করি। সামান্য বেদনার অনুভূতি। আমার চারিদিকের শীতের প্রাচীর ভেঙে গেছে। আগুনের মত গা পুড়ে যাচ্ছে। জ্বলুনি ও শীত একই সঙ্গে। আমার আর্তনাদ ভিন্ন-লোকের আর্তনাদের মত মনে হয়। এ যেন আমার নিজের আর্তনাদ নয়। আর চাবুকের ঘা গুনতে পারি না।

হয়ত অষ্টম কি দশম ঘা হবে! চার্লি'র পিঠের মাংস আর মানুষের মাংসের মত দেখায় না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কি? চোখের উপর একটি মোচড়ান মূর্তি ভাসছে। না হয় কিছুই দেখছি না। পালাতে চেয়েছিলাম আমরা…রওনা হয়েছিলাম সুদূর মোহক উপত্যকার দিকে…তিনজনে একসঙ্গে বরফের উপর দিয়ে চলেছি। চতুর্থ সঙ্গী বেস। মেয়ে হলেও পাকা হাঁটিয়ে। মেয়েদের শক্তি বসুন্ধরার শক্তির মত। বেস আমায় আঁকড়ে ধরে। কেঁদে বলে, কি করেছি আমরা? দোহাই ভগবানের, বল না আলেন কি করেছি আমরা?

তখন বুঝতে পারি, এ চার্লির কণ্ঠস্বর। বুঝতে পারি, শুনবার ও বুঝবার মত বোধশক্তি তখনও লোপ পায়নি। আমি তাকে বলব, টেবিলের চারপাশে বসা সেনানীরা একযোগে এই ন্যায়দণ্ডের ব্যবস্থা

করেছে। বড় মুখওলা বড় একটা লোক পল্টনের কথা বলে। পরিখায় বসে সৈনিকেরা আলোচনা করে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে জুয়া খেলছেন তিনি। তাছাড়া আর কোন কারণ নেই। বড় ঝুঁকি নিয়ে খেলছেন বলেই তাঁকে ফাঁসে গলা দিতে হয়েছে। হাজার হাজার মাইল জোড়া বন-কান্তার ভরা বিশাল রাজ্য গড়া হবে। জেকব জানে। বার বার তো সেকথা বলেছে আমাদের। নাইট ক্যাপ পরে টেবিলের পাশে বসে আছেন ওয়াশিংটন। লোকটা কি হ্যামিলটনকে ভালবাসে? কে এই হ্যামিলটন?—মেয়েদের মত বেগনি চোখ কেন তার?

ততক্ষণে পনেরো ঘা পড়েছে। না বেশী? অনেক বেশী। বিশ তিরিশ ঘা দেবে। এখন আর ব্যথা নেই। পিঠে হাতুড়ির ঘা পড়ছে আর ফুসফুসে এক ক্রূর বেদনা অনুভব করছি। তবু পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছি। চার্লি ঝুলে পড়েছে। আর কোন ব্যথা বোধই তার নেই। মুক্ত সে। গান লেখার মত কথা বটে। বাংকার পাহাড়ে আমরা ভড়কে গিয়েছিলাম কিন্তু মুক্তির কথা বলে সাহস সঞ্চয় করি। সব সময় মুক্তির কথা। ব্রিটিশরা এগিয়ে আসে…টকটকে লাল কোটপরা দলে দলে লোক আসে মার্চ করে। ভেরী বাজিয়েরা ইয়াংকি ডুডল গানের সুর বাজায়: টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে ইয়াংকি বাবু গেলেন লণ্ডনে। ঢেউয়ের মত এগিয়ে আসে তারা। বিউগল বাজায় 'হটস্টাফ' গানের সুর। ফৌজদারদের খোলা তরোয়াল রোদে ঝিকিয়ে ওঠে। মাস্কেট ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাব বোস্টনে… লুকিয়ে থাকব চার্লির ঘরে। বুড়ো পুটনাম বলেন, ফায়ার! বেজন্মা লাল ব্যাটাদের আচ্ছা করে লাগাও। তাহলেই আমরা স্বাধীন হব—মুক্ত হব।

জোরালো গলায় কে যেন বলে ওঠে, বিশ! বাঁধন কেটে দাও।

চার্লিকে আগে খোলা হয়। বরফের পর নেতিয়ে পড়ে সে—একদলা মানুষের মাংস যেন। সারা পিঠে কাটা ছোঁড়ার দাগ…রক্ত ঝরছে অনবরত। পড়ে গেছে তো পড়েই আছে…একদম নড়াচড়া করছে না। আমি কিন্তু খাড়া হয়ে দাঁড়াই। হা ভগবান, কি শক্তি আমার! ঠিক খাড়া হয়ে আছি! হাত নাড়াচাড়া করে আমি হাত দুখানা ছড়িয়ে দিই। কেনটন আমার দিকে তাকায়। এই কাটা ছেঁড়া রক্তাক্ত অবস্থাতেও ঠিক মাথা খাড়া করে আছি। আমার হিম্মত নেই?

ব্রিগেডস্—এটেনশন!

তখনও আমি হাত নাড়াচাড়া করছি।

ব্রিগেডস্—মার্চ!

একপা দুপা করে আমি চার্লির দিকে যাই! তার উপর উবু হয়ে দেখি বরফ খুনে লাল হয়ে গেছে। ডাকি—চার্লি!

কোন সাড়া নেই।

চার্লি, আমাদের সাজা হয়ে গেছে। ওঠো!

চার্লি, ওঠো!

আবার বলি —হা যীশু খ্রীস্ট!

এলি আমার দিকে এগিয়ে আসে। বুড়ো মানুষ এলি। এমন ব্যথাতুর মুখ তার কোনদিন দেখিনি। তার দিকে ফিরে ডাকি, এলি!

সে আমায় জামা কাপড় পরিয়ে দেয়। ছেঁড়া জামা কাপড় এক একটা করে কুড়িয়ে সে গায়ে পরিয়ে দেয়।

আমার ঠাণ্ডা লাগছে না এলি।

সে আমায় কোট পরতে সাহায্য করে। তার পর এগিয়ে যায় চার্লির দিকে। আমি তার পেছু পেছু যাইনি। যেখানে আছি সেই খানেই দাঁড়িয়ে থাকি। উৎসুকদৃষ্টিতে তাকাই চারদিকে। কিছু

লোকজন জমেছে—লক্ষ্য করছে আমাদের। ফৌজদাররা তাদের তাড়া করে। দুচারটে পলাতক বরফের পর মরে থাকে তো কচু হবে! ঘোড়া ছুটিয়ে একটি ফৌজদার এলির কাছে আছে। এলি চোখ তুলে তাকায়। ফৌজদারটির মুখের কথা মুখেই রয়ে যায়। আমি তখন এলির দিকে এগোই।

ওকে ধরে নিয়ে যেতে হবে। এলি বলে।

চার্লি আমার দিকে তাকায় এবং হাসবার চেষ্টা করে। আমি এবং এলি দুজনে দুইহাত ধরে তাকে দাঁড় করাই।

কেনটনের বদলে আমারই থাকা উচিত ছিল। ফিসফিস করে বলে চার্লি।

এ ধাক্কা আমি সামলাতে পারব না।

আস্তানায় ফিরবার পথের যেন অন্ত নেই। গুটিগুটি পা ফেলে চলেছি। আমাদের সামনে ঝরে-পড়া বরফের প্রাচীরের ওধারে সৈন্যদল অদৃশ্য হয়ে যায়। পা টেনে টেনে চলেছি আমরা; কিন্তু এ তুষার-প্রাচীরের যেন শেষ নেই। সব সময় একটা না একটা সামনে রয়েছে।

চার্লিকে বয়ে নিতে হচ্ছে। আমাদের উপর ভর করে সে কোনমতে খুঁড়িয়ে চলছে। কয়েক পা এগিয়েই জিরোবার জন্য থামতে হয়।

আমার ভয় হচ্ছে, ঠাণ্ডা লেগেই শেষে মারা না যায়।

আমরা পাহাড়ে চড়ি। পেনসিলভানিয়ার জনকয়েক লোক ছিল সেখানে। তারা আমাদের সাহায্য করে। অবাক হয়ে তারা আমার দিকে চেয়ে থাকে। সত্যিই তো, এখনও আমি যে হাঁটা-চলা করতে পারছি, কথা বলছি—এ আশ্চর্যের ব্যাপার বই কি!

চাবুক খেয়ে হাঁটা-চলা করতে পারে এমন লোক কচিৎ মেলে। ওদের একজন প্রশংসা করে বলে।

সত্যি, এমন জোয়ান কচিৎ মেলে।

যে বেজায় ঠাণ্ডা দিনে চাবুক মারল! অবাক কাণ্ড!

ওরা তখন ধরাধরি করে চালিকে পরিখায় নিয়ে যায় এবং একটা বাঙ্কের পর শুইয়ে দেয়। এলি ঢোকে। আমি তার পেছু পেছু আসি। আমি খুব কাহিল হইনি। জেকব এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমার দিকে তাকায় নি। দুটি মেয়ে এখনও আছে। স্মিথ কুঁজো হয়ে বসে আছে একটা বাঙ্কে। কারা যেন তার মুখে এক কুৎসিত মুখোস পরিয়ে দিয়েছে। হেনরি লেনকে দেখছি না। মারা গেছে বোধহয়।

পেনসিলভানিয়ানদের একজনে বলে, সুন্দরপনা যে ছেলেটি হরিণ মেরেছিল সে কোথায়?

আমি হাসতে শুরু করি। সহসা শীতে গা কেঁপে ওঠে টলতে টলতে আগুনের কাছে গিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ি। শরীরের সামনের দিকটা শীতে কাঁপছে কিন্তু পিঠ জ্বলে যাচ্ছে বেদনায়।

কেনটন কোথায়? মেয়েদের একজন জিজ্ঞাসা করে।

হামাগুড়ি দিয়ে একটা বাঙ্কে উঠে দু'হাতে মুখ চেপে আমি কাঁদতে শুরু করি। এলি আমার কাছে আসে। ঝুঁকে বলে, এখুনি আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি আলেন।

তাতে কি হবে?

এখুনি নিয়ে আসছি।

যন্ত্রণায় আমি গড়াগড়ি করতে থাকি। কাঠের বিছানায় পা দাপাদাপি করে আঙুল থেতলে-ছড়ে যায়। একটি মেয়ে আমায় এক বাটি জল এনে দেয়। বলে—এই নাও, খাও।

এক নিঃশ্বাসে জলটা খেয়ে ফেলি। ঘুমোবার চেষ্টা করি, ভুলে থাকবার চেষ্টা করি, কিন্তু কোন মতেই স্বস্তি পাই না। বেদনার জ্বালা কমে না কিছুতেই। তখন ফিসফিস করে ডাকি, এলি!

সে বাইরে গেছে ছোকরা!

জেকব...

আমি ঘাড় তুলে তাকাই। আমরা ঘরে ঢুকবার সময় তাকে যেখানে দাঁড়ান দেখেছি সেইখানেই সে দাঁড়িয়ে আছে।

জেকব, অনেক সাজা পেয়েছি, এখনও ঘৃণা করবে আমাদের?

তবু সে নড়ে না বা তার মুখে কোন পরিবর্তন হয়না।

আমায় ক্ষমা কর জেকব। কেনটনকে প্রাণ দিতে হবে।

আমরা যুদ্ধরত জাতি। ঠিক সাজাই হয়েছে...

আমি কঁকিয়ে উঠি...দুহাতে মুখ চেপে ডুকরে কাঁদতে থাকি।

তারপর অনেকক্ষণ কেটে যায়। কিম্বা সময় বেশী না হলেও যন্ত্রণার জন্য দীর্ঘ বলে মনে হয়। এলি ডাক্তার নিয়ে ফিরে আসে। নিশ্চয়ি আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন হুঁস হয়, দেখি ওরা আমার জামা কাপড় খুলছে। ডাক্তার বলছে, সভ্য—এই তো ওদের সভ্যতা! এই জন্য তো যুদ্ধ করছে! পিঠটার দিকে তাকাও!

ওরা দল ছেড়ে পালিয়েছিল। জেকব বলে।

পলাতক! এখানে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক থাকতে চায়? আমাদের কারও মাথা ঠিক আছে? আটশো লোক আমার হাসপাতালে কসাইখানার মাংসের মত পাঁজা করা আছে। উলংগ—শীতে অসাড়—ক্ষুধার্ত। অক্লেশে আমি হাত পা কেটে ফেলছি। আমি তো ডাক্তার নই—কসাই—পরামাণিক—হাতুড়ে। কোন ডাক্তার নেই এখানে। মিথ্যে...সব মিথ্যে...বানান কথা। কিছু জানিনে আমি। শুধু রক্ত ঝরাই...অসাড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলি। তেমন মরছেও। পিঁপড়ের মত মরছে। মানুষ যদি পিঁপড়ের মত, বুনো জানোয়ারের মত মরেই গেল তো কি হবে তোমার আদর্শ দিয়ে? আমার অবস্থাও আর দশজনের মত। অজ্ঞানের রাজ্যে বসবাস করছি

আমরা। যারা মরছে, মরতে দাও। আমি বাঁচাবার চেষ্টা করি না তো! মরে গেলে বেঁচে যাবে!

গরম জল দিয়ে সে আমার পিঠ ধুয়ে দেয় এবং তারপর ঘষেঘষে চর্বির মত একটা মলম মাখিয়ে দেয়।

ঠিক হয়ে যাবে তো? উৎকণ্ঠিত এলি জিজ্ঞাসা করে।

এটা জোয়ান আছে। ওঃ, জোয়ান লোকে যে কত সহ্য করতে পারে! বাকীজনের কথা বলতে পারি না। আগে দেখেনি!

ঘাড় বাঁকিয়ে দেখি, ওরা চার্লির দিকে যাচ্ছে। সবল পাকা হাতে কাজ করে যায় ডাক্তার। ঐ হাত দুটোই এখনও একই রকম আছে। বাকী আর সবই বদলে গেছে। আগে যখন তাকে দেখেছি তার চাইতে অনেক বুড়িয়ে গেছে। তেমন ফিটফাট ভাবও নেই। দাঁড়িও কামায়নি।

সেরে উঠবে তো?

কি করে বলব? আমি কি ভগবান যে জীবন দেব? না, আমি বলতে পারি না। ডাক্তাররা ভাঁওতা দেয়। কেউ কিচ্ছু জানে না। তাতে অবিশ্যি কিছুই এসে যায় না। মা বসুন্ধরার বুকে অঢেল জায়গা আছে—সবাইর জায়গা হবে। হাঁ, লাপসি ছাড়া আর কিছু খেতে দিও না। জ্বর আছে।

ধন্যবাদ। এলি বলে।

ধন্যবাদ দিও না। সে-ই ভাল। আমি শিখছি। মানুষের গোপন রহস্য শিখছি। যন্ত্রণা···শুধু যন্ত্রণা। আটশো লোক রয়েছে একখানা কাঠের ঘরে। যখনই সেখানে যাই, আমি ভগবান হলে তারা খুশি হয়। হা খ্রীস্ট, তোমাদের দশা দেখে দেখে আর ভাল লাগে না।

তারপর তিনি বেরিয়ে যান। আমি এলিকে ডাকি।

আর ছটফট কর না আলেন। ঘুমোবার চেষ্টা কর। তিনি প্রবোধ দেন।

আমাকে বলতেই হবে এলি।

বেশ তো। কিছু বলতে হয় তো পরে বল।

না—এখুনি। কেনটন সম্বন্ধে। ওরা বলে যে দুজনকে ছেড়ে দেবে কিন্তু ম্যাকলেনের সঙ্গীকে মারবার জন্য একজনকে মরতে হবে। কেনটন নিজের ইচ্ছায় মরতে রাজী হয়। আমি এলির কোট টেনে ধরি।—আমার ভয় হয়েছিল। কিন্তু এর জন্য আমিই দায়ী···মেয়েটিকে সঙ্গে নেবার জন্যই আমরা ধরা পড়েছি।

এলি বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকায়। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, কেনটন যদি চেয়ে থাকে তো সে দায়িত্ব তার। মানুষের জীবন তার নিজস্ব ব্যাপার।

ফাঁসির বড় ভয় কেনটনের···বেদম ভয়। ফাঁসিতে মরবার কোন ইচ্ছাটাই তার ছিল না।

তুমি যথেষ্ট ব্যথা পেয়েছে আলেন।

না···

এখন ঘুমোও।

না, সৈনিকেরা যখন কেনটনের ফাঁসি দেখতে যাবে আমাকে সেখানে থাকতেই হবে। বল এলি, আমায় ডেকে তুলবে তো? কথা দাও!

তুলব আলেন।

আমাকে ঘৃণা কর না তো এলি?

না।

সৈনিকেরা যখন যাবে···

অন্ধকারের গর্ভে তলিয়ে যাই। পা পিছলে পড়ে যাই যেন।

ঘুমোচ্ছি আর জাগছি। যখন সৈনিকেরা মার্চ করে যাবে…দেখতে যাবে একটা মানুষের অপমান…

স্বপ্নের ঘোরে অতীতে ফিরে যাই। ঢেউয়ের দোলায় এক একবার অনেকটা পেছনে হটে যাই আবার এগিয়ে আসি সামনে। বেস একবার মরছে আবার বেঁচে উঠছে…একবার কাছে আসে আবার দূরে সরে যায়। ফিসফিস করে কানে কানে বলে তার মৃত্যু রহস্য। কেন মরেছি আলেন? কেন মরেছি বলব? সুশ্রী সুন্দর মানুষ মরে। মানুষ কেন মরে আলেন? এ যুদ্ধের আসল রূপ কি? কেন এই যুদ্ধ? গরীবরা যাতে বড়লোকদের হটিয়ে দিতে পারে তার জন্য? না বড়লোকরা যাতে গরীবদের ধ্বংস করতে পারে তার জন্য? কিসের জন্য আলেন? যে-স্বাধীনতায় কোন লোক স্বাধীন হবে না তার জন্য? বলনা আলেন, কেন এই যুদ্ধ?

বেস চলে যায়। আমি জেগে উঠি। দেখি, আগুন জ্বলছে আর জেকব সে আগুনে কাঠ দিচ্ছে। স্বপ্ন বিলাসী মানুষ জেকব। স্বপ্ন-বিলাসীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন সাদৃশ্য থাকে না। কি স্বপ্ন আছে জর্জ ওয়াশিংটনের? সিংহাসনের স্বপ্ন? রাজমুকুট পরা ওই ব্যথিত বড় মুখখানা কল্পনা করবার চেষ্টা করি: সিংহাসনের স্বপ্ন তাঁর নেই। লোকটা হাতড়াচ্ছে। জেকবের মত লোক বনভূমি চায়। বনবাদড়ের সন্ধানী সে: বনকান্তারে নতুন দেশ গড়ে তুলবে। একটি মাত্র লক্ষ্য তার—ব্রিটিশদের হটাও। মানুষ মরে মরুক! যতদিন লক্ষ্য বেঁচে থাকবে কিছু এসে যায় না তাতে? শেষ ইংরেজটিকে পর্যন্ত হটাও। এই বিশাল বন-কান্তার নিজেদের দখলে নিয়ে এস। বেসের মত যত মেয়ে আছে জঙ্গলে তাড়িয়ে দাও। বুনো অসভ্যেরাই ওদের সাবাড় করে দেবে। সব বেটিকে তাড়িয়ে দাও।

আবার ঘুমের দেশে ভেসে যাই। স্বপ্নে দেখি, বেস যেন আমার

সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু এবার বুঝতে পারি যে মৃত্যুর রহস্যময় ঘোমটার ওধারে রয়েছে সে…রয়েছে মৃত্যু লোকের সেই অগণিতের দলে যারা জানে কেন আমরা সংগ্রাম করছি, কেনই-বা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছি আর কি পরিণাম এই সংগ্রাম ও দুঃখ-বরণের। বেস আর আমাকে কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করছে না। ভাবছে কেনটনের কথা। কেনটন জেগে ওঠে। মৃত্যুলোকে যারা পাড়ি দিয়েছে সেই অগণিতের দলে আর একজন বাড়ে।

স্বপ্নের পট বদলে যায়। এবার স্বপ্ন দেখি দলদস্যুর…চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাসাচুসেট্সের লোকজন। সমুদ্রবক্ষে নিজেদের জাহাজের একছত্র আধিপত্য চায় তারা…তাই এক যুদ্ধ বাধিয়েছে। ভার্জিনিয়ার প্লান্টাররাও আছে। তারা উঠে পড়ে লেগেছে ইংরেজের মূল্যমানের চাইতে চড়া দাম আদায়ের জন্য। ফার ব্যবসায়ীরা চাইছে বিরাট বিরাট ইংরেজ কোম্পানীর ধ্বংস। কিন্তু আমরা কৃষকেরা এসেছি কেন? আমরা কেন প্রাণ দিচ্ছি…কেনই বা নিজেদের জানোয়ার করে তুলছি? ঐ সব স্বার্থের সঙ্গে কি সম্পর্ক আমাদের? চাষাভূষা লোক আমরা। যতদিন আবাদ করতে পারব…যতদিন মাটির বুকে ফসল ফলাতে পারব, ততদিন আমাদের শান্তির ব্যাঘাত হবে না। কিন্তু ইহুদিটি এসেছিল কোন আকর্ষণে?

আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ভাঙা ভাঙা ঘুম হয়। জীবন্ত ও মরা মানুষের মুখের মিছিল বারে বারে ঘুম ভেঙে দেয়। গোটা রাত যেন বিকারের ঘোরে কাটে।

পরদিন সৈন্যদল মার্চ করে বেরিয়ে যায়। যাচ্ছে কেনটনের ফাঁসি দেখতে। তুষার পড়া বন্ধ হয়েছে। গোটা মাঠে বরফের আস্তরণ। স্থানে স্থানে এক হাত পুরু বরফ জমেছে। তুষারের বুকে সোনালী রোদ ঝিকমিক করছে…এই পাহাড়ের বুকে সৃষ্টি করেছে অদ্ভুত এক

সৌন্দর্যের মায়ালোক। আমাদের এই ছাউনির চারিদিকের গড়ানে গ্রামাঞ্চল বরফের সাদা আস্তরণে ঢাকা।

সহসা প্যারেডের জন্য জমায়েৎ হবার হুকুম আসে। আমরা জানি আসল উদ্দেশ্য কি। চার্লি গ্রীন তার বাঙ্কে শুয়ে আছে। তার মুখে চোখে বেদনা ও জ্বরের ছাপ। আমি তার কাছে যেতেই সে বলে, তুমি প্যারেডে যেও আলেন। তাকে লক্ষ্য কর আর সম্মান দেখিও।

নিশ্চয় সম্মান দেখাব।

সে তোমাকে ছোট করতে চায়নি আলেন। ভালবেসেই এ কাজ করেছে।

জানি। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় যে পরের জন্য আত্মবলি দেবার হিম্মত আমার হয়নি।

এখন ভাবছি, আমি থেকে গেলেই ভাল হত আলেন। মনে হচ্ছে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে না। কেনটন বাঁচত। বেশ জোয়ান লোক সে। এই চাবুক সহ্য করে অনায়াসেই সে বাঁচতে পারত।

তুমিও ভাল হয়ে উঠবে, চার্লি।

ওরা যদি চোখ খুলে রাখে তো তার চোখেচোখে তাকাবার চেষ্টা কর।

নিশ্চয় করব।

আস্তে আস্তে আমি পরিখা থেকে বেরিয়ে যাই। নড়াচড়া করা এখনও আমার পক্ষে প্রাণান্তকর ব্যাপার। মনে হয়, কে যেন পিঠের মাংসে তাতান লোহার শিক চেপে ধরছে। এলি আমায় যেতে নিষেধ করে।

এ তো সখ করে দেখবার মত দৃশ্য নয় আলেন। তাছাড়া, কাল যে লোকটাকে চাবকেছে সে যে আজ ওঠে আসবে, এ আশাও কেউ করবে না।

না গেলে মনে শাস্তি পাব না।

রাস্তার পরে আমরা সার বাঁধি। বড় করুণ দৃশ্য। গোটা পেনসিলভানিয়া লাইনে বড় জোর আট থেকে ন'শো ছিন্নবাস ভিখারী মাত্র অবশিষ্ট আছে। এরাই ওয়েনের গর্বের বস্তু। এরাই গোটা পল্টনের সেরা সৈনিক। বন্দুকের ভারে আমাদের পিঠ নুইয়ে পড়ছে, বরফের মধ্য দিয়ে পা টেনে টেনে কোনমতে এগোচ্ছি। চকচকে বরফের উপর রোদের ঝিলিকে প্যাঁচার মত চোখ পিটপিট করে চলতে হচ্ছে।

একঘেয়ে সুরে ভেরী বেজে চলেছে। পাঁজর-বার-করা আধা-উপোসী কাহিল একটা ঘোড়ায় চড়ে ওয়েন যাচ্ছেন। অধিকাংশ সেনানী পায়ে হেঁটে চলেছে। খাবারের অভাবে তাদের বাহনগুলো মরণের মুখে পা বাড়িয়েছে।

আমি যে সারে আছি, এলি আর জেকবও আছে সেই সারে। জেকবের মুখে এখনও সেই পাথুরে নীরবতা। আমার মাস্কেটের বোঝাটা এলিই বয়ে চলেছে।

উপত্যকার মধ্য দিয়ে আমরা হাসপাতালের পাশ কাটিয়ে যাই। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ডাক্তার আমদের দেখছে। তার মুখে কৌতূহলী বিদ্রূপের হাসি। কেল্লার কাছে পৌঁছোতেই আমাদের সার বেঁধে দাঁড় করান হয়। জয় পাহাড়ের ঢালুতে একটা ফাঁসির মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। কেনটন দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের সামনে। জন চারেক প্রহরী ঘিরে আছে তাকে। তার মাথা নাঙ্গা। রোদে তার হলদে চুল সোনালী রঙ ধরেছে।

এতটা পথ চলে আমি দুর্বল ও ক্লান্ত বোধ করছি। কেনটনের দিকে চেয়ে আর আমি চোখ ফেরাতে পারিনি। বেশ বুঝতে পারছি, এ দৃশ্য দেখতে দেখতে এইখানেই মূর্ছা যাব।

এদের কানে কানে বলি, ওর কোন অপরাধ নেই। রাগের মাথায় তিনজনেই আমরা গুলি করি। কার গুলিতে যে ম্যাকলেনের লোকটা মারা গেছে তার ঠিক নেই।

ভগবান ওকে রক্ষা করবেন। বিড়বিড় করে বলে জেকব।

ভগবানের ভয় ও করবে না। আমি বলি।

সৈনিকেরা কেনটনের প্রতি সহানুভূতিশীল। ম্যাকলেনের হানাদারদের কেউই আমরা দেখতে পারি না। তারা যে খাদ্য লুঠে আনে তা আমাদের চোখেই পড়ে না। সৈনিক মহলে কলগুঞ্জন ও আলোচনা শুরু হয়। যে সময় কেনটন দুটো হরিণ মেরে আসে তার কথা সৈনিকেরা এখনও ভুলতে পারেনি।

আমার মনে হয়, আমি যদি থাকতাম কেনটনের সঙ্গে? একটার জায়গায় যদি তিনটে ফাঁসির মঞ্চ থাকত? কোন ধরনের ভয় হচ্ছে কেনটনের মনে? কি করে অমন ভাবে মাথা খাড়া করে আছে? সইছে কি করে?

মনে হয়, সে আমার দিকে চাইছে। কিন্তু তারপর বুঝতে পারি যে চোখে রোদ পড়ে ঝিকমিক-করা বরফের মধ্যে সে শুধু মানুষের কাল মূর্তিই দেখতে পাচ্ছে।

চার্লির কথা মনে পড়ে। ওর বদলে সে মরতে চেয়েছিল। শুধু আমিই ছিলাম হিসাবের বাইরে। আমিও যে মরতে পারি একথা ওদের কারও মনে জাগে নি। এ আমি জানতাম। যখনই ওয়াশিংটন হ্যামিলটনের প্রস্তাবে রাজী হলেন, সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম যে আমি বাদ পড়ব। বুঝতে পারি যে আমার প্রাণ বাঁচবে।

মনে পড়ে, কেনটনের মুখ থেকে ঘৃণাসূচক একটি কথাও বেরোয়নি, প্রকাশ পায়নি কোন ক্রোধের লক্ষণ। শুধু ছোটবেলা আমার প্রতি যে অন্যায় করেছিল তার কথাই বলেছে। অথচ সে কথা আমি

একেবারেই ভুলে গেছি। কেনটনের মধ্যে যে মানুষটিকে বরাবর দেখে এসেছি, এখন তার কথাই বারে বারে মনে পড়ছে। এই মানুষটি···

দেবতার মত মানুষ! এলিকে বলি।

অঝোরে কাঁদছে এলি। কোন লজ্জা-সঙ্কোচ নেই। এর আগে কোনদিন এলির চোখে জল দেখিনি।

সৈনিক মহলে ক্রোধ ধূমায়িত হচ্ছে।

ওকে বাঁচান উচিত···নিতান্ত সৎলোক···কোন অপরাধ করেনি।

মুলার কেনটনের কাছে এগিয়ে যায় এবং তার ছেঁড়া কোটের এক টুকরো কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, তারপর পেছন ফিরে গটমট করে চলে যায়। উর্দি কলঙ্কিত করবার নামে রীতিরক্ষা করা হয়। কেনটনের গায়ে উর্দি নেই। মহাদেশীয় বাহিনীর কারও গায়েই উর্দি নেই। উর্দি কথাটা কংগ্রেস ও সেনানীদের ধাপ্পা। নিজের শত ছিন্ন জামা-কাপড়ের কথা ভেবে এইবার আমি খুব গর্ব বোধ করি। সৈনিক আমরা নই। নিজেদের অধিকার বলে একজোট মানুষ আমরা—বন্দুকধারী ভিখারীর মিছিল।

যে বিপ্লব আমাদের মধ্য থেকে জন্ম নিচ্ছে, কেনটনের দিকে চেয়ে, মুলারকে গটমট করে হেঁটে যেতে দেখে এবং দুই পাশের লোকজনের দিকে চেয়ে তার একটা ছবি আমার সামনে ভেসে ওঠে। যে শক্তি মানুষের আত্মমর্যাদা নাশ করেছে তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্রোধের প্রতীক সেই বিপ্লব। আমরাই তার অংশ। নতুন জগতে যে নতুন মানুষ জন্ম নিচ্ছে তাদেরই দলে আমরা।

সৈনিক মহলে ফুঁসে উঠেছে এই ইঙ্গিত···মূক ক্রোধ ও ঘৃণার গর্জন। নিজেকে আবিষ্কারের আশায় অন্ধের মত যে জগৎ হাতড়ে বেড়াচ্ছে আমাদের মধ্যে সেই নতুন জগতের ইঙ্গিত মুলার দেখতে পেয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কেনটন পেয়েছে। আমি হলপ করে বলতে

পারি, কেনটন দেখেছে সে নতুন জগতের ইঙ্গিত। ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি যে কেনটন সেই স্বপ্ন নিয়েই মরেছে।

কেঁদে এলিকে বলি, ওর ফাঁসি বন্ধ করতে হবে। আমরা ওকে ফিরিয়ে নেব।

পলকের জন্য সৈনিকদল তরঙ্গের মত এগিয়ে যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ওয়েনের ক্যানকেনে কণ্ঠস্বর গর্জে উঠে, বিগ্রেডস্—এটেনশান্!

আবার আমরা হটে যাই। হটে যায় সার বাঁধা সশস্ত্র মানুষ—হটে যায় দীর্ঘস্থায়ী রণাঙ্গনে। কতদিনে এ যুদ্ধের শেষ হবে কেউ জানে না।

তারপর ওরা কেনটনকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং তার চোখ বেঁধে দিতে চায়। মাথা নেড়ে আপত্তি জানায় কেনটন। খালি মাথায় গলায় ফাঁস পড়ে আছে সে। সোনালী রোদে সোনার ছোপ লেগেছে তার চুলে। তারপর ওরা ফাসটা ঝুলিয়ে দেয়…মরে যায় কেনটন।

সৈনিক মহলে গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মাথা হেঁট করে অবশ ভাবে বন্দুক ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সাধারণ মানুষ।

মরে গেছে! আমি ফিসফিস করে বলি।

সকালের হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ভেরী বাজতে থাকে। সৈনিকেরা আস্তানার দিকে পা বাড়ায়। ওয়েন পাথরের মূর্তি হয়ে গেছেন। কারও দিকে না চেয়ে তিনি ঘোড়ায় চড়ে আগে আগে চলে।

জেকবের মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেছে। বিষণ্ণ চোখে কালির ছায়া।

আমি বলি, ওকে ঘৃণা কর না জেকব। ঘৃণা করতে হয় আমাকে কর—কেনটনকে নয়।

ওর পর আর কোন ঘৃণাই নেই আমার।

এলি বিড়বিড় করে বলে, পরের জন্য যে প্রাণ দেয় তার ভালবাসা…

আবার আমরা আস্তানায় ফিরে আসি। আমি ভেতরে ঢুকি। চালি গ্রীন আমার জন্যই অপেক্ষা করছে। তার উৎকণ্ঠিত মুখ ফ্যাকাশে সাদা।

কেনটন মারা গেছে।

কি করে মরল? ভয় পেয়েছিল কি?

না। হাসছিল।

চালি কেঁদে ওঠে···দুহাতে মুখ চেপে ডুকরে কাঁদতে থাকে। আগুনের কাছে গিয়ে আমি ঘেঁষে বসি···একদৃষ্টে চেয়ে থাকি শিখার দিকে। কেনটনকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করাবার সময় পলকের জন্য যে দৃশ্য দেখেছি, বারবার সে ছবি মনে আনবার চেষ্টা করি।

—ষোলো—

অসহায়ের মত আমি মাথা ঝাঁকাই। জলের কাপ ধরা হাতখানা কাঁপতে থাকে। খানিকটা জল ছলকে পড়ে। হাতে এখন হাড়ের পর হলদে চামড়া খানাই সার হয়েছে।

অনেক জ্বর দেখেছি। এলি বলে।—আসে যায় কিন্তু বড় দুর্বল করে দিয়ে যায়। মনে বহুত আজগুবি চিন্তা রেখে যায়।

কত দিন এখানে আছি এলি?

ছয় দিন।

মনে মনে ভাবি—ছয় দিন! একটানা ছয় দিন উপবাস! তবু বেঁচে আছি। বলি, মরে গেলে মানুষের কি হয় কখনও ভেবে দেখেছ এলি?

এলি মাথা ঝাঁকায়।—আমি ধার্মিক লোক নই আলেন। এতো পাদরিদের কাজ।

আমার জন্য প্রাণ দিয়েছে কেনটন। আমার উপর তার কোন ঘৃণা থাকবে না?

আমার মনে হয় না।

তুমি আমার পাশে থাকবে তো এলি? যখন আমি চলে যাব, আমায় ধরে থাকবে? বড় ভয় হচ্ছে আমার।

আমি তোমার কাছে কাছেই থাকব আলেন।

বড় ভাললোক তুমি এলি। জীবনে এমন ভাল লোক দেখিনি।

এলি মাথা ঝাঁকায়। ছেঁড়া নেকড়া ভিজিয়ে সে আমার মুখ মুছিয়ে দেয়···আমার গা ঢেকে দেয়···পাশে বসে মুখের তাপ মুছিয়ে দেয়।

আবার আমি ভিরমি খাই। ঘুরে ফিরে গরম ও ঠাণ্ডা বোধ করছি। চোখের সামনে তখন আস্তানার আগুনটিই ভাসছে···আগুনের লেলিহান শিখা যেন আমায় পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। বেসের জন্য কেঁদে উঠি। আবার সংজ্ঞা ফিরে আসে, ঘাম বেরোয়। হাত বাড়িয়ে বেসকে খুঁজি। ধোঁয়া-ভরা আস্তানার মধ্যে দিন রাত একাকার হয়ে যায়। এই আস্তানাই চিরন্তন। আমরা যেন এখানকার চিরবন্দী।

আর একবার ডাক্তার আসে। জ্বর ছেড়ে গেছে। দুর্বল শিশুর মত বিছানায় পড়ে আছি। চার্লি আবার উঠে বসেছে। বড় দুর্বল, বড় শীর্ণ তার চেহারা।

ডাক্তারের চেহারাও বদলে গেছে। চোখ লাল শীর্ণ চেহারা··· থুতনিতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রক্তের ছিঠে লেগে তার পোশাক নোংরা হয়ে গেছে। কথার সে পোড়ানিও আর নেই। ডাক্তার পরিখার আশ্রয়ে ঢুকলে জেকব তাকে কোট খুলতে সাহায্য করে। আক্ষেপে মাথা ঝাঁকায় ডাক্তার।

আর আমি এই বিচ্ছিরি পাহাড়ে চড়ব না। এখানে ডাক্তার লাগবে কিসে? তার চাইতে বরং চুপ করে থাকাই ভাল।

আগুনের পাশে বসে সে পা ছড়িয়ে দেয়। আড়চোখে প্রথমে চার্লিকে দেখে, তার পর তাকায় আমার দিকে। বলে, দুজনেই আবার মাথা খাড়া করছে? আমি কিন্তু ভাবতে পারিনি।

চার্লি হেসে ওঠে।—এবারে বোধহয় বরফের পর পাঁজা করতে পারলেন না।

আর কিছু সময় দাও, হাজার রোগী আছে আমার হাসপাতালে! বিশ্বাস করবে? ঐ চারখানা কাঠের দেয়ালের মধ্যে কমসে কম হাজার লোক রয়েছে। পা ফেলবার জায়গা নেই। অবিশ্যি গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেও কিছু এসে যায় না। এর বাড়া নরক নেই। এই তো নরক। আমার হাসপাতালই নরক। কমসে কম হাজার লোক। আর তার একজনকেও ও ঘর থেকে হেঁটে বেরুতে হবে না। না পারে ভালোই হবে। এ আর মনে রাখবার মত জিনিস নয়। কিন্তু মাগীগুলো মরে না। ভগবান জানেন কি করে টিকে থাকে। কিন্তু আছে তো! মেয়েদের কেউ হাসপাতালে পাঠাবে না। জাহান্নামে যাক বেটিরা! তবু তো বেঁচে আছে। ঐ দুটোর দিকে তাকাও!

মেরি বলে, আপনার ও মড়া রাখার ঘরে আমায় টানতে পারবেন না। আপনি বড় সুবিধের লোক নন।

বটে? ইংরেজ বাবু নিয়ে ঘর করলে তো দুজনেই ফিলাডেলফিয়ায় বেশ দু-পয়সা কামাতে পারতে।

ভারি নচ্ছার লোক আপনি।

যা হোক, ও দুটোকে একবার দেখে নি। ভেবেছিলাম, মরে আমায় রেহাই দিয়ে গেছে।

বিরক্তভাবে তিনি আমাদের পরীক্ষা করেন এবং মাথা ঝেঁকে বলেন, না, বাঁচবে! অবাক করলে তোমরা!

জেকব বলে, কোন খবর জানেন নাকি? শিগগির মার্চ করা হবে?

মার্চ করবে? কোথায়? কি করে যাবে? কি আছে পল্টনের? বড়জোর হাজার খানেক লোক থাকতে পারে। কি তারও কম হতে পারে। তিন হাজার পালিয়েছে। খুব সম্ভব ম্যারিল্যাণ্ডের লাইনের আদ্ধেক, ছুটো নিউইয়র্কের রেজিমেণ্ট এবং মাসাচুসেটসের একটা ভেগে গেছে। কত যে মরেছে তা ভগবানই জানেন। মাত্র একদিনেই তো আমি শ'খানেক মড়া হাসপাতাল থেকে বার করে দিয়েছি। আর সহ্য হয় না। পাগল হয়ে যেতে হয়। ওয়াশিংটনকে একবার বলেছি। ষাঁড়ের মত জেদী লোকটা। বল্লাম, আগামী বসন্তকালে ছাউনিতে কোন লোক থাকবে না। একজনও বেঁচে থাকবে ভাববেন না। যমপুরীতে বাসা বেঁধেছেন আপনি। লোকটা বলে কি জান? বলে, ডাক্তার, আমি মরব না। আমি তখন ওষুধ আর ব্যাণ্ডেজ চাইলাম। বল্লাম, বিশ লাখ লোকের বেশ সম্পদশালী দেশ রয়েছে···কংগ্রেস রয়েছে···বসে বসে কি করছে কংগ্রেস? তিনি বল্লেন, জানি না। কিছুই দিচ্ছে না আমাদের। তারা অনুযোগ করেন, আমি নাকি বড্ড বেশী দাবী করি। তারপর তিনি শিশুর মত কেঁদে ওঠেন। আমি বলি, ইওর একসেলেনসি, অনেক চোখের জল দেখেছি, কিন্তু তাতে তো খাবার আসে না! তিনি বল্লেন, জানি হে, জানি।

জেকব মাথা ঝেঁকে বলে, না, মিথ্যে কথা বলছেন আপনি।

আমি মিথ্যে কথা বলছি? আমার দিকে তাকাও। তোমাদের এই ছুঃখ কষ্টে আমার কিছুই আসে-যায় না। তোমাদের ঐ আদর্শেরও ধার ধারি না। দেশপ্রেমিক আমি নই। আমি ডাক্তার। প্রথম প্রথম সেই ভাবেই নিয়েছি। ভেবেছি, যে চুলোয় খুশি যাক না কেন, আমার বয়ে গেল। আমি আমার কাজ করে যাব, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব। পারি তো ছুচারজনকে সাধ্য মত সাহায্য করব। কিন্তু এখন মন ভেঙে গেছে।

বিমর্ষভাবে জেকব বলে, আর ফিরে যাবার উপায় নেই—এখন আর ফেরা যায় না।

কেন যায় না? আত্মসমর্পণ করলেই জেনারেল হাউ রাজী হবে।

এলি বলে, আপনি যা বল্লেন ব্যাপারটা যদি তাই হয় তো ইংরেজরা আক্রমণ করে সব চুকিয়ে ফেলে না কেন?

ফিলাডেলফিয়ায় কি অসুবিধাটা হচ্ছে তাদের? লোকক্ষয় করবে কেন? আর দুমাস অপেক্ষা করলে আক্রমণ করবার দরকারই হবে না। ফিলাডেলফিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আর সেখানকার ভদ্রঘরের মেয়েদের পেট করেই তারা যুদ্ধ জিততে পারবে।

লড়াই করবার লোক জুটবে। জেকব বিড়বিড় করে বলে।

মরা মানুষ?

তারপর সে বেরিয়ে যায়। দিন কয়েক পরে শোনা যায় যে গুলি করে ডাক্তার আত্মহত্যা করেছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে পেনসিলভানিয়ার একটি লোক সংবাদটি দেয়। বলে, বেঁটে ডাক্তার মারা গেছে।

মনে পড়ে কেমন করে আমরা অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম।

জেকব ফিসফিস করে বলে, ওর মত লোকের আত্মহত্যা করা উচিত হয়নি। বেশ জোয়ান সৎ লোক ছিল মানুষটা।

ডাক্তার তো মরল, এখন পেনসিলভানিয়ার লোকেদের দেখবে কে?

তারপর আমরা আগুনের চারপাশে বসি। কথা বলবার ভরসা হয়নি কারও। অবশেষে এলিকে জিজ্ঞাসা করি, এখন কি হবে?

জানি না। এলি জবাব দেয়।

বন্দুক তুলে নিয়ে জেকব অন্যের বদলে পাহারা দিতে যায়। কিন্তু তার পা-ও ক্লান্ত হয়ে এসেছে। সঙ্গিনীকে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় যায় চার্লি। মেয়েটি এমনভাবে তাকে ফিরে নিয়েছে যেন

কোন কালেই তাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। কেনটনের সঙ্গিনী তাকাচ্ছে আমার দিকে। হাসছে।

এলি উবু হয়ে ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে। কি ভাবছে সে? মোহক উপত্যকার কৃষক এলি জ্যাকসন। সরল মানুষ। তেমন কোন গভীরতা নেই এলির মধ্যে। তবু কিসের জোরে চলছে সে?

মোড় ফিরে আবার আমি মেয়েটির দিকে তাকাই। তাকে বেস বলে কল্পনা করবার চেষ্টা করি। বেসের জন্য প্রবল আকুতি মনের মধ্যে অদ্ভুত সাড়া জাগায়। হামেশাই সে ফিরে আসে। মনে হয় ক্রমশই যেন আমার মনে নারীত্বের পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ভার্জিনিয়ানদের কাছ থেকে যে বালক মেয়েটিকে রেখে দিয়েছিল, মনে মনে সেই আলেনের কথা ভাববার চেষ্টা করি। সে অনেকদিন আগেকার কথা। স্ত্রী হবার যোগ্যা সে নয়। সে ছিল শিবির-সঙ্গিনী…যার হিম্মত আছে তারই অঙ্কশায়িনী। এক সময় সে আমার সঙ্গিনী হয়। কচিৎ এমন ভাল উপহার মেলে। ফিনফিনে চেহারা… রাত্রে পুরুষদের দেহ তাতিয়ে রাখবার পক্ষে চমৎকার। কোনদিন সে কিছু চায়নি। আমিই তার কাছ থেকে সব কিছু আদায় করে নিয়েছি। শেষ অবধি সে মারা যায়।

কেনটনের সঙ্গিনীকে আমি শয্যাসঙ্গিনী করে নিয়েছি। ব্যাপারটা কেনটনের বদান্যতা বলেই মনে হয়। মেয়েটিকে আমি ঘৃণা করতাম; কিন্তু এখন আর করি না। যে করেই হোক, আমাদের মন থেকে ঘৃণা লোপ পেয়েছে।

আস্তে আস্তে আমাদের ক্ষত শুকিয়ে আসে। দিন কয়েক কেনটনের মৃত্যুর বিভীষিকা আমাদের উপর ভর করে থাকে। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ান রোদে ঝলমল কেনটনের ছবি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। পলকের জন্যও ভুলতে পারিনি তার সোনালী চুলওলা খালি

মাথা। মানুষে মানুষে যতটা ঘনিষ্ঠতা সম্ভব, আজকে আমার ও চার্লি গ্রীনের ঘনিষ্ঠতা সেই রকম।

শেষমেষ একদিন আমি কেনটনের কথা তুলি। কেমন করে সে মরেছে একে একে খুলে বলি। আঝোরে কাঁদে চার্লি। জোয়ান লোকের পক্ষে কেঁদে শান্তি পাবার চেষ্টা বড় মর্মান্তিক।

একদিন নিজের বন্দুকটার কাছে যাই। রোড দ্বীপের সৈন্যদলের একজন কেনটনের আমার ও চার্লির বন্দুক তিনটা দিয়ে গেছে। সযত্নে আমি নিজের বন্দুকটি ঘষেমেজে রাখি···বালি দিয়ে ঘষে মরচে সাফ করি।

তারপর একদিন পাহারা দিতে যাই। যে-কদিন আমাদের পালা সে-কদিন পাহারা দিতেই হবে। জেকব ও এলির পক্ষে সবার হয়ে পাহারা দেওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। পরিস্কার এক ঠাণ্ডা রাতে আমি পাহারায় যাই। এক ফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। আস্তে আস্তে পায়চারি করতে থাকি। মনে মনে ভাবি, বরফে ঢাকা মাঠ আর পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে কতদিন যে এই জায়গায় পায়চারি করতে হয়েছে!

পেনসিলভানিয়ার লাইনের আর একটি লোকও পাহারা দিচ্ছে। পায়চারি করতে করতে যখন তার সঙ্গে দেখা হয়, দুজনে কিছুক্ষণ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে দু চারটে কথা বলি। পেনসিলভানিয়ার লোকজনের উপর আর কোন ঘৃণাই আমার নেই।

ভারি ঠাণ্ডা রাত। সে বল্লে।

শীতের জোর কমে গেছে।

আজকালকার শীত যেন কেমন!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা বাঘের ডাক শুনি। ছাউনির কাছাকাছি ইদানীং অনেক বাঘের আনাগোনা টের পাওয়া যাচ্ছে।

আবাদে এত বাঘ কোনদিন দেখেছি বলে মনে হয় না।

মড়ার খোঁজে আসে। লোক বলে, শীতের দিনে বিশ মাইল দূর থেকেও বাঘে মাংসের গন্ধ পায়।

সেই জার্মান বালকটির কথা মনে পড়ে। ঢালুর দিকে চেয়ে মনে হয়, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, সে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে···বরফের পর পড়ে যাচ্ছে···হোঁচট খাচ্ছে···আবার চলছে টলতে টলতে। পেনসিলভানিয়ার পাহাড়িয়া অঞ্চলে নিজের বাড়ীর কথা ভাবছে জার্মান ছেলেটি। অদ্ভুত লোক আমরা। ওলন্দাজ বল কি জার্মান বল, সমুদ্র তীরের নিষ্ঠাচারী পিউরিটান বল কি সাগরপারের পোল-ইহুদি বল, দক্ষিণের স্কচ-আইরিশ-সুইডিস বল, কি উত্তুরে ভ্যালী-অঞ্চলের লোক বল বা ভার্জিনিয়ার নিগ্রোদাস বল—সবাই মিলে আমরা এক আজব দল গড়েছি।

পরদিন রাত্রে এলি ও জেকবের সঙ্গে আমার কথা হয়। রসদখানা থেকে সামান্য কিছু রাম নিয়ে ফিরেছে জেকব। ভুট্টার কিছু লাপসিও মজুত আছে। আগুনের পাশে বসে সবাই মিলে খাওয়া হয়। খবরাখবর জানবার জন্য, কি দুচারটে কথা বলবার জন্য জনকয়েক পেনসিলভানিয়ার লোক আসে।

এলিকে বলি, কেনটন মরবার সময় নতুন একটা কিছু বুঝতে পেরেছে বলে আমার মনে হয়।

কি করে বুঝলে?

একদম ভয় পায়নি।

বেশ জোয়ান লোক ছিল। চার্লি বলে।

শুধু গায়ের জোরের কথা নয়। কেন আমরা চলেছি এলি? আমাদের মাইনে দেয় না···উপোস করিয়ে রাখে···বাড়ীর জন্য সবাই আঁকুপাঁকু করছি···

মুক্ত স্বাধীন মানুষ হব আমরা। এলি বলে।

ইয়োরোপের কোনো দেশের মানুষই তো স্বাধীন নয়!

কিন্তু এখানকার মানুষ মুক্তি পাবে। জেকব বিড়বিড় করে বলে।

আমাদের পক্ষে যুদ্ধ জয় করা অসম্ভব। শুনতে পাই ফিলাডেল-ফিয়ায় ব্রিটিশদের নাকি বিশ হাজার সৈনিক আছে। হাজার লোকে বিশ হাজারের সঙ্গে লড়তে পারে না।

পেনসিলভানিয়ানদের একজন বলে, পাহাড়ের উপর দিয়ে কেনটাকি যাবার একটা বুনো পথ আছে। শুনতে পাই, সৈনাপত্য ছেড়ে দেবার আগে ওয়াশিংটন নাকি সে-পথ দখল করবার হলপ করেছেন; পাহাড়ের ওপারে গেলে বহু বছর লড়াই চালাতে পারবেন।

বহু বছর? অবিশ্বাসীর মত জিজ্ঞাসা করি আমরা।

বহু বছর! প্রায় আপন মনে বলে জেকব।—বছরের পর বছর!

আমি বেহদ্দ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি বলি।

দুদিন কোন খাবার জোটে না। অনবরত কনকনে উত্তুরে হাওয়া বইছে সোঁ সোঁ করে। আস্তানার মধ্যে গুটিসুটি মেরে আমরা ফাঁদে-পড়া জন্তুর মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি। মাস্কেট থেকে চামড়ার ফিতে ছিঁড়ে এনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেদ্ধ করে তা-ই খাওয়া হয়। টুকরো টুকরো করে কাপড় ছিঁড়ে তাই রান্না করে খাই। গাছের বাকলও বাদ পড়ে না। জংগলে সামান্য যে-কটি গাছ ছিল, তার ছাল দুদিনেই উঠে যায়।

সামান্য কারণেই আমরা চটেমটে অস্থির হই। চালি সামান্য কি একটা কথা বলতেই জেকব তার গলা টিপে ধরে। এলি আর আমি তাদের ছাড়িয়ে দিই। মেয়েরা তখন চীৎকার চেঁচামেচি করে পরিখা মাতিয়ে তোলে। শিশুর মত দুর্বল চালি। সঙ্গিনীও তাকে ছেড়ে গেছে। সে এত দুর্বল যে মেয়েটিকে সন্তুষ্ট করবার সামর্থ্য তার

নেই। পেনসিলভানিয়ার অন্য আস্তানায় ডেরা বেঁধেছে মেয়েটি। চার্লি তাকে ফিরিয়ে দেবার দাবী করে। আবার সে ফিরে আসে বটে, কিন্তু বেড়ালের মত দুজনের ঝগড়া লেগেই থাকে।

মেয়েটিকেই বেছে নিতে দাও। এলি বলে।

মেয়েটি বলে, তোমাদের মত নোংরা ভিখারীকে কোন মেয়েই চায় না।

আমাদের যে কোন একজনের কাছে এস।

সে আমার খুশি। স্বাধীন মেয়ে আমি।

বেহদ্দ খানকি।

খানকি বলবে না। আমিও একদিন ভাল ছিলাম। তোমাদের এই নোংরা বিদ্রোহী পল্টনে আসবার কোন ইচ্ছাই ছিল না।

শেষ অবধি আবার সে পেনসিলভানিয়ানদের কাছে ফিরে যায়। বাঙ্কে শুয়ে অসহায়ের মত কাঁদে চার্লি। আমি তখন আমার মানে কেনটনের সঙ্গিনীকে দিতে চাই।

না না, ও তোমার কাছেই থাক আলেন।

ক্রোধে আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলি। পেনসিলভানিয়ানদের শাসাই। চার্লিকে বলি যে আর একটু বল পেলে আমি ওদের খুন করব···তার সঙ্গিনীকে যারা নিয়েছে তাদের একজনও রেহাই পাবে না।

এলি কেঁদে বলে, হা ভগবান, আমরা তো অচেনা লোক নই! একসাথে এই নরকে বসবাস করছি। মারামারি খুনোখুনি করা আমাদের সাজে না।

এলির চেষ্টাতেই আগুন জ্বালান থাকে। নিজেই সে কনকনে শীতে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে আনে। শিশুর মত আমাদের পালন করে এলি। সে-ই আমাদের ঠাট্টা-তামাসা করে সজীব রাখে।

রাত্রে বসে বসে কাটায়···অম্লানবদনে পায়ের ব্যথা সহ্য করে। এখন আর পা বাঁধে না।

সাতুই মার্চ প্যারেডের ডাক পড়ে। হামাগুড়ি দিয়ে সৈনিকেরা আস্তানা থেকে বেরোয়। সৈনিকদল জমায়েৎ হয়। এত কমলোক কোন দিন হয় নি। প্যারেডের মাঠে কংগ্রেসের এক বাণী পড়ে শোনান হয়।

চারিদিকে গুজব রটে যায় যে আমরা দক্ষিণে পিছু হটব।

ছাউনি ভেঙে দিচ্ছে।

এখানকার কাজ শেষ হয়েছে।

ব্রিটিশরা আক্রমণ করবে···জয় পাহাড়ের কেল্লা রক্ষা করতে হবে আমাদের।

ইংরেজদের আক্রমণের কোন সংবাদই কংগ্রেস জানে না। কোন খবরই রাখে না কংগ্রেস। জাহান্নামে যাক ব্যাটারা।

শীতে কাঁপছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। শেষ অবধি ওয়েন তার স্টাফ নিয়ে এগিয়ে আসেন। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি আমাদের সারির কাছে হেঁটে আসেন। বলেন, এটেনশন।

আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। মাথা ঝেঁকে আবার তিনি ঘোড়ার কাছে ফিরে যান। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ফিলাডেল্‌-ফিয়ার দিকের ধূসর পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকেন।

বাণীটি পড়বার জন্য এক তরুণ অফিসার এগিয়ে আসেন। উৎকর্ণ হয়ে আমরা অপেক্ষা করি। তিনি পড়ে যান: মহাদেশীয় কংগ্রেস থেকে সাধারণতন্ত্রের পল্টনের উদ্দেশ্য: দুঃখকষ্টবরণে সৈনিকেরা যে সাহসের পরিচয় দিয়েছে তারই স্মরণে এতদ্বারা আমরা উপবাস ও প্রার্থনার জন্য একটি দিন ধার্য করছি···

আমরা হেসে উঠি। হা ভগবান, তেমন হাসি অনেক দিনের মধ্যে

হাসতে পাইনি। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়—দুর্বলতায় কাঁপতে থাকি। তারপর পেছন ফিরে আবার আস্তানায় চলে আসি।

মনে পড়ে, বাণীটি পড়বার সময় ওয়েন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আস্তে আস্তে ঘোড়ায় চড়ে বৃদ্ধের মত তিনি পাহাড় বেয়ে বাসায় ফিরে যান।

তৃতীয় খণ্ড—যুদ্ধ

—সতেরো—

সারা সকাল বৃষ্টি পড়ছে। আস্তানায় বসে আছি। বেশ বুঝতে পারছি এ তুষারপাত নয়…বৃষ্টি পড়ছে টুপটাপ। নিভু নিভু হয়ে আগুন জ্বলছে। তবু কেউ কাঠ দিচ্ছেনা। পরিখার চালে বৃষ্টির ফোঁটা ভেরী বাজাচ্ছে যেন।

সহসা মেরি কেঁপে ওঠে…বিছানার প্রান্তে বসে ফোঁপায়। কান্নার আবেগে তার শীর্ণ দেহ সামনে-পেছনে দুলতে থাকে।

দুঃখু পেয়েছ মেরি? এলি জিজ্ঞাসা করে। এলির এ কৌতূহল বিস্ময়কর।

না।

তাহলে কাঁদছ কেন?

শুনছ না, বৃষ্টি পড়ছে! ভেবেছিলাম এ শীত আর শেষ হবে না।

হাঁ, বৃষ্টি পড়ছে বটে!

বৃষ্টিই হচ্ছে। মাথা ঝেঁকে জেকব বলে। আকাশ থেকে জল ঝরছে…চমৎকার বর্ষণ।

আন্না আমার বিছানায় শোয়া। টুপটাপ বৃষ্টি পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য মাথা নাড়ছে। আমার বিছানার কাছে চাল ফুটো। লিকলিকে হাত পেতে সে বৃষ্টির ফোঁটা ধরে। ফিসফিস করে বলে, ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। বাদলা দিনে আমরা রান্নাঘরে লেগে থাকতাম। এমনি দিনে সবাই রান্নাঘরের কাজ করে—রুটি সেঁকে,

সেলাই করে আর কাপড় বোনে! তাঁত পেলে ভাল কোটের কাপড় বুনতে পারতাম।

দরজার কাছে গিয়ে আমি কবাট খুলে ফেলি। গাছগুলি ছায়ার মত। খুব নীচু দিয়ে মেঘ উড়ে যাচ্ছে আর জোর বৃষ্টি পড়ছে অসাড়ে। প্রতিটি ফোঁটায় বরফের বুকে এক একটি গর্ত হচ্ছে। শুরু হয়েছে বরফ গলা।

ফিরে দাঁড়িয়ে আমার কথা ফোটে না। বলি, কত তারিখ এলি?

মার্চের যে কোন দিন হবে। তারিখটা ঠিক বলতে পারব না।

জেকব বলে, আজকে ইহুদিটির কথা মনে পড়ছে। বারবার বসন্ত আসবার কথা বলত বেচারী। এদেশের বসন্ত আর দেখতে পেল না।

আমি ফিসফিস করে বলি, আমরা তো বেঁচে আছি···আমি তুমি চালি···আমরা তো দেখতে পেলাম!

কি অপূর্ব বাহার বসন্তের!

আমরা বেঁচে আছি! এখনও কথা বলছি···নড়াচড়া করছি!

এলি মাথা ঝাঁকে। লক্ষ্যহীনের মত ঘুরে ঘুরে এক একবার সে বিছানায় হাত দেয় আবার হাত বাড়িয়ে চালের ফুটোগুলো চেপে ধরে। তারপর সে আগুনের পাশে বসে পড়ে।

জেকব তার কাছে গিয়ে শান্তভাবে বলে, তোমার মনটা কি অস্থির হয়েছে এ'ল?

অস্থির হবে কেন? ভাবছি।

আবার একদিন আমরা মোহকে ফিরে যাব এলি···ফিরে যাব শ্যামল সুন্দর এক স্বাধীন দেশে!

হাঁ, আবার আমরা ফিরে যাব। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে প্রত্যয়ের দৃঢ়তা নেই।

আবার আমি দরজার কাছে যাই। শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে

উঠি। চেঁচিয়ে বলি, এলি—এলি, ছাখ বরফ গলছে! কিরিচ হাতে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই আমি মাটি খুঁড়তে শুরু করি। তারপর আবার আস্তানায় ফিরে আসি। ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে গা থেকে।

ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এলি বলে। বোকামি কর না এলি।

চার্লি ফিসফিস করে বলে, তুমি তো মাটি খুঁড়ছিলে আলেন। এখনই এত নরম হয়ে গেছে কি?

যারা মরেছে সবাইকে কবর দেব। শান্তিতে ঘুমোতে পারবে। আমি বলি।—কারুককে আর কবরের বাইরে বাঘের শিকার হয়ে থাকতে হবে না। মাটি খুঁড়ে সবাইকে কবর দেব। শান্তিতে থাকবে।

হাসতে হাসতে আমি বিছানায় বসে পড়ি।

জেকব বলে, এপ্রিল মাসের মোহকের কথা মনে পড়ছে। পশলা পশলা বৃষ্টির পর আকাশের কি স্নিগ্ধ চোখ জুড়ান শোভা! তারপর মে মাসে আপেল গাছে ফুল ফুটে ওঠে···সে দৃশ্য জীবনেও ভুলতে পারব না।

ফোর্জ উপত্যকাতেও আপেল গাছ আছে। সাগ্রহে বলে চার্লি।

চাল চুঁইয়ে ট্যাপ ট্যাপ করে জল পড়ছে। গোল হয়ে বসে জলপড়া দেখছি। আমাদের হাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে··· মেজের শুকনো ময়লা ভিজে সৃষ্টি হচ্ছে ছোট জল-কাদার খানা।

আমার হাড়ে শীত ঢুকেছে। বিষণ্ণভাবে চার্লি বলে।—যতদিন যাক, এ শীত আর যাবে না। চাবকাবার সময় যে দারুণ ঠাণ্ডা লেগেছে তার কাঁপুনি কোনদিনই যাবে না।

আমি গরম রোদের স্বপ্ন দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও বলে উঠি, আমিও স্বপ্ন দেখছি যেন মুখে কাপড় দিয়ে রোদের মধ্যে সবজে নরম ঘাসের উপর শুয়ে আছি···ফুরফুরে হাওয়া বইছে···

সঙ্গে মেয়েও একটি ছিল তো? মেরি জিজ্ঞাসা করে।

ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।

গরম রোদ! মাথা নেড়ে বলে চার্লি।

একদৃষ্টে আগুনের দিকে চেয়ে জেকব বলে, আবার পল্টন তাজা হয়ে উঠবে···নতুন নতুন লোক আসবে···গণসেনারা জড়ো হবে··· আবার আমরা মার্চ করে এগিয়ে যাব···

এমনি সময় দড়াম করে দরজাটা খুলে যায়। ছুট করে ঢুকে পড়ে পেনসিলভানিয়ার কার্ক ফ্রিম্যান। জলে চুপ্‌চুপ লোকটি হাঁপাতে থাকে। টুপটুপ করে জল গড়াচ্ছে তার গা মাথা থেকে।

ব্যাপার কি?

শুয়েলকিলের জমাট বরফ ভাঙছে।

আমরা তার পেছু পেছু বেরিয়ে পড়ি। বহু লোক বেরিয়ে পড়েছে পরিখা থেকে। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে কান পেতে আছে। বহুদূর থেকে একটা অস্পষ্ট কড়কড় আওয়াজ আসছে।

বরফ ভাঙছে।

মেঘ ডাকছে।

সহসা একটা কড় কড় শব্দ হয়। কে যেন কর্কশ গলায় হিহি করে হেসে উঠে।

শিগগির আস্তানায় ফিরে এস। এলি ডাকে। ধারাবৃষ্টি সহ্য হবে না।

আবার আমরা ফিরে আসি। জনকয়েক পেনসিলভানিয়ার লোকও আসে সঙ্গে। তাদের একজনের কাছে কিছু 'রাম' আছে। কি করে এই মদটুকু হাতে আসে সবিস্তারে তার কাহিনী শোনায় লোকটি। জন আটেক পেনসিলভানিয়ার লোক রসদখানা পাহারা দিচ্ছিল। পাহারা দিয়ে ফিরবার পথে একদিন সন্ধ্যাবেলা ম্যাকলেনের দলের দুজন হানাদারকে পাকড়াও করে। ধরাধরি করে এক টব লুটে

আনা মদ ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল লোক দুটি। পেনসিলভানিয়ানদের দলের সার্জেণ্টটি ক্যাপ্টেনের হয়ে সই করে মদটুকু নিয়ে আসে এবং সবাই মিলে প্রাণভরে খায়। এজন্য সার্জেণ্টকে দশ ঘা চাবুক খেতে হয়েছে। আর সবাই খেয়েছে চার ঘা করে। তা এর জন্য এ শাস্তি নেওয়া যায়।

সেই রামের বাকীটুকুই আছে এদের কাছে। যা আছে তাতেও আমাদের সবাইর বেশ খানিকটা করে হয়। আগুনে তাতিয়ে আমরা আস্তে আস্তে খাই।

স্বাধীনতার স্মরণে তখন 'টোস্ট' করা হয়: জন ও স্যাম আদমসের উদ্দেশ্যে...ব্যাটাদের ফাঁসি হোক।

মহাদেশীয় কংগ্রেস নরকে পচে মরুক!

আমাশায় তাদের পেট পচে-খসে যাক!

আগুনের চারপাশে বসে আমরা একটু একটু মদ খাচ্ছি আর বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনছি। বৃষ্টির একটানা টাপটুপ শব্দের মধ্যে কেমন একটা ঘুমপাড়ানি আমেজ আছে।

পেনসিলভানিয়ার লোকটি কেনটনের কথা তোলে।

বেশ জোয়ান লোক ছিল। মানুষের মত মানুষ!

দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার মানুষ সে নয়। সে জানত লড়ে কেমন করে জিততে হয়।

চালির ইতিমধ্যেই খানিকটা নেশা হয়েছে। বেশী কতগুলো মদ গিলবার অভ্যাস আমাদের নেই। তাছাড়া পেটেও এমন খাবার নেই যে মদের কড়া ঝাঁজ সামলাতে পারি। চালি বলে, আমাদের জন্যই সে প্রাণ দিয়েছে। ফাঁসিতে মরার বড় ভয় ছিল কেনটনের। তবু সে আমাদের জন্য মরেছে।

মুলার ব্যাটা নরকে যাবে। হরিণের কথা মনে করে ব্যাটা কেনটনের পর শোধ তুলেছে।

সেদিন অমন দুটো ভাল হরিণ উপহার দেবার কথা বহু পেনসিল-ভানিয়ার লোকেই ভুলবে না।

মুলার ব্যাটারও মনে থাকবে ঘটনাটা।

এলি বলে, কেনটনকে শান্তিতে থাকতে দাও। ছাউনিতে এমন কোন কিছু পাবে না যার জন্য রক্তের মূল্য দিতে হয়নি।

ফাঁসিতে মরলে কোনদিন শান্তি পাওয়া যায় না।

খুব যায়।

পেনসিলভানিয়ার জনকয়েকের সঙ্গে তাদের সঙ্গিনীরাও রয়েছে। হাত বদল হচ্ছে মেয়েরা। করও কোন দ্বেষ নেই সেজন্য। কেউ হয়ত মারা গেল, কিন্তু তার সঙ্গিনী বেঁচে রইল। এত দুঃখকষ্ট ভুগেছি যে আমাদের মধ্য থেকে ঈর্ষা লোপ পেয়েছে। অদ্ভুত জীব এই শিবির-সঙ্গিনী দল। এককালে এদের অনেকেই ভাল ছিল। ভালবাসার লোক যুদ্ধে আসছে, বিয়ে করে মেয়েটিও সঙ্গে আসে। তারপর হয়ত সঙ্গী মারা গেছে কিম্বা তাকে ফেলে পালিয়েছে। মেয়েটির তখন দাঁড়াবার জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে শিবিরের সঙ্গেই চলতে হয়েছে···গা ঢেলে দিতে হয়েছে শিবিরের জীবনে। অনবরত হাত বদল হয়ে ঘুরছে মেয়েরা আর পুরুষের ক্ষুধা মিটিয়েছে। মানুষের মধ্যে জানোয়ারের রূপ দেখেছে এরা। কে জানে, হয়ত এদের জন্যই এখনও আমরা মানুষ আছি।

আগুনের পাশে শুয়ে করুণ একটি ওলন্দাজ গান গাই। নিউ ইয়র্ক আর পেনসিলভানিয়ার নদীর তীরে একশো বছর ধরে পাওয়া হচ্ছে এ গান।

এদিকে চালের উপর বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম।

আরও দুদিন বৃষ্টি চলে। তারপর মেঘলা ভেজা দিনে হুকুম আসে যে সেইদিনই গোটা পল্টনের 'রিভিউ' হবে। সংবাদটা মুলার নিজেই

নিয়ে আসে। পরিখায় ঢুকে বলে, গর্ত থেকে বেরিয়ে সাফ-সাফাই হয়ে নাও।

আমাদের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই সে হেসে ফেলে। লোকটার সাহস আছে বলতে হবে। পরিখায় ঢুকে বলে, কিরিচ উঁচিয়ে প্যারেড করবে। গটমট করে হাঁটবে।

পল্টন আবার চলতে শুরু করবে নাকি? এলি জিজ্ঞাসা করে।

জানি না।

একটু বাদেই জেনারেল ওয়েন আস্তানায় ঢুকে পড়েন। আপনা থেকেই আমরা 'এটেনশন' হয়ে দাঁড়াই। ওয়েনের মধ্যে এ একটা সহজ স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব আছে···ফিকে নীল চোখে আছে আগুনের ঝিলিক। মুলারকে দেখে আমরা নড়িনি।

কোন কথা না বলে তিনি পরিখার চারিদিক ঘুরে দেখেন। মাস্কেট হাতে নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং চকমকি পরখ করেন। তারপর মাথা ঝেঁকে বলেন, সৈনিক তোমরা, জাহান্নামে গেলেও সৈনিক তার বন্দুকটা ঠিক রাখে। একে একে তিনি আমাদের সবাইর পায়ের দিকে তাকান। এলির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, হাঁটতে পার?

পারি স্যর। এলি বলে।

ভগবান সাক্ষী, জুতোর জন্য কত অনুনয় যে করেছি! তবে শিগগিরই পাওয়া যাবে হয়ত।

আমারও তাই বিশ্বাস স্যর। তবে শঙ্কা হয়, আর কোন জুতোই আমার পায়ে খাটবে না।

বড় দুঃখের কথা। দরদভরা কণ্ঠে ওয়েন বলেন।

দরজার কাছে গিয়ে সরাসরি তিনি বলেন, নিউ ইয়র্কের লোক তোমরা; কিন্তু এখন আমার সৈন্য দলে আছ। সবাই আমরা নরক

দেখেছি। সামরিক বিচারের সময় আমি তোমাদের হয়ে অনুনয় করেছিলাম। এই কথা বলেই তিনি বেরিয়ে যান।

বাইরে এসে আমরা ব্রিগেডের মত দাঁড়াই। বরফ গলে জল-কাদা হয়েছে। প্রতিপদে পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে। ভেরী-বাজিয়েরা দাঁড়িয়ে ঢ্যাবঢেবে ভেরী কড়া করবার চেষ্টা করছে। সর্বত্র চলাচলতি ও ব্যস্ততার ভাব। চারিদিকে নতুন জীবনের সাড়া। অবশেষে মার্চ করবার হুকুম আসে। পেনসিলভানিয়ার লাইনে মাত্র আটশোজন আছে।

গাছের ফাঁক দিয়ে চলেছি। বরফ গলা জল পড়ছে গায়ে-মাথায়। গালফ রোডে এসে আমরা মাসাচুসেট্সের রেজিমেণ্টগুলোর পেছনে পড়ি। ভার্জিনিয়ানরা আমাদের পেছনে আসছে। চাপা গলায় টেনে টেনে গালাগাল দিচ্ছে তারা। আমরাও ফিরিয়ে গালাগাল করছি।

মার্চ করে আমরা প্যারেডের মাঠে নেমে পড়ি। মাঠের ওধারে রোড দ্বীপের সৈনিকেরা আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। তাদের পাশে মেরিল্যাণ্ডের ব্রিগেড। লম্বা নিউ জার্সির সৈনিকেরা আছে তাদের পাশে। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। শীর্ণ দাড়িওলা ফ্যাকাশে মুখ নোংরা সৈনিকদল এক অদ্ভুত পল্টন গড়েছে। কারও গায়ে আস্ত পরিচ্ছন্ন একটা জামাকাপড় নেই এ যেন নরক ফেরতা এক পল্টন। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কুড়নো বিকলাঙ্গ একদল ভিখারীর মিছিল।

ভেরী বাজিয়েরা সামনে এগিয়ে এক পক্কর বাজায়। কিন্তু ভেরীর আওয়াজও যেন কেমন মিয়ানো। ভেরীর চামড়া ভিজে গেছে। মাথার উপরে নীচু দিয়ে মেঘ ভেসে বেড়ায়। শুয়েলকিল নদীতে বরফ ভাঙবার কড়কড় শব্দ। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

ওয়াশিংটন তাঁর স্টাফ নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসেন। প্যারেডের মাঝখানে এসে তাঁরা ঘোড়া থেকে নামেন। বরফ গলা কাদার মধ্যে

দাঁড়িয়ে সৈনিকেরা প্রতীক্ষা করছে। ওয়াশিংটনের সঙ্গে একটি অচেনা লোক আছে। সকলের চোখ তার দিকে। সোনার ফিতে লাগানো নীল ও সাদা উর্দি তার গায়ে। মাথায় সাদা টুপি। পায়ে উঁচু গোড়ালির কালো বুট। আমরা তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু কেউ জানে না।

আস্তে আস্তে তিনি পেনসিলভানিয়ার লাইনের দিকে এগিয়ে আসেন। ওয়াশিংটন তাঁর পেছনে আসেন। ওয়েন এগিয়ে গিয়ে তাঁর করমর্দন করেন এবং তিনজনে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে থাকেন। ওরা এত দূরে যে কোন কথাই শুনতে পাচ্ছিনে। সহসা অচেনা লোকটি হো হো করে হেসে ওঠেন। এমন প্রাণ খোলা হাসি অনেক মাস শুনতে পাইনি। এতে ফল হয়। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি আমরা।

টান হয়ে তিনি সৈন্যদলের দিকে এগিয়ে আসেন। বেশ গাট্টাগোট্টা লোকটি। মুখখানা বেশ চওড়া চ্যাপটা ধরনের। পা দিয়ে লাথি মেরে লোকটি বরফ গলা জল-কাদা ছিটিয়ে দিচ্ছে। আমাদের কয়েক গজ সামনে তিনি থেমে দাঁড়ান। চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে। ঘাড় বাঁকিয়ে প্রতিটি সৈনিককে লক্ষ্য করে দেখতে দেখতে তিনি হাঁটতে থাকেন। ব্রিচেজ নেই এমন একটি সৈনিকের কাছে আসে লোকটি। এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় ঘাঘরার মত জড়িয়ে লজ্জা ঢেকেছে সৈনিকটি। আগন্তুক থেমে দাঁড়ান। পলকের জন্য তিনি সরাসরি সামনে তাকান। তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে মনমরা ভাবে সৈনিকটির দিকে ফেরেন। আবার ঘুরে যায় মাথাটা। হতাশ চোখে তিনি জেনারেল ওয়াশিংটনকে খোঁজেন। তারপর আবার তাকান ছেঁড়া ঘাঘরা-পরা লোকটির দিকে। আমাদের ভারি মজা লাগে। হাসতে শুরু করি। অন্যান্য সৈনিকেরাও হেসে ওঠে। সহসা এক পশলা বৃষ্টি আসে। তবু হাসে সৈনিকেরা।

ওয়েন বলেন, ভুলে যাবেন না ব্যারন, শীতকালে নরকের দুর্ভোগ ভুগেছি।

অচেনা লোকটি জার্মান ভাষায় জবাব দেন।

নিশ্চয় মনে রাখতে হবে একথা।

অচেনা লোকটি আবার মাথা ঘোরান। তারপর গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে যান সৈনিকটির দিকে। সৈনিকটিকে চিনি। তার নাম এনক ফারের। লম্বা পাতলা চেহারা। অচেনা লোকটি এগিয়ে আসতেই সৈনিকটি পিছয়ে যায়। নীচু হয়ে হাঁটু ঢাকবার চেষ্টা করে।

অচেনা লোকটি ডাকেন, এদিকে এস।

এনক্ জার্মান জানে না।

এদিকে এসে ফিরে দাঁড়াও।

জার্মান ভাষা বুঝবার মত ওলন্দাজ আমার জানা আছে। পেনসিলভানিয়ার অধিকাংশ লোকেই সামান্য ওলন্দাজ বা জার্মান বলতে পারে। ফারের পেনসিলভানিয়ার উত্তর অঞ্চলের লোক এবং ইংরেজ বাপ-মায়ের সন্তান। ঘাঘরাটা হাঁটু অবধি টেনে দেবার চেষ্টা করে সে খানিকটা পিছিয়ে যায়। তারপর মাস্কেটটা ফেলে দেয়।

দুত্তোর ছাই, একদম ভিজে গেছে। বন্দুকটা হাতড়ে বলে।—আপনি কে মিস্টার ?

অচেনা লোকটি হো হো করে হেসে ওঠেন। হাসির চোটে তার সারা দেহ কাঁপতে থাকে। করতালি দিয়ে তিনি ডাইনে বাঁয়ে দুলতে থাকেন। ওয়াশিংটন ওয়েন আর গ্রীন ক্ষুব্ধভাবে নীরবে তাঁর ভাবসাব লক্ষ্য করেন। মস্ত বড় মাথা ঝেঁকে বরফের মধ্যে হোঁচট খেয়ে তিনি তাঁদের দিকে ফিরে তাকান।

মাফ করবেন, সত্যিই আমি দুঃখিত। ইয়োরোপে কিন্তু অদ্ভুত এক পল্টনের গল্প শুনেছি। এমন পল্টনের কথা শুনেছি যারা শেষ

অবধি ইংরেজদের রুখে যাচ্ছে। সে বাহিনীকে নাকি গোটা আমেরিকা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ইংরেজরা।

বন্দুক আমাদের আছে স্যর। টান হয়ে দাঁড়িয়ে ওয়াশিংটন বলেন।

জানি। সত্যিই আমি দুঃখিত। মাফ করবেন। তবু তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকেন। হাসি সামলাবার সাধ্য তাঁর নেই।

ব্যারন ফন স্টুবেনকে এই আমরা প্রথম দেখি। পেনসিল-ভানিয়ানদের কাছেই তিনি প্রথম আসেন। এমন এক সময়ে তিনি এসেছেন যখন আমরা সাবাড় হয়ে গেছি।

সেদিন পুরো তিন ঘণ্টা আমরা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি। ভিজে চুপচুপ হই। ঠাণ্ডায় প্রায় অসাড় হয়ে যাই। ঐ গাট্টাগোট্টা হোঁতকা জার্মানটি ছাড়া আর কোন কিছু আমাদের ধরে রাখতে পারত না। সামনে পেছনে ছুটাছুটি করে তিনি আমাদের চুটিয়ে গালাগাল করেন। আমাদের মুখ চোখের শূন্যদৃষ্টি দেখে হাসিতে ফেটে পড়েন।

আমাদের মন পেছনে ফিরে যায়। হয়ত বোস্টনের বাঙ্কার পাহাড়ের কথা মনে পড়ে। বিশৃঙ্খল এক জনতা হঠাৎ সেদিন পল্টন হয়ে পড়ে।

অধীরভাবে তিনি আমাদের সারির সামনে-পেছনে ছুটাছুট করেন। কোন সৈনিকের হাত থেকে মাস্কেট ছিনিয়ে নিয়ে নিজে ঠিকমত ধরে জার্মান ভাষায় গর্জে ওঠেন, এই ভাবে। ছুত্তোর চাষা ভূত, এইভাবে ধরতে হয়! এটা বন্দুক—কাঠের গুঁড়ি নয়! বুঝলে? এইভাবে ধর।

আবার তিনি মাসাচুসেটসের এক চাষীর হাতে বন্দুকটা ফিরিয়ে দেন। লোকটি যে-ভাবে বন্দুক ধরেছিল, আবার তেমনি আনাড়ীর মতই ধরে থাকে।

ব্যারন তখন আবার বন্দুকটি ছিনিয়ে নেন। ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে বলেন, এই ভাবে…এইভাবে, বুঝলে শূয়োর! গাধা চাষী কোথাকার।

সৈনিকটির চোখে শূন্যদৃষ্টি। মুখে ক্যাবলার মত হাসি। ব্যারন

তখন রাগে গোঁ গোঁ করে বন্দুকটি ফিরিয়ে দেন এবং মাথা ঝোঁকে গজ গজ করে পায়চারি করতে থাকেন।

এই দিয়ে পল্টন গড়তে হবে! হা ভগবান! এদের গড়েপিটে পল্টন বানাতে হবে!

আবার কোন সময় তিনি হয়ত হা হা করে হেসে উঠতেন। বিরাট জানোয়ারের হাসির মত সে হাসি ছড়িয়ে পড়ত সারা প্যারেডের মাঠে। তারপর আবার নতুন করে তালিম দিতেন।

পল্টনের গোড়ার কথা···এক দো তিন চার!

শূন্য অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সৈন্যদল।

হা ভগবান! এদের নচ্ছার ভাষা যদি বলতে পারতাম! এই বর্বর ভাষা বলতে শিখিনি কেন?

তিনি আমাদের মার্চ করান। একবার সামনে নিয়ে যান, আবার পেছনে নিয়ে আসেন। প্যারেডের মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে হুকুম দেন। আমরা যখন মার্চ করতে শুরু করি ঘোড়ায় চড়ে সামনে পেছনে ছুটাছুটি করেন—ধমক দিয়ে যথারীতি লাইনে রাখবার চেষ্টা করেন।

লাইনে থাক···লাইন ভেঙনা···চোখ ডাইনে রাখ। দোহাই ওয়েন, আমার হয়ে ওদের বুঝিয়ে দাও না।

বৃষ্টির জোর বাড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা প্যারেড করি আর স্টুবেন ছুটোছুটি করে গালাগাল দেন। আমাদের বিশ্রাম দেবার জন্য ওয়াশিংটন তাকে অনুরোধ করেন। তিনি রাজী হলেন না। অনবরত আমাদের তাড়িয়ে বেড়ান।

বেহদ্দ ক্লান্ত হয়ে মড়ার মত অবস্থায় বৃষ্টির মধ্যে আমরা আস্তানায় ফিরে আসি এবং ভাল করে আগুন জেলে ঠাণ্ডা ও ক্লান্তিতে কাঁপতে কাঁপতে গুটিসুটি মেরে তার চারপাশে বসে পড়ি।

জেকবের মুখে কিন্তু হাসি ফুটেছে। আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে সহাস দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে শিখার দিকে। এতদিনে একটা মানুষের মত মানুষ এবং সাচ্চা অফিসার পেয়েছে সে।

—আঠারো—

ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি আসে। মাঝে মাঝে রোদের ঝিলিক। কালো এবং ধোঁয়াটে মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। অবিরাম বর্ষণে বরফ গলে জল হচ্ছে, আর জল হচ্ছে কালো কাদা। আস্তানার ফুটো দিয়ে জল গড়াচ্ছে। মেজে প্যাচপ্যাচ করছে কাদায়। কাদা মাখা ভূত হয়েছি আমরা।

একদিন হয়ত রোদ উঠবে।

ভদ্রলোক ব্যারন ফন স্টুবেন আমাদের সুস্থ থাকতে দিচ্ছেন না। মনে হয় জার্মান ভদ্রলোক হাওয়ার প্রতিকূলে চলেছেন। কে তিনি? কি চায় লোকটা? যে সামান্য শ'কয়েক লোক আছে তাই দিয়ে তিনি পল্টন গড়তে চান নাকি? বিপ্লবী বাহিনী আবার হাসতে শিখছে; হাসছে নিজেদের দুরবস্থা ভেবে···সামান্য কয়েকশো দুর্গত লোকের করুণ অবস্থা দেখে।

ডিসেম্বর মাসে এগারো হাজার লোক এসেছিল এই ফোর্জ উপত্যকায়। আজকে অর্দ্ধেক পরিখা শূন্য। চাল ভেঙে পড়ছে। পেনসিলভানিয়ার লাইনে এক একটি রেজিমেণ্টে দু'তিন জন বেঁচে আছে।

তবু স্টুবেন আমাদের স্থির থাকতে দিচ্ছেন না। ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন বৃষ্টির মধ্যে। টেনে নিচ্ছেন প্যারেডের মাঠে। ভেজা চামড়ার পর ড্রামের ঢ্যাব-ঢ্যাবানি লেগেই আছে। হুকুম আসে,

ব্রিগেডের ধাঁচে দাঁড়াও। কাদার মধ্যে পট্টি বাঁধা পা টেনে আমরা ড্রিল করি। জার্মানটির 'এক দুই তিন চার' আমরা বুঝি। লাইন থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় কেউ কেউ। কিরিচ চার্জ করবার হুকুম শুনে জীর্ণবাস শীর্ণদেহ একটি ছোট্ট লাইন বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে যায়। আবার সার বাঁধ···ফের চার্জ কর। বারবার চলে এই সামরিক শিক্ষা। শেষে এমন অবস্থা হয় যে আমাদের সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত থাকে না। দাড়ি দিয়ে জল বেয়ে পড়ে টুপটুপ করে। খোঁড়ার মত বেঁকে দাঁড়াই। পরস্পরের মুখের দিকে চাই। তারপর হেসে উঠি। দুঃখ-দুর্গতির চরম অবস্থায় পৌছেছি। আর নীচুতে নামা যায় না। এ দুনিয়ার জানোয়ার আমরা।

স্ট্যুবেন তখন আরো জোরে জোরে হুকুম করেন। আমরা খোঁড়ার মত কাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। শক্তিহীনের কাছ থেকে এমন বেশী কি আর আশা করা যায়? স্ট্যুবেন তখন অনুনয় করেন।

আর একবার কর না ছেলেরা।

খালি মাথায় বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। তাঁর উর্দির সোনার ফিতের বাহার আর নেই। সাদা ব্রিচেজ ময়লা লেগে মেটে রঙ ধরেছে। প্রত্যেকের কাছে কাছে গিয়ে তিনি অনুনয় করেন। মাঝে মাঝে চটে ওঠেন। গলা ছেড়ে চেঁচান কখনও। তারপর আবার মেয়েদের মত শান্ত হয়ে যান। মাস্কেট হাতে নিয়ে নিজেই ড্রিল করে দেখান।

আমার কথা শোন। তোমাদের দিয়ে আমি পল্টন গড়ছি না···গড়ছি একটা জাতি। তোমরা এবং আমি একসঙ্গে জয় গৌরবে এই দেশের মধ্য দিয়ে মার্চ করে যাব। বুঝলে?

আমরা ভিখারীর মত করুণভাবে দাঁড়িয়ে থাকি।

ঠিক আছে···আজ বাড়ী চলে যাও।

জেকব এলি এবং আমি আস্তানায় ফিরে আসি। জ্বর হয়েছে চার্লির। চাবকাবার পর যে জ্বর হয় সেই জ্বরই চলছে হয়ত। অবিরাম কাশছে। মাঝে মাঝে ঠোঁটে শুকনো-লাল দাগ দেখা যায়!

জলে ভিজে ক্লান্ত হয়ে আমরা আস্তানায় ফিরি। ঢুকেই সবাই আগুনের কাছে যাই। আগুনটা আরও বড় করে জ্বালান হয়। বৃষ্টির জোর বেড়েছে। নুড়ির মত টুপটাপ পড়ছে চালে।

চার্লি আমায় ডাকে, আলেন…

একখানা কম্বল নিয়ে তার বিছানার কাছে যাই। সেখানে বসে বন্দুকের জল কাদা মুছে ফেলি। তার সঙ্গিনী এখন আর তার সঙ্গে শোয় না। মাঝে মাঝে পরিখায় এসে গল্প করে যায়। যে করেই হোক, বেঁটে মুদ্রাপকের আদর-যত্ন তাকে করতে হচ্ছে। এখন আস্তানার বিপরীত দিকে বসে সে আমাদের লক্ষ্য করছে।

কিছুটা ভাল আছ? আমি জিজ্ঞাসা করি।—গায়ের জ্বরটা তেমন বেশী লাগছে না তো চার্লি!

আমার হয়ে এসেছে আলেন!

এ পুরুষের কথা নয়। নেহাৎ বোকারাই এভাবে কথা বলে।

একটা শপথ তোমায় করতে হবে আলেন! বল, কবর দেবে আমাকে! মানুষের মাথা সমান গর্ত খুঁড়ে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। শীতে পড়ে থাকবার বড় ভয় আমার। যতটা অবধি মাটি জমে যায় তার নীচে থাকতে চাই।

বোকার মত কি বলছ?

কবর তোমায় দিতেই হবে আলেন।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আমি উঠে দাঁড়াই এবং মাস্কেটটা রেখে দিই। চোখ বুজে শুয়ে আছে চার্লি।…ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে গলায়। আমি সরে আগুনের কাছে যাই।

ওর অবস্থা ভাল নয়। জেকব বলে।

চাবকানিতে শেষ করেছে। কেনটন বাঁচত।

শিগগিরই বৃষ্টি থেমে যাবে; তারপর জোর পাবে।

ওর রক্ত ঝরাবার ব্যবস্থা করা দরকার।

না হয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হয়। শুনলাম, বোস্টন থেকে নাকি নতুন দুজন ডাক্তার এসেছে।

না, হাসপাতালে আর নয়। বিড়বিড় করে আমি বলি।—ওখান থেকে কেউ ফেরে না।

হাসপাতালে গিয়ে আমিও বাঁচতে চাই না।

পরদিন এলি হাসপাতালে যায়। বৃষ্টি ভিজে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে বলে, কোন ডাক্তার পরিখায় আসতে চায় না।

আসবার কথা বলেছিলে?

বল্লে, এখানে নিয়ে এস। হাসপাতালে যাওয়া আর নরকে যাওয়া সমান। তাকে তাকে ওরা বিছানা বনিয়েছে। রোগীরা এত ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে আছে যে কারও পাশ ফিরবার সাধ্য নেই। ডাক্তাররা বোস্টনের লোক। কোনদিকেই তাদের খেয়াল নেই।

তাহলে কি সেখানেই নিয়ে যাবে?

এলি মাথা ঝাঁকায়। চার্লির বিছানার কাছে যায় সে। চোখ বুজে সেখানে শুয়ে আস্তে আস্তে কথা বলে।

রক্ত ঝরাবার বন্দোবস্ত কর। মেরি বলে।

আমায় দিয়ে হবে না। বিড়বিড় করে বলে এলি।—ওর মধ্যে আমি নেই।

কি দশা হয়েছে দেখছ না! ভাল বলছি রক্ত ঝরাবার···

করলেই ভাল হয়। জেকব বলে।—তাতে রক্তের দোষ কেটে যাবে।

মাথা নেড়ে সায় দেয় এলি। আমি একটা পাত্র নিয়ে আসি। জেকব পাথরের পর ছুরি শানায় এবং তারপর ঠিক কনুইর উপরে চার্লির বাহুর একটা শিরা কেটে ফেলে। চার্লি কোন যন্ত্রণা পেয়েছে বলে মনে হয় না। আপন মনে প্রলাপ বকে যায়। শিরাটা পেলেও রক্ত মোক্ষণে জেকব ওস্তাদ নয়। প্রায় গোটা শিরাটাই কেটে ফেলে। ধারায় গাঢ় লাল রক্ত গড়িয়ে পড়ে। রক্তের তোড় দেখে আমি ঘাবড়ে যাই। দেখে মনে হয় না যে অত রক্ত পড়লে কোন মনুষ বাঁচতে পারে।

বন্ধ কর! আমি চেঁচিয়ে উঠি।—অমন করে রক্ত পড়লে মরে যাবে।

জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত পারা যায় না আলেন। ফিসফিস করে বলে এলি।—নয়তো পাগল হয়ে মারা যাবে। জ্ঞান ফিরে আসুক!

পাত্রটি রক্তে ভরে যায়। চার্লির মুখের লালচে আভা মিলিয়ে যায়। চামড়ার রঙ কালচে ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চোখ মেলে। একে একে সবাইর মুখের দিকে তাকায়। সবাইকেই চিনতে পারে। যে করেই হোক তার মুখে হাসি ফোটে।

আনাড়ীর মত আমরা তার হাত বেঁধে দিই। কিন্তু পুরোপুরি রক্ত বন্ধ করা যায় না। ব্যাণ্ডেজের তলা দিয়ে তবু চুঁইয়ে বেরোয়। কিছুটা পরেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।

দিন কয়েকের মধ্যেই নতুন মানুষ হবে। এলি বলে।

তারও আগে। ফিসফিস করে বলে চার্লি।—আজ রাত্রেই বৃষ্টি থামবে এলি। আমি ঠিক বলতে পারি। তারপর পৃথিবীতে শান্তি আসবে।

আমরা মাথা নেড়ে সায় দিই। চার্লির সঙ্গিনী আলাদা একটা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। শুনতে পাই, আস্তে আস্তে প্রার্থনা করছে সে।

আমি কেনটনের কাছে যাব। সে বলে।—কেনটনকে ছেড়ে থাকা আমার কোন মতেই উচিত নয়।

সে রাত্রে আমি পাহারা দিতে যাই। পশ্চিমা বাতাসে আকাশ পরিস্কার হয়ে গেছে। পৃথিবীর মাথায় ঝুলছে অগুনতি নক্ষত্রের আলো।

ধীরে সুস্থে পায়চারি করছি। মাটির রঙ বদলে গেছে।…ঘোমটা খুলে এক নতুন পৃথিবী যেন জন্ম নিচ্ছে। অধিকাংশ জায়গার বরফ গলে গে ছ। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সেখানে বরফ স্তূপাকার হয়েছিল, সেখানে তখনও বরফ আছে। কিন্তু তার বেশীর ভাগ ধুয়ে গেছে। বাতাসের গতি মৃদু অথচ ঠাণ্ডা।

নরম মাটিতে পা ডেবে যাচ্ছে। একবার নীচু হয়ে আমি এক চাপড়া শুকনো হলদেটে ঘাস স্পর্শ করি। আঙুল দিয়ে একটি ঘাসের পাতা ছিঁড়ে আনি।

দ্বিতীয় প্রহরীর সাথে দেখা হয়। দুজনে একসাথে দাঁড়িয়ে থাকি। অপেক্ষা করি তৃতীয় শাস্ত্রীর জন্য। স্বপ্নাবিষ্টের মত মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে এগিয়ে আসে।

বাতাসে নতুন ঋতুর গন্ধ…

বসন্ত আসছে।

আবার সবুজ ঘাস গজাবে—গরম হাওয়া বাইবে। মাঠে মাঠে ভুট্টা ফলবে।

চাষ আবাদের এমন সময় আর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

লাঙলে ঘোড়া জুতবার আর জমিতে লাঙল দেবার চমৎকার সময়। নতুন উলটানো মাটির গন্ধ কি মধুর!

লোকাস্ট গাছেই প্রথম ফুল ফোটে। নদীর পার বরাবর আমাদের বাড়ীতে প্রচুর লোকাস্ট গাছ। পেনসিলভানিয়া মুলুকের চমৎকার গাছ এটা।

তুমি তো মোহকের লোক আলেন। তোমাদের দেশে খুব ভাল ফসল আর ভাল বাগান হয় নাকি?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিই। আমার এলির আর জেকবের সামরিক চাকুরীর মেয়াদ শিগগিরই শেষ হবে। এখন তিনজনেই ঠেকেছে।

তুমি বাড়ী যাবে আলেন?

অবাক হয়ে আমি পেনসিলভানিয়ার লোকটির দিকে তাকাই। বলি, অনেক দূর—একলা হেঁটে যাওয়া অসম্ভব।

আর কেউ যাবে না তোমার সঙ্গে?

জানি না।

বসন্তের ফুল ফুটলেই আবার লড়াই হবে। পেনসিলভানিয়ানদের একজন বলে।—আবার শুরু হবে সৈন্য চলাচল।

শুনলাম হাউ নাকি ছাউনি আক্রমণ করবে?

বুড়োও আমাদের এখানে রাখবেন বলে মনে হয় না। তিনিও বেরিয়ে পড়বেন।

কি আর আছে পল্টনের।

যা বলছি মনে রেখ, আবার নতুন লোক আসবে। চাষ-আবাদের পর শত শত লোক আসবে দেখ।

জার্মান ব্যারন তাদের শেখাবে।

বাতাসটা কেমন লাগছে দেখ।

হাঁ গরম গরম লাগছে। কেমন অদ্ভুত একটা গরম আমেজ আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের বাতাস।

কাল বেশ পরিষ্কার রোদ উঠবে।

হাঁ, বেশ গরম রোদ উঠবে!

বরফের ধাক্কায় নদীর পুলটা ভেঙে গেছে। মেরিল্যাণ্ডের লোকজন গলা জলে দাঁড়িয়ে আবার পুল সেরেছে।

মেরিল্যাণ্ডের লোকগুলোকে দেখতে পরি না।

না বরফ জলে দাঁড়ান লোকদের হিংসে কর।

আবার আমরা আলাদা হয়ে যাই। হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আবার নিজ নিজ 'বিটে' পাহারা দিতে শুরু করি। মাটি থেকে পা টেনে তুলবার সময় একটা প্যাচ্‌প্যাচ্‌ শব্দ হয়। কামানের ঘাঁটির কাছে এসে আমি একটি কামানের মুখে হেলান দিয়ে দাঁড়াই। কামানের মুখের ঠাণ্ডাটা হাতে বেশ ভালই লাগে। এত পরিবর্তন আমার হয়েছে যে দারুণ শীতের পরেও ঠাণ্ডা উপভোগ করতে পারি।

বাড়ী যাবার কথা মনে পড়ে। এলি জেকব এবং আমি তিনজনেই যাব। মনে মনে মোহক উপত্যকার কচি সবুজ ঘাসের ছবি আঁকবার চেষ্টা করি। মনে হয়, আগের দিন আর ফিরবে না। বেশ বুঝতে পারি, সে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। ভাববার চেষ্টা করি, আমি যেন লাঙল দিচ্ছি আর নরম মাটি চিরে যাচ্ছে। তারপর আবার মাথা ঝাঁকাই। নিজের মনের অস্বস্তি যায় না। ভয় হিংসা কি দুঃখ কিছুই এ অস্বস্তি ঘুচাতে পারে না। নিরন্তর এগিয়ে চলাই আমাদের বিধিলিপি।

জেকব এসে আমাকে ছুটি দেয়। আস্তে আস্তে হাঁটে সে। আমার দিকে তাকায়নি। বলে, পরিখায় যাও আলেন।

ভারি সুন্দর রাত, না জেকব? পশ্চিমা বাতাস টের পাচ্ছ?

সে মাথা নাড়ে।

বেশ গরম হাওয়া। গেছে গ্রীষ্মের একটা ঘাসের পাতা আমি কুড়িয়েছিলাম জেকব।

আকাশও নীল হবে, না জেকব?

তারপর আমি আস্তানায় ফিরে আসি। ঢুকে মনে হয়, কি যেন একটা হয়েছে। তারপর দেখি, চালির সঙ্গিনী হাঁটু ভেঙে তার বিছানার

পাশে বসে আছে। আমি আগুনের কাছে গিয়ে বসে পড়ি। চেয়ে থাকি আঁকাবাঁকা শিখার দিকে। গোটা শীতকাল রাতের পর রাত এমনি আগুন জ্বলেছে।

এলি বলে, সইতে হবে আলেন।

মনে পড়ে ওয়াশিংটনের কথা। কত সইতে পারা যায়? নবাগতের মত কৌতূহলী চোখে আমি পরিষ্কার ধোঁয়ায় কালো গাছের গুঁড়ি, মেজেয় সঞ্চিত ময়লা, দুই তাকের সাজান দেয়ালে লাগানো বিছানা এবং কাঠের গোঁজে ঝুলান খান কয়েক ছেঁড়া ন্যাকড়ার দিকে তাকাই। মাস্কেটের তাক আছে একটা। সেখানে মস ফুলার, ক্লার্ক ভ্যানডিয়ার, হেনরি লেন, আরন লেভি, কেনটন ব্রেন্নার, এডওয়ার্ড ফ্লাগ, মেয়ার স্মিথ এবং চার্লি গ্রীনের মাস্কেট পাঁজা-করা আছে।

নাম ডাকলে মাস্কেটে জবাব দেবে। প্রত্যেকটি এক একজনের প্রতীক। চার্লির মাস্কেটে রুপোর কাজ-করা। পল রিভারির হাতের কাজ। ক্লার্কের মাস্কেট ফরাসী দেশে তৈরী। নল-লম্বা উপত্যকা অঞ্চলের তৈরী মাস্কেটও আছে গুটি তিনেক।

এলিকে বলি, বৃষ্টি থেমে গেছে।

জানি। শান্তভাবে জবাব দেয় এলি। সেও চেয়ে আছে বন্দুকের দিকে। তার পাক-ধরা মস্ত মাথা হেঁট হয়ে পড়ে।

উঠে এসে সে আমার পাশে বসে। বলে, আজকে রাতে মেয়েদের এখানে না রাখাই ভাল।

আমি থাকব। চার্লির বিছানার পাশ থেকে মেরি বলে ওঠে।

আমি আমার সঙ্গিনীকে বেরিয়ে যাবার ইশারা করি। সে দরজার দিকে যায়।

ওদের বল যে তুমি আলেন হেলের সঙ্গিনী। তাহলেই থাকতে দেবে।

সেও বেরিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। সঙ্গিনী চলে যাবার পর এই ছোট্ট পরিখাটি কেমন শূন্য শূন্য লাগে।

এলি, মনে পড়ে উপত্যকা অঞ্চল থেকে তিনশো এসেছিলাম আমরা।

জানি।

একজনও কি ফিরবে?

পরদিন চার্লি গ্রীনকে কবর দেওয়া হয়। ডালপালা সহ গাছ দিয়ে তৈরী রক্ষা ব্যূহের সামান্য দূরে পাহাড়ের গায়ে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। এমন জায়গায় আমরা তাকে শুইয়ে রাখলাম যে ফিলাডেলফিয়ার কাছাকাছি নীল গিরিমালা চিরদিন তার চোখে পড়বে।

—উনিশ—

মাসাচুসেটসের জব এনড্রুজ একটা জিনিস দেখে যাবার জন্য চীৎকার করে আমাদের ডাকতে থাকে। শিশুর মত উৎফুল্ল হয়ে পাহাড়ের পাশ দিয়ে সে ছুটে যায়। আমরা তাকে ঘিরে ধরি। সে হাতের নরম লাল টাটকা ফুলটি দেখায়। বলে, এই প্রথম দেখলাম। শীতকালের ফুল।

ফুলটি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে। অবশেষে হাতে হাতেই সে-টি টুকরো টুকরো হয়ে যায়। নাকের কাছে নিয়ে সবাই গন্ধ শুঁকবার চেষ্টা করে। আমরা পরম যত্নে ফুলটিকে নাড়াচাড়া করি।

একটিই পেলাম। জব বলে।

পরে আরও পাওয়া যাবে।

নদীর পারে এমনি ফুল দেখেছি।

নীল আকাশের বুকে মেঘ পাক খাচ্ছে। আমরা তখন প্যারেডের

মাঠে যাই। ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে পশ্চিম থেকে। ছড়িয়ে দিচ্ছে বসন্তের সৌরভ। গ্রেটকোট কারও গায়ে নেই।

সৈনিকেরা সার বেঁধে দাঁড়ায়। ড্রাম বাজতে শুরু করে। ঘোড়ায় চড়ে স্টুবেন মাঠে আসেন। আমাদের মুখে হাসি ফোটে। এত দিনে ভালবাসবার মত একটা লোক পাওয়া গেছে। আমাদেরই মত কঠোর অমার্জিত চালচলনের লোক তিনি। মাটির কাছের মানুষ। তাহলেও মেয়েদের মত শান্ত আর ধৈর্যশীল।

ঘোড়া থেকে নেমে তিনি সৈন্যদলের দিকে হেঁটে আসেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজী রপ্ত করেছে লোকটি। হামেশাই তা ব্যবহার করেন। বলেন, বাছারা শোন।

আমরা হেসে উঠি। লোকটি আমাদের নতুন করে হাসতে শিখিয়েছে। ভগ্নোদ্যম শ' কয়েক সৈনিক আমরা। তবু তিনি আমাদের শ্রদ্ধা করেন। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

বাছারা শোন। আজ আমরা মার্চ করতে শিখব। যেখানে যেতে চাই, যা দখল করতে চাই, কি করে তা করতে হবে আজ তাই শিখব। ব্রিটিশদের যা আছে সব দখল করব, কেমন ?

আমরা তার নকল করে বলি : ঠিক ঠিক ব্যারন।

গ্রাণ্ড প্যারেডের মাঠে তখন কুচকাওয়াজ শুরু হয়। আমরা তখন পা তুলবার কায়দা শিখেছি—চলতে শিখেছি প্রুশিয়ান কায়দায়। সুশৃঙ্খলাভাবে ঘেষাঘেষি করে চলতে শিখেছি আমরা। দশজনে চলছি একজনের মত। কিরিচ ব্যবহারের কায়দাও রপ্ত করে নিয়েছি।

তিনি আমাদের অনুনয় করে বলেন, বাছারা শোন! কিরিচ দিয়ে তো আর রান্না করবে না! দোহাই, কিরিচগুলো সাফ-সাফাই করে রেখ।

ব্যারন আমাদের বসতে বলেন। স্টাফ অফিসারদল আপত্তি

জানায়। তাকে পাগল বলে উপহাস করে। আমরা তো জানোয়ার। যেটুকু শৃঙ্খলা আছে, তিনি নাকি তাও নষ্ট করছেন। প্যারেডের সময় লোকে বসে নাকি ?

স্ট্রবেন বুঝতে পারেন না। বারে বারে মাথা ঝাঁকান। জার্মান ভাষায় বলেন, গণতান্ত্রিক দেশের হাল আলাদা বলেই আমার ধারনা।

আমরা যুদ্ধরত ব্যারন।

জানি-জানি! যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমারও আছে। এ আমার নিজের কায়দা। ওরা বসুক।

উৎসুকভাবে তাঁর দিকে চেয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়ি। তিনি বলেন, আমি তোমাদের কিরিচ চালাবার কায়দা দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা লক্ষ্য কর। সৈন্যদলের মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে তিনি পছন্দসই একটা মাস্কেট ও কিরিচ খোঁজেন হাঁটতে হাঁটতে তাঁর ক্রোধ বেড়ে যায়। এক একটি মাস্কেট পরীক্ষা করেন আর বিরক্তি ভরে ফেলে দেন। অবশেষে চেঁচিয়ে বলেন, দুত্তোর ছাই! কেন যে এই অভিশপ্ত দেশে এসেছিলাম ? কেন যে এলাম এই চাষীর দেশে! রাগের চোটে তিনি গটমট করে চলতে থাকেন। আমরা নিরুত্তেজ ভাবে তাঁর ভাবসাব লক্ষ্য করি। জানি রাগ পড়বে। বহুত রাগ দেখেছি। খাঁচায় ভরা জন্তুর মত গোটা শীত কাল কাটিয়েছি।...জনকয়েকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ব্যারনের রাগ পড়ে। কিরিচ শুদ্ধ একটা বন্দুক নিয়ে তিনি আমাদের সামনে যান। আমাদের সেলাম করে বলেন, ভাল করে লক্ষ্য কর ছেলেরা।

ড্রিল করবার সময় তাঁর মত বেঁটে মোটা লোককে বিচ্ছিরি দেখায়। তাঁর পেছনে আমাদের ফৌজদারদের একটি দল। ক্ষোভ ও কৌতূহল ভরে তারা চেয়ে থাকে। স্ট্রবেন পেছনে হটে যায়...বোঁ করে ঘোরেন

এবং কিরিচ উঁচিয়ে আমাদের দিকে রুখে আসেন। শূন্যে খোঁচা মেরে তিনি বাঁকা ভাবে মোচড় দেন? তারপর কিরিচ টেনে আনেন।

ঠিক এইভাবে বুঝলে? ইংরেজরা আনাড়ী বোকা। প্রথমে কিরিচটা উঁচিয়ে ধরবে, তারপর একটু এগিয়ে যাবে—তারপর আচমকা বসিয়ে দেবে। আর একবার কিরিচ বসাবার কায়দাটা দেখিয়ে দেন তিনি। আমরা হেসে কুটি কুটি হই। চেঁচিয়ে বলি: আবার ব্যারন, আবার!

জেনারেল হাউর নাম করে আর একবার দেখান না ব্যারন।

সবটা আর একবার দেখান ব্যারন।

আমাদের হাসি দেখে তিনি চটে যান। তারপর নিজেই হাসিতে যোগ দেন। হাসতে হাসতে তার হাঁপ ধরে যায়!

হাঁ, এই বার উঠে পড়। এটেনশন্!

আবার সৈনিকেরা সার বেঁধে দাঁড়ায়। আবার শুরু হয় অন্তহীন ড্রিল। কিরিচের তাক কর…চার পা এগোও…বসিয়ে দাও। চার পা এগিয়ে বসাতে হবে। প্যারেডের মাঠের সর্বত্র আমরা মার্চ করে ঘুরে বেড়াই। এ কুচকাওয়াজের যেন শেষ নেই। চলছে তো চলছেই। শেষ অবধি আমাদের মাথা ঘুরতে শুরু করে। বার বার শূন্যে কিরিচ বসিয়ে হাত পাকাই। জীর্ণবাস সৈনিকদল নতুন করে শোনে।

স্টুবেন ক্লান্তিহীন। শুধু এই ড্রিল করানোই তিনি জানেন বলে মনে হয়। সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত্রি নেই—সব সময় তিনি ড্রিল করাচ্ছেন। বুঝিয়ে দিচ্ছেন কি করে কিরিচ সাফ করতে হবে। মাস্কেটের চকমকি ঠিক রাখবার জন্য কি করতে হবে আর কি করেই বা চট করে গুলি ভরবার জন্য বারুদ ভাগ করে রাখতে হবে—তা-ও বুঝিয়ে দেয়।

একবার তিনি আমাদের আস্তানায় আসেন। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। ড্রিলের পর বিছানায় শুয়ে আমরা বিশ্রাম করছি। তাকে ঢুকতে দেখেই চটপট উঠে দাঁড়াই। তিনি জার্মান ভাষায় বলেন, বস। আমার অনুরোধ, বস। জার্মান বোঝ?

আমরা মাথা ঝাঁকি। উৎসুক চোখে তিনি আস্তানার সব কিছু লক্ষ্য করেন।

সারা শীত এইখানেই ছিলে?

হাঁ।

আমাদের বন্দুকের তাকের দিকে ফিরে তিনি মনে মনে এক-দুই করে গোনেন। ঠোঁট দুখানা নড়তে থাকে।

আর যারা ছিল তারা কোথায়?

মরে গেছে।

আক্ষেপে মাথা ঝেঁকে তিনি আগুনের কাছে গিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। বিড়বিড় করে বলেন, অনেক বিভীষিকা দেখলাম। মানুষের এমন দুর্দশা দেখেছি যে…

ড্রিল যথারীতি চলতে থাকে। আমাদের স্বপ্নের রঙ লেগে আকাশ নীল হয়। শুয়েলকিলের পারে লোকাস্ট গাছে সবুজ কুড়ি দেখা দেয়। চার্লি গ্রীনের কবরের বাদামি মাটিতেও অগুনতি নতুন অঙ্কুর গজায়।

—কুড়ি—

এলির সঙ্গে পাহারায় বেরিয়েছি। বেশ পরিষ্কার ঠাণ্ডা রাত। দুজনে একসাথে চার্লির কবরের দিকে হেঁটে যাই। নীচু হয়ে কবরের মাটি থেকে একটা ঘাসের পাতা ছিঁড়ে আনলাম। তুলে ধরে দেখালাম এলিকে। হাতে নিয়ে সে একদৃষ্টে ঘাসের পাতাটির দিকে চেয়ে থাকে।

আমি বলি, ভেবেছিলাম চার্লি আমাদের সঙ্গেই থাকবে। ও যে মারা যাবে একথা ভাবতেই পারিনি।

এলি চিন্তিতভাবে বলে, এমন শীত আর হবে না। যেদিন তুমি ভূমিষ্ঠ হলে, সেদিন তোমার বাবার সঙ্গে আমি তোমাদের বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। তোমার মা সে কি করুণ আর্তনাদ করেছিলেন! সারারাত তিনি ব্যথায় ছটফট করেন। সকালবেলা তুমি ভূমিষ্ঠ হলে।

একমনে আমি তার কথা শুনে যাই। মনে হয়, বেশ বুড়োলোক এলি···অতীত পুরনো দিনের মানুষ।

এই বেজায় শীত···আমাদের এই দারুণ কষ্টের মধ্য থেকে একটা কিছু নিশ্চয়ি হবে অ্যালেন। কি হবে জানি না। লেখাপড়া জানা লোক আমি নই। কিন্তু আমরা তার জন্ম দিয়েছি, বুঝলে?

আমিও বলতে পারব না।

তুমি ছেলেমানুষ অ্যালেন। আমার বা জেকবের জন্য নয়, তোমরা নিজের জন্যই একটা কিছু গড়ে তুলছ।

কি, এলি?

একটা জীবন ধারা। মানুষের জন্য এক নতুন জগত। সুদূর পোলাণ্ড থেকে ইহুদিটি এসেছিল তার খোঁজে। যারা প্রাণ দিয়েছে…

কার জন্য? আমি জানতে চাই। কর্তারা নিজেদের ভুঁড়ি ভরেছে, কিন্তু আমাদের রেখেছে উপোসী।

পল্টনে কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তুমি বাড়ী ফিরে যাবে আলেন?

ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।

তুমি একটা কি খুঁজছ আলেন। খুঁজে বার কর। তার জন্য জোয়ান লোক চাই।

আমি ভাবছি এলির মত জোয়ান লোকের কথা। ভাবছি মস, কেনটন, চার্লির কথা। আজ হোক কি দুদিন বাদে হোক, আমার পালাও শিগ্‌গিরই আসবে। এলিকে বলি, হা ভগবান, বাড়ীর জন্য মন আনচান করছে।

সে মাথা নেড়ে সায় দেয়।

ও টান যে কি তা আমার জানা আছে আলেন।

তুমিও আমার সঙ্গে যাবে এলি? সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করি। তুমি আর জেকব, তিনজনেই আবার আমরা মোহক ফিরে যাব কি? আমি তার হাত চেপে ধরি।

বহু লোক এখানে প্রাণ দিয়েছে আলেন! মাথা ঝোঁকে সে বলে।

কিন্তু কেন এলি, কেন আমরা এইভাবে চলব? আমার ভয় করে এলি।

সে তখন মোলায়েমভাবে বলে, তুমি ফিরে যাও আলেন। যদি যাবার ইচ্ছে হয়ে থাকে তো চলে যাও।

আমরা তখন বিপরীত দিকে চলে যাই। বার বার ফিরে এলির শীর্ণ দেহের দিকে তাকাই। বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়েছে তার চেহারায়।

এলির রহস্যময় অনুভূতি আমায় ভড়কে দেয়। আমার দুনিয়ার ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে সে অনুভূতি।

পরদিন আমি জেনারেল ওয়েনের বাসায় যাই। এই খেয়ালের ফলাফল না ভাববার চেষ্টা করি। চার্লি গ্রীনের কবরের উপর সবুজ অঙ্কুর মাথা ঠেলে উঠছে। সে কথাও ভুলে থাকবার চেষ্টা করি।

ওয়েন ডেস্কের পাশে বসে লিখছেন। আরদালি আমায় ভেতরে নিয়ে যায়। তিনি মাথা তোলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভুরু কুঁচকে ওঠে। বেশ বুঝতে পারি আমায় চিনেছেন। জিজ্ঞাসা করেন, কি তোমার চাই স্যর?

পল্টনে থাকবার জন্য কাগজ পত্রে সই করতে এসেছি।

একদৃষ্টে তিনি আমার দিকে চেয়ে থাকেন। আরদালি চলে যায়। বসে বসে অনেকক্ষণ তিনি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। লক্ষ্য করেন আমার ছেঁড়া নোংরা জামাকাপড়।

তোমার নাম অ্যালেন হেল? খাপছাড়াভাবে জিজ্ঞাসা করেন তিনি।

হ্যাঁ স্যর।

রেজিমেণ্টের নাম?

চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়া।

ডেস্ক থেকে একখানা কাগজ তুলে তিনি গম্ভীরভাবে চেয়ে থাকেন। তারপর বলেন, পালাবার সময় যে মেয়েটি সঙ্গে ছিল, তাকে ভালবাসতে?

আমি জবাব দিলাম না। চকিতে নিজের কথা মনে পড়ে। বেসের সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে চাই না। আজকে সে আমার বড় কাছে এসেছে। আরও কাছে আসবে।

পল্টনে থাকতে চাইছ কেন? ওয়েন জিজ্ঞাসা করেন।

এর জবাবও দিতে পারি না। তাকে বোঝাবার মত ভাষা আমার নেই।

অনেক কষ্টই তো ভুগেছ, তাই না? ওয়েন জানতে চান। তার কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়।

আমি কষ্ট পাইনি। আস্তে আস্তে বলি। যারা পেয়েছে তারা বেঁচে নেই। আমি পাইনি।

ওয়েন উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসেন। হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, তুমিই আমাকে চিনেছ স্তর।

আমি তার হাতে হাত দিই।

তারপর ধীরে ধীরে পরিখায় ফিরে আসি। পেনসিলভানিয়ার ঘাঁটির আশেপাশে পাহাড়ের পর নতুন ঘাস নজরে পড়ে। খাঁটি ফিকে হলদেটে সবুজ ঘাস। মাঝে মাঝে বেগনি ফুলের কুঁড়ি।

পাহাড়ের মাথায় চড়ে চারিদিকে তাকাই। সারা গ্রামাঞ্চলে আর গড়ানে পাহাড়ের বুকে সবুজের আভাষ। আকাশ এত নীচু হয়ে এসেছে যেন হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায় বলে মনে হয়।

আস্তানায় ফিরে এলিকে বলি, ওয়েনের অফিসে গিয়েছিলাম। শিগগিরই বাড়ী যাব?

জেকব উৎসুক দৃষ্টিতে আমায় লক্ষ্য করছে। তার লম্বা কালোপনা মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। বারেকের জন্ত তার দৃঢ় সংবদ্ধ কঠোর মুখের সহজাত কাঠিন্ত ঢিলে হয়ে যায়। মনে হয়, এই ছোট্ট পরিখায় সে যেন নীরব রাজকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যত লোক প্রাণ দিয়েছে তাদের সবাইর শক্তি যেন সংহত হয়েছে জেকবের মধ্যে। তার ছাপ নেই। নিঃসঙ্গ সে। সহনশীলতা মোটেই নেই। বেশ দেখতে পাচ্ছি, আজ হোক কি ছুদিন বাদে হোক, অন্ধ ক্রোধের বিদ্যুত চমকে সে ছুটে বেরুবে এবং দুর্বার বেগে ছুটে যাবে নিজের পথে।

আজকে আচমকা হয়ত বুঝতে পেরেছে সে, সে একলা। ওয়াশিংটনের মত গোটা বিপ্লবের ভার যেন সে নিজের কাঁধে বইছে। তার কাঁধের দৃঢ়তা দেখতেই কথাটা মনে হয়। গোটা শীতকালে সে-কাঁধ একবারও ঝোঁকেনি কিম্বা বারেকের জন্য নীচু হয়নি। তারপর তাকে ইহুদিটির সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়। অকস্মাৎ মনে হয়, অদ্ভুত আদর্শের মিল রয়েছে এদের দুজনের।

আমি বাড়ী যাচ্ছি যে। ছাড়া ছাড়া ভাবে বলি।—আবার তিন বছরের জন্য নাম লিখিয়েছি।

জেকব মাথা ঝাঁকায়। এই-ই প্রথম তার চোখে আমি মানুষের জন্য দরদ উথলে উঠতে দেখলাম।

ভাল করনি আলেন। এলি বলে।

জেকব একখানা বিছানার প্রান্তে বসে পড়ে। বড় নিঃসঙ্গ বেচারী। তার পেছনে শূন্য বিছানার ভবল সার। তার দৃষ্টি নীরবে আস্তানার চারিদিকে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়ায়। জানে আমি আর এলি ছাড়া কেউ নেই। তবু খোঁজে অন্য কারও দেখা পায় কিনা। বন্দুকের তাকটার দিকে নজর পড়তেই সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। মনে হয়, বন্দুকগুলো গুনছে।

ভাল করনি আলেন। বিষণ্ণভাবে আবার বলে এলি।—আমিই ভুল করেছি।

বাড়ী ফিরবার কি হয়েছে আমার ?

আবাদের মরশুম আসছে। আত্মীয় স্বজন তোমাকে পেতে চাইবে। আমার জন্যই তুমি পল্টনে এসেছ আলেন···আমার কথাতেই রয়েছ এখানে।

আমি বোঝাবার চেষ্টা করি। সহসা বিরক্তি লাগে। আর বোঝাতে ইচ্ছে করে না। বাইরে গিয়ে রোদে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়।

বলি, সে সব চুকেবুকে গেছে। আর আমাদের কেউ ফিরে যেতে পারি না এলি।

জেকব মাথা ঝাঁকায়।—বছরের পর বছর লড়াই হবে। ভগবান জানেন, কতদিনে এর শেষ হবে।

আমি বেরিয়ে পড়ি। বেশ বুঝতে পারি যে ভিন্ন প্রকৃতির দুজন বৃদ্ধকে রেখে যাচ্ছি। বড্ড অস্বস্তি লাগে।…দুঃখুও হয়। আমিও একলা।

গাছের মধ্য দিয়ে হেঁটে একটা খেলা মাঠে আসি। ছোট্ট খোলা জায়গাটিতে রোদ পড়েছে। সেখানেই শুয়ে পড়ি। মাটি বেশ ঠাণ্ডা। তবু খুব ঠাণ্ডা নয়। রোদের তাতে শরীরটা চাঙা হয়।

অনেকক্ষণ শুয়ে আকাশে মেঘের খেলা দেখলাম। খণ্ড খণ্ড জোট বাঁধা মেঘ উড়ে যাচ্ছে আকাশ পথে। বেসের কথা মনে পড়ে। হারানো সঙ্গিনী বলে তাকে মনে হয় না। মনে হয় আবার একদিন অমনি একটি মেয়ের দেখা পাব। তাকে ঘৃণা করত যে বালক-আলেন তার কথা মনে পড়েও দুঃখু হয়। কিন্তু কোন ঘৃণা বা ক্রোধই আমার মধ্যে নেই। বেসের উপরও না, কিম্বা যে বালক—আলেনকে সে ভালবেসেছিল তার উপরও না।

—একুশ—

দাড়ি কামাচ্ছি আমরা। এক বোঝা চুল চলে যায়। একজন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে, তখন আর একজনে তাকে কামিয়ে দেয়। ছুরিতে চামড়া কেটে—কেটে যায়।

তারপর পায়ের পট্টিও খোলা হয়। অগুনতি ব্যাণ্ডেজ পড়ে থাকে এখানে-সেখানে। নোংরা জমে সবাইর পা কালো হয়ে গেছে। পট্টি খুলে খালি পায়ে খুঁড়িয়ে চলাফেরা করি।

পেনসিলভানিয়া আর মাসাচুসেটসের দু'তিনশো লোক ক্রিক উপত্যকা বরাবর উলঙ্গ হয়ে শুয়ে পড়ে। ছাই বালি দিয়ে জামা কাপড় সাফ করে শুকোবার জন্য গাছে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এ যেন ভিখারীর জামা কাপড়ের প্রদর্শনী। গোটা জায়গা বরাবর ছেঁড়া ব্রিচেজ আর কাগজের মত পাতলা কোটের সার। বরফের মত ঠাণ্ডা হলে গড়াগড়ি করে আমরা রোদে গা শুকোই। এখনও রোদ কড়া হয়নি। প্রথম প্রথম রোদে পুড়ে গা লাল হয়ে পিঠে ফোসকা পড়ে। তারপর গায়ের চামড়া ক্রমে বাদামি হয়ে যায়। সহসাসবাই যেন সূর্য-উপাসক হয়ে পড়েছি। দীর্ঘদিন ধরে যেমন টনিক খাওয়া হয়, তেমনিভাবে রোজ কয়েকঘণ্টা করে আমরা রোদে পড়ে থাকি। চোখে মুখে তপ্ত নোনা ঘাম গড়িয়ে পড়ে। ঘামে ভিজে ভালই লাগে।

জলের মধ্যে পা ঝুলিয়ে আমরা নদীর পাড়ে বসে থাকি। উৎসুক্য ভরে নিজের নিজের গা ঘষা-মাজা করি। চুল থেকে উকুন আনি। শীতকালের সঞ্চিত ময়লা উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কৌতূহল ভরে লক্ষ্য করি। শীর্ণকায় অস্থিসার চোখ বসা অদ্ভুত এক জনতা। রহস্যচ্ছলে আমরা ভার্জিনিয়ানদের গালাগাল দিই। বসন্তের জলে ঘৃণা ধুয়ে মুছে যায়। ধুয়ে যায় উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিমের ব্যবধান। অনেক দিন তো একসাথে দুঃখ দুর্ভোগ ভুগছি।

আমি এলির পা ধুইয়ে দিই। আবাক হয়ে সে চেয়ে থাকে নিজের পায়ের দিকে। যে করেই হোক পায়ের ক্ষত শুকিয়ে এসেছে। লম্বা তাজা দাগে ময়লা লেগে আছে; কিন্তু রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। আপনা থেকে আবার পচ-ধরা মাংস জোড়া লাগছে। শুকনো পচলা গুলোও শিগগিরই পড়ে যাবে। মরা সাদা চামড়ার তলায় নতুন মাংস জন্মাবে। আজকের জেগে-ওঠা শিরায় বইবে নতুন রক্ত। এমন করে এলি নিজের পায়ের দিকে চাইছে যেন আগে কোনদিন দেখিনি।

জলের মধ্যে কয়েক পা হেঁটে সে পারে উঠে বসে থাকে। আমাকে কিছু বলতে চায় কিন্তু পারে না। গলা আটকে যায়। বার বার সে পা দোলায়। চেয়ে থাকে নিজের পায়ের আঙুলের দিকে। শেষ অবধি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার দাড়িটা কামিয়ে দেবে আলেন? মুখটা সাফ-সাফাই করতে বড্ড ইচ্ছে করছে।

কামাবার সময় সে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। তার গোঁফ দাড়ি কামান মুখখানা দেখতে অদ্ভুত লাগে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বাতাস দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। মাথার উপর ঝরে পড়ছে ভগউডের ফুল।

তার পর আমি শুয়ে পড়ি। গালের উপর ছুরি চালাবার সময় চোখ বুজে থাকি। গোঁফ কামাবার সময় বেশ লাগে। বারবার জলে ডুবিয়ে ছুরিখানা ধুয়ে নেয় এলি। আবার গালে ঠেকাতেই পরিচ্ছন্ন ছুরিখানা বেশ ঠাণ্ডা লাগে। আস্তে আস্তে এলি আমার দাড়ি কামিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গোটা কয়েক বছর যেন জীবন থেকে ঝরে পড়ে। আবার ফিরে আনে তরুণ বয়স। আমার চামড়া যেমন টান তেমনি লোমহীন পরিষ্কার। একচোট কামাবার পর দাড়ির গোড়া নরম করবার জন্য আঙুল দিয়ে উলটো ভাবে গাল ঘষে দেয় এলি। এই সংবাহনে ঘুম পায়। আবার চোখ মেলে দেখি, আর একবার ছুরি টেনে সে কাজ সেরে ফেলেছে। আমার দিকে চেয়ে মাথা ঝোঁকে জানায় যে কামান হয়ে গেছে।

এরপর ছেলেমানুষের মত আমরা জলের মধ্যে খেলা করি। হাতে জল নিয়ে অন্যের গায়ে ছুড়ে মারি। হাঁসের মত পরস্পর পরস্পরের পেছনে ছুটাছুটি করি। গর্তের মধ্যে পা ভরে নাচানাচি করবার মত দুচারটে গভীর গর্তও খুজে বার করা হয়। দুটো কাঠের বালতিও যোগাড় হয় এবং মাসাচুসেটসের সৈনিকেরা একটি জলটানা দল গড়ে। লাইন করে আমরা তাদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাই আর তারা জল দিয়ে

আমাদের নাইয়ে দেয়। ভারি মজা লাগে। মাসাচুসেটসের দলটি ক্লান্তিকে অবশ হয়ে না পড়া অবধি এই খেলা চলে। তারপর গা শুকোবার জন্য সবাই রোদে শুয়ে পড়ে গল্প বলে। ব্রিটিশ ও আমাদের অফিসার এবং তাদের গৃহিনীদের খোসখবর নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে।

এই সবের পর ছেঁড়া জামা কাপড় পরে খালি পায়ে সবাই ফিরে আসি। আসবার সময় সবুজ ঘাসের উপর পা ঘষা হয়। কোন ফুল চোখে পড়লেই নীচু হয়ে সেটা তুলে নিই এবং দাঁড়িয়ে গন্ধ শুঁকি। তারপর চুলে ফুল গুঁজে নেচে বেড়াই। আমরা যেন পৌত্তলিক এবং শিশু হয়ে পড়ি। খেয়াল খুশি মত যা তা করে যাচ্ছি এবং তার জন্য কারও মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই।

ড্রিলের ফাঁকে ফাঁকে আমরা রোদে শুয়ে থাকি। তবে সে সুযোগ বড় বেশী জোটে না। আমাদের দেহ যেন স্পঞ্জের মত। এত রোদ গায়ে লাগিয়েও সাধ মিটছে না। মনে হয় আরও খানিকটা শোষালে ভাল হয়। শুয়ে শুয়ে আমরা হাসি-গল্প করি। কিন্তু শীতের কথা কেউ তোলে না। সে-টা বড্ড বেশী কাছের জিনিস।

মেয়েরাও সুন্দর হয়ে সাজবার চেষ্টা করে। কারও পুরা পোশাক বা একটা টুপি নেই। তবু সারা মাথায় তারা ফুল গোঁজে···হাসি মুখে আমাদের দিকে চেয়ে ছুটো ছুটি করে। তারাও গা ধোয়। একবার নদীতে স্নান করবার সময় তাদের একটি দলকে অবাক করে দিয়েছিলাম। নগ্ন দেহ ঢাকবার জন্য স্বচ্ছ অল্প জলের মধ্যে বসে পড়ে মেয়েরা। পাড়ে দাঁড়িয়ে ফোক্কড় ছেলের মত আমরা হাসাহাসি করতে থাকি। অবশেষে ছোঁ মেরে জামা কামড় তুলে নিয়ে তারা ছুট দেয়। আমরাও ছুটি পেছন পেছন। হেসে কুটি কুটি হয়ে বনের মধ্যে গড়াগড়ি খাই। শুকনো পাতা দিয়ে ভিজে গা ঢেকে রাখি।

রসদ সহ নতুন নতুন সৈন্যদল শিবিরে আসতে শুরু করে। উত্তর

থেকে বিরাট একটা ওয়াগনের ট্রেন হাজার হাজার পাউণ্ড মাংস নিয়ে আসে। গণসেনারা তিন মাসের জন্য নাম লেখায়। তাদের আমরা সু-নজরে দেখি না। তারাও খানিকটা ভয় করে বেগুলার সৈনিকদের। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করে। প্যারেডের মাঠে তাদের অনেক ভুলচুক হয়। আমরা কিন্তু সুশিক্ষিত সৈনিকের মত স্টুবেনের শেখান প্রুশিয়ান কায়দায় কুচকাওয়াজ করে যাই।

ব্যারণ ফন স্টুবেনের দেহের ওজন কমছে। তবু বাপ যেমন ছেলের জন্য গর্ববোধ করে, আমাদের সাফল্যে তিনিও তেমনি খুশি। আমরা তাঁর লোক পেনসিলভানিয়ার লাইনের আর্দ্ধেক লোককে তিনি চেনেন—নামও জানেন তাদের।

আস্তানার আগুন নিভে যায়। যাকনা। এমন ও সম্পর্কে তেমন আগ্রহ কারও নেই। নিভে-যাওয়া চুল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে লাঠি দিয়ে ছাই খোঁচাচ্ছে এলি। পরিখার দরজা খোলা। মৃদু মন্দ বাতাস ঢুকে শুকনো ছাই ওড়াচ্ছে। আমরা দুজনেই শুধু আছি আস্তানায়। বেলা পড়ে এসেছে।...গোধূলি হয় হয়। সঙ্গিনী ছুটি ভেগেছে। চালি মারা যাবার পরেই চলে যায়। পরে আন্নাকে আমি ম্যাসাচুসেটসের লোকের সঙ্গে দেখেছি। তাতে কি এসে যায়?

আগুন না থাকলে কেমন খালি-খালি লাগে! এলি বলে। ঠাণ্ডার জন্য আমি শোক করছি না, কিন্তু আগুনের মধ্যে প্রাণের পরশ ছিল।

বিচ্ছিরি নির্জন জায়গা।

প্রথমে জায়গাটাকে আমি ঘেন্না করতাম। আমি বলি।—কিন্তু এখন আর করি না।

সৈনিকেরা বাইরে আগুন জ্বালছে। এলিকে বাইরে যাবার অনুরোধ করি। কিন্তু সে মাথা ঝেঁকে অস্বীকার করে। একলাই

তখন বেরিয়ে পড়ি। পেনসিলভানিয়ার সৈনিকেরা আগুনে মাংস রোষ্ট করছে। গোল হয়ে বসে আমরা মদ খাই—গান গাই।

হঠাৎ দেখি কোত্থেকে একটি মেয়ে জুটে গেছে। পাতলা চুল গোলগাল তরুণী। তিন চার জন লোক তার দিকে নজর দিয়েছে। কিন্তু আমিই ভাগিয়ে আনি। তাকে নিয়ে আগুনের কাছ থেকে সরে যাই এবং খানিকটা দূরে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ি।

তোমার নাম আলেন হেল? মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে।

কি করে জানলে?

তোমাকে দেখেছি। শুনেছি তুমি ভেগেছিলে, আর সেজন্য চাবকে তোমাকে মেরে ফেলবার উপক্রম করেছিল।

তা বটে।

আমার নাম বেল্লা।

কোন সঙ্গী নেই তোমার?

ছিল, কিন্তু আমাকে ফেলে ভেগে গেছে। আর তার কোন খবর শুনিনি।

আমার মত সমর্থ সুন্দর পুরুষকে মেয়েরা না ভালবেসে পারে না, কি বল?

খিল খিল করে হেসে ওঠে মেয়েটি। হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে। শুয়ে শুয়ে দুজনেই আগুনের দিকে চেয়ে থাকি। ছায়া মূর্তির মত মানুষ ঘোরাফেরা করছে তার চার পাশে। নীরবে আমি তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত দিয়ে দেখি।

লোকে বলে, তুমি নাকি মেয়ে ছাড়া থাকতে পার না। মেয়েটি বলে।—বলে, ভার্জিনিয়ানদের কাছ থেকে নাকি ভারি সুন্দর একটি মেয়ে ভাগিয়ে নিয়েছিলে।

তা বটে।

কি নাম ছিল তার? বল না! আমাকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চয়ই তার কথা ভাবছ না?

তার নাম বেস কিনলি।

তাকে ভালবাসতে? মরবার সময় খুব দুঃখু হয়েছিল?

আচমকা আমি চেঁচিয়ে উঠি।—দোহাই ভগবানের, চুপ কর! চীৎকার শুনে মেয়েটি ভয়ে ভয়ে সরে যায় কিন্তু আমি তাকে টেনে রাখি।

কিছু মনে কর না। আমি তোমাকে ভড়কে দিতে চাইনি।

আবার আস্তানায় ফিরে আসি। এলি তখনও সেই নিভানো আগুনের পাশেই বসে আছে। যে-জায়গায় তাকে বসা দেখে গেছি, ঠিক সেই জায়গাতেই আছে। সে ডাকে, আলেন!

বল এলি।

আলেন, আমার কাছে একটা শপথ করবে?

কি?

বল, বিপ্লবের উপর আস্থা রাখবে! বহু বছরের মধ্যে শান্তি আসবে না। পোক্ত লোকের প্রয়োজন হবে।

তুমি সঙ্গে থাকবে তো!

না, তুমি একলা থাকবে আলেন।

আমি বিছানায় ফিরে আসি। বহুক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে থাকে এলি। আমি ঘুমোতে পারিনি। অপলকে চেয়ে থাকি এলির দিকে।

তারপর ঘুম আসে। খানিকটা বাদে ভেঙেও যায়। এলি তখনও বসে আছে। দরজাটা খোলা। ঘোলাটে চাঁদের আলো ঢুকছে দরজার পথে। জেকবের দীর্ঘ দেহ বাক্সের উপর এলানো। আস্তে আস্তে ডাক দিই, এলি।

সে আমার দিকে চোখ তুলে চায়। আমি ভেবেছি তুমি ঘুমিয়েছ আলেন।

এমনি করে সারারাত বসে থাকবে এলি? বিশ্রাম করবে না?

খানিকটা বসছি আলেন। তেমন কোন ক্লান্তি আমার হয়নি।

আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যেও এলিকে দেখতে পাই। কুঁজো হয়ে সে যেন আগুনের পাশে বসে আছে আর লাঠি দিয়ে ছাই নাড়ছে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি লোকটার। এ অন্তর্দৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত। প্রাণটাও বড়।

পর দিন মে মাসের যে-কোন দিন হবে। দিনটি আশীর্বাদের মত। হুকুম আসে, সেদিন নাকি জাঁকজমকে কুচকাওয়াজ হবে। কর্তারা পল্টন পরিদর্শন করবেন। কুচকাওয়াজের পর গোটা একদিন বিশ্রাম আর উৎসব হবে। কিসের জন্য উৎসব?

হরেকরকম গুজব শোনা যায়। মেলরোজ নামে মাসাচুসেটসের একটি সদরঘাঁটির পিওন বলে, ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা হয়ে গেছে।

সৈন্যদল সার বেঁধে দাঁড়ায়। পরম আগ্রহে আমরা এই সংবাদ নিয়ে আলোচনা করি।

সাগর পারের মহান দেশ। যে-সে দেশ নয়, কয়েকশো বছর ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করে আসছে।

এ নিশ্চয়ি লা ফায়েতের কাজ। শুনলাম সে-ই নাকি মিত্রতা ঘটিয়েছে।

যা বলছি শোন, এর মধ্যে নিশ্চয় বেন ফ্রাঙ্কলিনের হাত আছে। বুড়ো বেন নিজেই করেছে।

তারা নাকি একটা পল্টন পাঠাচ্ছে। দশ হাজারের পল্টন।

ওয়াশিংটনের চোখ দিয়ে জল বেরিয়েছে। শিশুর মত কাঁদছেন। নিজের চোখে দেখেছি।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে শিশুর মত হাসছেন ওয়েন। সৈন্যদল সার বেঁধে দাঁড়াবার সময়েই তিনি রাম দেবার ব্যবস্থা করে দেন। জ্যাকেটে

এবং চুলে আমরা ফুলের কুঁড়ি বা সবুজ পাতা পরি। ড্রামে ইয়ংকি-ডুডলের গৎ বাজে। প্যারেডের মাঠে যেতে যেতে আমরা গান ধরি :

টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে
ইয়াংকি বাবু গেলেন বোস্টনে,
বুড়ো হাউকে পাঠালেন জাহান্নামে—
বলেন ওটা ম্যাকারোনি।

*   *   *

বেশকরে চালাও ইয়াংকি বাবু,
গলদা চিংড়ি ব্যাটাদের হাঁকাও।
লাল কোটওলা বেজন্মারা বুঝুক—
আসছে ইয়াংকি বাবু।

.।। ছেড়ে আমরা গেয়ে চলেছি। আমাদের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্যারেডের মাঠে। লাইনের সামনে পেছনে ঘোড়ায় চড়ে ছুটোছুটি করবার সময় ওয়েনকে দেখে আমরা আনন্দধ্বনি করে উঠছি। আর পদের পর পদ গেয়ে চলেছি :

ইয়াংকি বাবু গেলেন নরকে,
বলেন—বেজায় ঠাণ্ডা।
মাসছয়েক থাক ফোর্জ উপত্যকায়,
বলবে নরক বরং ভাল!

*   *   *

চালিয়ে যাও ইয়াংকি বাবু,
গলদা চিংড়ি ব্যাটাদের হাঁকাও।
লাল কোটওলা বেজন্মারা বুঝুক—
আসছে ইয়াংকি বাবু!

গ্রাণ্ড প্যারেডের মাঠে গিয়ে সারবেঁধে দাঁড়িয়েছি। লা ফায়েৎ

এবং ব্যারন ফন স্টুবেনকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াশিংটন ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসেন। সোজা হয়ে বসে আছেন তিনি। হাসছেন। জলভরা চোখে ভাঁজ পড়েছে। খাপছাড়াভাবে তিনি হাত নেড়ে প্রত্যভিবাদন জানান। তারপর ঘোড়া থেকে নামেন। আমাদের সার ভেঙে যায়। পাগলের মত তাদের ঘিরে দাঁড়াই। ওয়াশিংটন এবং স্টুবেনের গায়ে আগে হাত দেবার জন্য কাড়াকাড়ি লেগে যায়। স্টুবেনও কাঁদছেন। অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। স্বপ্নাবিষ্টের মত মাথা ঝাঁকাচ্ছেন ওয়াশিংটন। স্টুবেন বলেন, বাছারা, আমার বাছারা···

আবার লাইনে ফিরে গিয়ে আমরা চারদিকে তাকাই। চেয়ে থাকি গাছপালা, প্যারেডের মাঠের সবুজ বিস্তার আর নির্মেঘ নীল আকাশের দিকে। আমরা যেন স্বপ্নজগতের লোক। শীতটাও ছিল যেন দুঃস্বপ্নের মত। ফিরে আসবার সময় বেশ কয়েকজনের চোখেই জল দেখা দেয়।

অফিসার-ঘরণীরা প্যারেডের মাঠের কিনারে দাঁড়ানো। শিবির-সঙ্গিনীরা তাদের খানিকটা দূরে। হাত নেড়ে তারাও আমাদের উৎসাহ দিচ্ছে। এদের সাজ-পোশাক মাঠের আঁচলে সুন্দর রঙের ছোপ লাগিয়েছে।

স্টুবেন তখন আমাদের কুচকাওয়াজ করান। খালি মাথায় তরোয়াল হাতে তিনি পেনসিলভানিয়ান এবং মাসাচুসেটসের সৈন্যদলের আগে আগে হাঁটছেন। শিশুর মত হাসি-খুসি তিনি। আমাদের মার্চ করবার সময় মাটিতে তরোয়াল ঠুকছেন। ছুটোছুটি করছেন লাইনের পাশ দিয়ে। আর ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা নেড়ে জানাচ্ছেন ঠিক আছে। ছুটাছুটিতে ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি হাসিমুখে মাঠের মাঝখানে দাঁড়ান। ওয়াশিংটনকে ডেকে বলেন, কমাণ্ডার, ওদের কিরিচের কায়দাটা দেখুন।

আঙুলে ভর করে প্রসারিত হাতে তিনি আমাদের দিকে দৌড়ে আসেন।—বাছারা, আমার জন্য একবার কায়দাটা দেখাও না। ঠিক যে-ভাবে শিখিয়েছি।

তারপর তিনি কিরিচ চার্জের হুকুম দেন। বিগ্রেডের নাম ধরে পার্শ্বদেশ আক্রমণ করতে বলেন। আক্রমণকারীদের রক্ষা করবার জন্য সৈনিকদের পরিচালিত করেন। তারপর সৈন্যদল পুনর্গঠন করে আনন্দে শিশুর মত হেসে ওঠেন।

এমন সৈন্য···সারা দুনিয়ায় পাবেন এমন সৈন্য? হা ভগবান, অপূর্ব···চমৎকার লড়িয়ে এরা!

ওয়াশিংটন তখন গুটিকয়েক কথা বলেন। বলেন, ফ্রান্সের সঙ্গে আমরা মিত্রতা করেছি। এই শীতে কি কষ্ট যে আমাদের ভুগতে হয়েছে তা তোমরাও জান—আমিও জানি। কেউই তা ভুলতে পারব না। তোমরা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর।

ঘোড়ায় চড়ে তিনি হাত নেড়ে আমাদের অভিবাদন করেন। কয়েকটা ঢোক গিলে মাথার টুপি খুলে ফেলেন। বাকী দিনটা আমরা মাঠের মধ্যে গুলতানি করে কাটাই। গাল গল্প করি, মদ খাই, খাবার খাই কি রোদের তাতে চুপ করে শুয়ে থাকি।

আস্তে গড়িয়ে যাচ্ছে দিনগুলি। বেশ গরম দিন। নীল আকাশ ঘেরা অলস দিন। নীল আকাশ যেন একটা বাটির মত। ফোর্জ উপত্যকায় নবপল্লবের বাহার। আপেল গাছগুলো বরফের বলের মত দেখাচ্ছে। গাছের তলায় ঝরা ফুলের সাদা কার্পেট পাতা। বনভূমির মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অবাক হয়ে ভাবি, এই জায়গাতেই কি ডিসেম্বর মাসে এসেছি?

শীতকালে যারা মারা গেছে তাদের কবর দেওয়া হয়। শুয়েলকিল নদীপারে ক্রশের লম্বা সার পড়ে। এলির সঙ্গে সেখানে গিয়ে

আমাদের সাতজন সঙ্গীর জন্য সাতটি কবর চিহ্নিত করি এবং নামের ফলক লাগাই। বেঁটে ডাক্তারের নামে একটি কবর চিহ্নিত করি এবং অতিকষ্টে তার উপর এই কটি কথা লিখে রাখি :

কখনও যিনি কর্তব্যে ত্রুটি করেননি
অসুস্থকে করেছেন নিরাময়—
পীড়িতকে স্থান দিতেও যিনি
বিলম্ব করেননি—
ভগবান তাঁর আত্মার শান্তিবিধান করুন—
তাঁর সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন !

ঠিক কথা লিখেছ। এলি বলে।—যোগ্য লোকের যোগ্য স্মৃতিফলক।

লোকটা অদ্ভুত কঠোর ছিল।

চালির কবরের পর সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। তাকে এখানে শুইয়ে দেওয়ায় আমি খুশিই হয়েছি। শুয়ে শুয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে সে ফিলাডেলফিয়ার দিকে চেয়ে থাকতে পারবে।

একদিন আস্তানার বাইরে বসে আমরা গল্প-সল্প করি। এলি জেকব আমি আর জনছয়েক পেনসিলভানিয়ার লোক আছে আগুনের চারপাশে। বেশ গরম মেঘলা রাত। উপত্যকার মধ্যে কুয়াশা জমেছে।

এর কথা বেশীদিন মনে থাকবে না। এলি বলে। শীতের কথা দুদিনেই ভুলে যাবে।

ভুলতে পারলেই ভাল।

বেজায় শীত পড়েছিল। এমন শীত কেউ কোনদিন দেখেনি।

গত একশো বছরের মধ্যে এমন শীত পড়েছে বলে বাপ-দাদার মুখে শুনিনি।

এর কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। এ মর্মান্তিক স্মৃতি যত শিগ্‌গির ভোলা যায় ততই ভাল।

এখনও আমার হাড়ে ঠাণ্ডা লেগে আছে।

অত সহজে যাবেও না।

এলি তখন গম্ভীর ভাবে বলে, অনেক সময় ভাবি, কি হবে এ সবে?

যুদ্ধের কথা সাধারণ লোকের বোঝা মুশকিল।

এ যেন মৃত্যুর মত। যুদ্ধ বা মৃত্যুর কথা ভেবে কুল-কিনারা করা যায় না।

বহুদিন আগে চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে কেনটন যখন মারা যায়, তখন একথা বুঝেছি বলে মনে হয় না। তারপর আবারও তিন বছরের জন্য নাম লিখিয়েছি। তার কথাও এখন ভাবতে পারি না। শুধু বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করবার মত কিছু থাক বা না থাক, বিশ্বাস আমাকে করতেই হবে।

দিন গড়িয়ে যাচ্ছে—গরমের স্রোত বইছে বাতাসে। তাত ক্রমেই এমন বেড়ে যায় যে লোকে বলতে শুরু করে, শীতের মত গরমও দেখ কি ভয়ানক পড়ে। ফোর্জ উপত্যকার রূপ উথলে পড়ছে। অপূর্ব স্নিগ্ধ রূপের জোয়ার। পাহাড়ের পর পাহাড় সবুজে ঢাকা। শুধু কোয়েকার চাষীরা যেটুকু জায়গায় লাঙল দিচ্ছে তাই বাদে। এই সবুজের রাজ্যে লালচে বাদামি চেরার দাগ খুব সামান্য জায়গাতেই আছে।

গুজব রটে যায় যে শিগগিরই আমরা অন্যত্র যাব। কোথায় যাব কেউ জানে না।

ব্রিটিশরা ফিলাডলফিয়া ছেড়ে যাবে। কিন্তু আমাদের আক্রমণ করবে না। পাঁচ হাজার গণসেনা ইতিমধ্যেই ফোর্জ উপত্যকায় এসে গেছে। আমরা এখন বেশ শক্তিশালী।

কুচকাওয়াজের বিরাম নেই। অনবরত করে যাচ্ছি। শীতের কষ্ট সহ্য করে যারা রয়ে গেছে, পেনসিলভানিয়া, মাসাচুসেটস ও

জার্সির সেই ক্ষত-বিক্ষত সৈন্যদল স্টুবেনের প্রিয় পাত্র। আমাদের তিনি প্রকৃত সৈনিক বানাচ্ছেন। খাঁটি সৈনিক আমরা কোন কালেই ছিলাম না। আসলে আমরা একদল চাষী। প্রতিটি যুদ্ধে হেরেছি আর ব্রিটিশদের এড়াবার জন্য দেশময় পালিয়ে বেড়িয়েছি। এইবার কুচকাওয়াজ করে আমরা যন্ত্র হয়ে যাচ্ছি। স্টুবেন অক্লান্ত। লোহার মত কঠিন হতে হবে আমাদের। তার আগে তিনি ছাড়বেন না। এ তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

তিনি বলেন, আর দেরী নেই বাছারা! শিগগিরই আমরা এক আঘাত হানব। তারপর লড়াই খতম হয়ে যাবে। জোরসে এক আঘাত। দেরী নেই…তার দেরী নেই।

আমরা যা আশা করেছি তার আগেই সেদিন আসে। জীর্ণশীর্ণ একটা ঘোড়ায় চড়ে গালফ রোড দিয়ে এক সওয়ার ছুটছে। চেঁচিয়ে কি বলতে বলতে সে সান্ত্রীদের মধ্য দিয়ে ছুটে আসে। গোটা শিবিরে অশ্বখুরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়। সদর ঘাঁটির সামনে এসে পাগলের মত সে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে।

আগুনের মত বার্তাবহের আগমন সংবাদ গোটা শিবিরে ছড়িয়ে পড়ে। কেউ জানে না কি সংবাদ সে এনেছে। কিন্তু সবাই ধরে নেয়, নিশ্চয়ি ফিলাডেলফিয়া থেকে আসছে। জটলা করে আমরা নিজের নিজের অভিমত ও অনুমান প্রকাশ করি।

ব্রিটিশরা হয়ত শিবির আক্রমণ করবে…

ফিলাডেলফিয়া পুড়িয়ে দিয়ে তারা নিউইয়র্ক যাচ্ছে…

দেলওয়ারে দিয়ে জাহাজে যাচ্ছে…

রাত হয়। আমরা আগুন জ্বালি। এই আগুন দেখে উপত্যকার বাসিন্দা কোয়েকার চাষীরা কি ভাবছে? এর আগে কোনদিন এ প্রশ্ন মনে জাগেনি। মানব দেহী অদ্ভুত এক শ্রেণীর জানোয়ার নিজেদের

পল্টন বলে পরিচয় দিচ্ছে। রাত্রির গর্ভ থেকে হঠাৎ একদিন বরফের মধ্যে তারা এখানে আড্ডা গাড়ে। আবার চলে যাবে। কিন্তু কোয়েকাররা এখানে থাকবে—গত একশো বছর যেভাবে বসবাস করেছে ঠিক সেইভাবেই বসবাস করবে।

রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়। হঠাৎ জেগে বেসের জন্য হাতড়াই। বিড়বিড় করে বলি, যদি এখান থেকে চলে যাই, কেমন করে আমার দেখা পাবে? মনে পড়ে, আরও পুরো তিনটি বছর সঙ্গিনী ছাড়া কাটাতে হবে: বেসের কথা ভেবে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলি। একলা থাকতে ভয় করে।

পরদিন ছাউনিতে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির ভাব দেখা দেয়। সকালবেলা স্টুবেন আমাদের ড্রিল করান। গোমরা মুখো সাচ্চা প্রুশিয়ানের মত তার মুখের চেহারা। যন্ত্রের মত নিয়ম-মাফিক তিনি কুচকাওয়াজ করান; কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন উৎসাহ বা আগ্রহের ভাব নেই। যেন করাতে হবে বলেই করাচ্ছেন। তপ্ত সূর্যের চেহারা টকটকে লাল ঘায়ের মত। স্টুবেন আমাদের এমনভাবে ড্রিল করান যে ঘামে ভিজে চুপচুপ হয়ে যাই।

আস্তানায় শুয়ে শুয়ে আমরা নানা গুজব নিয়ে আলোচনা করি। এখন স্পষ্টই জানা গেছে যে ব্রিটিশরা ফিলাডেলফিয়া ছেড়ে গেছে। গোটা শীতকাল বিশ হাজার লোক সেখানে আরাম করে আণ্ডি-পিণ্ডি গিলেছে। পাকা বিশ হাজার লোক। আর তাদেরই আঠারো মাইল দূরে হাজার তিনেক রুগ্ন ভিক্ষুক পাহাড়ের বুকে উপোস করে কাটিয়েছে। এখন সংবাদ পাওয়া যায় যে দশ-বারো হাজার ব্রিটিশ সেনা ফিলাডেলফিয়া ছেড়ে হাঁটা পথে জার্সির মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্ক রওনা হয়েছে। অফিসাররা কোন কথা বলে না। টুকরো টুকরো সংবাদ জোড়া দিয়ে আমরা নিজেরাই বুঝবার চেষ্টা করি। আধা-আধি

ব্রিটিশসেনা জাহাজে চড়ে গেছে। জার্সির মধ্য দিয়ে হাঁটা পথে যারা যাচ্ছে, ওয়াশিংটন যদি তাদের আক্রমণ করেন তো…

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। আমেরিকানরা একবার মাত্র একটি যুদ্ধে হারিয়েছে ব্রিটিশদের। সে যুদ্ধ হয় সতেরো শো পঁচাত্তর সালে—বোস্টনের বাঙ্কার পাহাড়ে। তারপর আর ঘাঁটি আগলে থাকতে পারিনি। বরাবর হেরে আসছি।

শিগগিরই জানা যাবে। এলি বলে। বিচ্ছিরি রকম শান্ত সে। মনে হয় যেন এইজন্যই প্রতীক্ষা করছিল।

ঠিক কথাই বলেছ, শিগগিরই জানতে পাব। জেকব সায় দেয়।

পরদিন সকালবেলা রওনা হবার আদেশ আসে। হুকুম আসে, আস্তানা ভেঙে ফেল। এই আশ্রয়েই ছ'মাস কেটেছে আমাদের।

শান্তভাবেই আমরা হুকুম পালন করি। আস্তানায় টুকিটাকি কাজ করে সামান্য জিনিসপত্তর গুছিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করি যে পুরো ছ'টি মাস কেটেছে এখানে। নীরবতা আমাদের যেন কম্বল চাপা দিয়ে রাখে। ছাউনি ভেঙে সংগ্রামের জন্য রওনা হই।

এলি এবং জেকব চলে যাবার পরেও একলা আমি আস্তানায় দাঁড়িয়ে থাকি। পায়চারি করে প্রতিটি বিছানা, আমাদের নিজেদের হাতে তৈরী প্রতিটি জিনিস হাত দিয়ে স্পর্শ করি। নীচু গাছের গুঁড়ির দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াই। চুল্লীর ছাই লাথি মেরে ছড়িয়ে দিই। পরিখাটি তখন বেজায় গরম হয়ে পড়েছে। সকালবেলার সূর্য তাতিয়ে তুলছে আস্তানার চাল।

মনে হয়, অনেক বছর আগে আমরা এ আশ্রয়টি বানিয়েছি। ক্লার্ক ভ্যানডিয়ার, হেনরি লেন, এডওয়ার্ড ফ্লাগ, কেনটন ব্রেন্নার আর চার্লি গ্রীনের মত জোয়ান জোয়ান লোক যেন তাজা গাছ কাটছে।

আস্তানার ভেতরটা নরকের মত। এরি মধ্যে বেসকে কোলে

জড়িয়ে কতদিন যে শুয়েছি! ভালবেসেছি একটি নারীকে। একজন পুরুষ এক নারীকে ভালবাসে অথচ বুঝতে পারে না—একি রহস্য?

আচ্ছা, পরিখার কাঠের দেয়ালে যদি আমি লিখে রাখি যে, আলেন হেল নামে এক সৈনিক এখানে অযোগ্য এক শিবির-সঙ্গিনীকে নিয়ে শুয়েছে—তাহলে কেমন হয়?

মাস্কেটের তাক শূন্য। একদিন ওয়েনের কাছে আমরা মাস্কেট কটা নিয়ে যাই। আটটি মাস্কেট। ওয়েন একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। এলি বলে, আপনার অস্ত্রের দরকার আছে স্যর। অস্ত্র নেই এমন বহু লোক আছে পল্টনে।

ওয়েন ছাড়া ছাড়া ভাবে বলেন, যারা ব্যবহার করেছে এর মালিক তারা। মালিক তারা হলেও আমি নেব। হাতিয়ার চাই আমাদের।

এই সময় এলি আমাকে ডাক দেয়। বাইরে এসে আমি দরজা বন্ধ করে দিই। ছুঁড়ে ফেলে দিই চাবিটা। এমনি দরজা বন্ধ অবস্থাতেই থাকবে। হতচ্ছাড়াদের আড্ডা এটা। কেউ ভাঙতে-চুরতে আসবে না। হয়ত বহু বছর পরে একটা মাটির ঢিবির মধ্যে কতগুলো পচা কাঠ বেরুবে। তখন হয়ত লোকজন উৎসুক দৃষ্টিতে এর দিকে চেয়ে থাকবে। বলবে, বিপ্লবীরা ছমাস বসবাস করেছে এখানে।

এস আলেন। এলি মোলায়েম ভাবে বলে।

আমরা তখন নিজেদের ব্রিগেডে ভীড়ে যাই। বেশ গরম দিন। গা পুড়ে যাচ্ছে গরমে। গলিত স্বর্ণের মত সূর্য-গোলক ভেসে বেড়াচ্ছে হিমশীতল আকাশের নীল-আগুনের মধ্যে। আমাদের পাশ দিয়ে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ওয়েন। হাসছেন এই জীর্ণবাস শীর্ণ লোকগুলোর দিকে চেয়ে। মাথা নেড়ে অভিবাদন করছেন। পরিচ্ছদ শতছিন্ন হলেও দুঃখের দহনে এরা সাচ্চা মানুষ হয়েছে। অকুতোভয়ে

এই মানুষগুলো নরকে পর্যন্ত তার অনুসঙ্গী হবে। কোনও ভয়ই এদের নেই। নরকের ভয়ও না। তিনি হেঁকে বলেন, বিগ্রেডস্‌… এগিয়ে চল।

ড্রামে আবার মামুলি গৎ বেজে ওঠে। নতুন কোন গৎ নয়… বেজে ওঠে ভিখারীর পল্টনের যোগ্য গানের সুর। একটি তুর্যও যোগ দেয়। বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে তার তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দে:

টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে
ইয়াংকি বাবু গেলেন লণ্ডনে…

স্টুবেনের শেখান প্রুশিয়ান কায়দায় টান হয়ে পা ফেলছে পেনসিলভানিয়ার সৈনিকেরা। মাসাচুসেটস্‌ ও নিউ জার্সির লোকজনের পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে যাই। আর একদল গণসেনার পাশ কাটিয়েও যাওয়া হয়। ঘোড়ার পিঠে বসে স্টুবেন বারবার মাথা নাড়ছেন। তার মুখমণ্ডল কুঞ্চিত। মুখ দিয়ে কোন কথা সরছে না।

আমরা পল্টনের সামনেই চলতে থাকি। ওয়াশিংটনের ভার্জিনিয়ান দেহরক্ষীদের ঠিক পেছনে। লম্বা ভার্জিনিয়ানরা পেছন ফিরে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসে।

এস চাষী…লাঙল দেবার দরকার আছে।

আমরা আবার গান ধরি:

ইয়াংকি বাবু গেলেন নরকে,
বলেন—বেজায় ঠাণ্ডা…

আমি পেছন ফিরে তাকাই। পাহাড়গুলো গ্রীষ্মকালের রোদে পোড়া 'লাশ' বাগানের মত দেখায়। ছোট্ট একদল কোয়েকার চাষী আর তাদের বউয়েরা প্যারেডের মাঠে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের।

আমার এক পাশে এলি—অপর পাশে জেকব। আর আমি ফিরে তাকাই না।

—বাইশ—

জলো-মেঘের পশলা বৃষ্টি আমাদের ভিজিয়ে দেয়। ধারা বর্ষণের মধ্যেই চলেছি। বিরাট এক সাপের মত পাহাড়ের পর ছড়িয়ে পড়েছে সৈন্যদল। সামনের ও পেছনের মুখ বৃষ্টির ধারায় অদৃশ্য। বৃষ্টি থামবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার রোদ। এ রোদের ঝাঁজ অনেক বেশী। কাদা জমাট বেঁধে শক্ত মাটির ডেলা হয়। আবার সেই ডেলা আমাদের পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে ক্রমে মিহি বালিকণায় পরিণত হয়। অনেকেরই খালি পা। রাস্তার গুঁড়ানো নরম মাটিতে চলতে অসুবিধা হয় না।

কিন্তু জামা-কাপড়ে বৃষ্টির জল শুষেছে। জামা লেগে পড়েছে পিঠে। মিহি উড়ো বালিকণা পড়ছে সবার গায়ে। এ অসহ্য। প্রথমে আমরা কোট রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিই। তারপর ফেলি ছেঁড়া শার্ট। মাস্কেট ঝুলানো ফিতে পিঠে কেটে বসে। কোমর অবধি খালি গায়ে আমাদের অদ্ভুত দেখায়। যেন অর্ধনগ্নের এক পল্টন।

শ্রান্ত হলেও পথ চলছি। কিন্তু দুপুর বেলা ক্লান্তির অবসাদে বসে পড়ি। কেউই তেমন খেতে পারে না। না খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়েছে। তার উপর জুটেছে শঙ্কা আর প্রতীক্ষার অস্বস্তি।

সবাইর মুখে শত্রুর কথা। কোথায় গেল? কখন দেখা মিলবে? শুনছি, গণসেনারা নাকি ইতিমধ্যেই ভয়ে উসখুস করছে। এতক্ষণে বুঝতে পারি, কেন পেনসিলভানিয়ার সৈনিকদের সামনে দেওয়া হয়েছে।

গণসেনাদের উপর কোন আস্থা নেই আমাদের। জেকব বলে।—

যাই ঘটুক, আমাদেরই সামনে পড়তে হবে। আমরা যদি দাঁড়াতে পারি তো গণসেনারাও দাঁড়াবে। তবু ওদের ওপর কোন ভরসাই আমি করি না।

আচমকা আমার ভয়-ভয় করে। অদ্ভুত একটা শঙ্কা হয়। শীতকালের পর জীবনের পর এত মায়া কোন সময় অনুভব করিনি। শীতের ধাক্কাও সামলেছি। ঐ বেজায় শীতের মধ্যেও বেঁচে রয়েছি।

সত্যিই কি যুদ্ধ হবে জেকব?

যুদ্ধ হবেই। তিন মাসের বেশী তো আর গণসেনাদের আটকে রাখা যাবে না।

এইটেই শেষ যুদ্ধ। খাপছাড়া ভাবে এলি বলে ওঠে।

আমরা দুজনেই তার দিকে তাকাই। ধীরে ধীরে এলি বলে, যুদ্ধের কোন মোহ আমার নেই। অনেক লোক মরেছে। মৃত্যু দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন বিশ্রাম করতে চাই। জেকব তুমি বা আমি এখন তো আর যুবক নই। এখন আমাদের চাই একটানা নির্ঝঞ্ঝাট বিশ্রাম।

বিশ্রামের অবসর! জেকব বলে। বিশ্রামের অবসর পরে অনেক জুটবে।

আবার আমরা এগিয়ে চলি। এবার চলছি জোর করে। রসদের ট্রেন আর শিবির-সঙ্গিনীরা অনেক পেছনে পড়েছে একটা কিছুর পেছনে চলেছি আমরা। ক্রমাগত পা টেনে এগোচ্ছি। ড্রামের বাজনা উড়ো বালির কুয়াশায় যেন চাপা পড়ে যায়। খালি পায়ের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পথে ডোরাকেটে দেয়। হেঁটে হেঁটে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে বসবার হুকুম পেলেই ধুপ করে রাস্তায় বসে পড়ি।

পরদিন আবার বৃষ্টি শুরু হয়। ভ্যাপসা গরমের টানে বৃষ্টিধারা যেন পুরু প্রাচীর সৃষ্টি করে। দেলওয়ারে নদী পার হয়ে আমরা লম্বা

পাইন বন আর উষর বালিয়াড়ির দেশে পড়ি। পাইনের খোসবায় বেজায় কড়া। বিচ্ছিরি। দলে দলে মশা উড়ছে গুনগুন করে। মশার কামড়ে সারা গায়ে লাল-ছিট পড়ে। দরদর ধারায় ঘাম পড়ে চোখে-মুখে। সারা গায়ে বালির লেপ।

ওয়েন হেসে বলেন, শত্রুরা তোমাদের দেখলেই ভয় পাবে। যুদ্ধের আর দরকার হবে না।

সুন্দর আমরা নই। যুদ্ধের শঙ্কায় হন্তে হয়ে গেছি। শত্রুর দেখা না পাওয়া পর্যন্ত কোন বিশ্রাম নেই। তখন এমন অবস্থা হয় যেন শত্রুর দেখা পেলেই বাঁচি। যাই হোক, এ দিগদাহি থেকে বাঁচা যাবে তো।

রাত কাটাবার জন্য বালিয়াড়ির মধে ছাউনি ফেলা হয়। পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে আগুন জ্বালি। রান্নাবান্না সেরে আগুনের কাছ থেকে সরে যাই। কোন জায়গা ঠাণ্ডা নয়। বালিই তেতে গেছে। সারা রাতেও সে তাত কমে না। সব কিছু পুড়ে তেতে আছে।

শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। পাইনের উগ্র গন্ধ-মাখা ভারী হাওয়া শক্ত কোন জিনিস বলে মনে হয়। ফুসফুসে আটকে থাকে যেন।

আমরা যেখানে শুয়ে আছি, হঠাৎ ওয়েনের এক বার্তাবহ সেখানে হাজির হয়। সেনানীরা যে-তাঁবুতে বৈঠক করছেন তারই সামনে মোতায়েন ছিল লোকটি। তার কাছে সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। আমরা কি এগোবো? কোনদিন এই ঈশ্বর-বর্জিত জার্সিদেশ ছেড়ে যাওয়া হবে কি?

সেনানীদের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক চলে। লী যুদ্ধ করতে চান না।

এই চার্লস লী লোকটা বেশ বুদ্ধিমান সেনানী।

নেতৃত্বের ক্ষমতা নেই। চেহারাও কদাকার।

ওয়াশিংটন প্রায় পাগল হয়ে গেছেন। বসে বসে বিড় করে

বলছেন, তিনি একলা। হ্যামিলটন, ওয়েন আর স্ট্যুবেন ছাড়া কোন অনুসঙ্গী তাঁর নেই। ওয়াশিংটনের অবস্থা স্বপ্নবিষ্টের মত। বসে বসে বলছেন, কেন আপনারা আমার সঙ্গী হতে চাইছেন না? আমাকে কি একলাই থাকতে হবে? আমাকে কি একলাই থাকতে হবে? নিঃসঙ্গতা অসহনীয়।

ব্রিটিশরা কোথায় আছে?

জার্সিতেই। শুনছি, মাইল পনরো লম্বা এক সার দিয়ে তারা চলেছে। ফিলাডেলফিয়ার প্রায় আদ্ধেক লোক নাকি তাদের সঙ্গে যাচ্ছে। কে জানে, রাতে শোবার জন্য হয়ত হাজার দুয়েক ফিলাডেলফিয়ার বেশ্যা নিয়ে চলেছে।

ওয়েন যুদ্ধ করতে চান!

তিনি বলছেন, পেনসিলভানিয়ার লোক নিয়ে তিনি লড়াই করবেন। বলছেন, গোটা পল্টন জাহান্নামে গেলেও তিনি তাঁর পেনসিলভানিয়ার লোকজন নিয়ে যুদ্ধ করবেন।

তাঁর মত অমন মাথা-গরম লোক যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে পারে না।

তিনি বিড়বিড় করে বলছেন, দোহাই ভগবানের, যুদ্ধ করুন। জাহান্নামে যান! সবাই আপনারা ভীরু। লী বলছেন, এসব কথা তিনি সহ্য করবেন না। ওয়েন বলছেন যে লী'র জন্য কোন কথা প্রত্যাহার করেন তো তিনি বেজন্মা মিথ্যুক। ওয়াশিংটন তাদের দুজনকেই শান্ত করতে চেষ্টা করেন। হ্যামিলটন হলপ করে বলছেন যে সবাই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করছে। লী হ্যামিলটনকে ইহুদি বলে গালাগাল দেয়। তাই শুনে হ্যামিলটন তাকে খুন করতে যায় আর কি! বেদম ঝগড়া লেগেছে বৈঠকে।

ওদের মধ্যে কারও মনস্থির নেই বুঝি?

ওয়াশিংটন যুদ্ধ করবার পক্ষপাতী।

পরে যুদ্ধ করলে আর পল্টন এক সাথে রাখতে হবে না। এখনি আমরা আটদশ হাজার আছি। হয় এখুনি যুদ্ধ করতে হবে···না হয় মাসখানেক পরে পল্টনের অস্তিত্ব থাকবে না।

পরদিন আবার এগিয়ে চলি। ঘোড়া থেকে নেমে ওয়েন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছেন। রাগে টগবগ করছে লোকটা। অক্লান্ত ভাবে লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছেন আর আমাদের দ্রুত চালিয়ে নিচ্ছেন। আকাশে বৃষ্টির কোন লক্ষণ নেই। কোন মেঘ নেই সারা আকাশে। শুধু নীল অসীম বিস্তারের মধ্যে একটি লাল অগ্নি-গোলক জলজ্বল করছে। পা টেনে টেনে আমরা পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে চলেছি। যাচ্ছি বালিয়াতি মাড়িয়ে। পায়ের চাপে বালির ঢিবি ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে। উড়ো বালিকণায় অন্ধকার পথে অন্ধের মত এগোচ্ছি মশার ঝাঁকের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে।

বিশ্রামের অবকাশ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু সামনে এগিয়ে চলেছি। খালি পায়ে যারা রওনা হয়েছে, এতক্ষণে তাদের পায়ে দগদগে রক্তস্রাবী ঘা হয়েছে। তাতানো বালিতে পা পুড়ে যাচ্ছে। ফোসকা পড়েছে পায়ে। রোদে পুড়ে আর নোংরা লেগে আমাদের চেহারা আবার কালচে হয়ে গেছে। আবার দাড়ি গজিয়েছে মুখে। চামড়ার পর ফুলে রয়েছে মশার লাল লাল কামড়ের দাগ।

বেশ কষ্ট হচ্ছে এলির। জেকবের চেহারা শীর্ণ হলেও চোখে আগুন নিয়ে সে চলেছে। জেকব এই বিপ্লবের আত্মা। অনুযোগহীন অক্লান্ত। নিভিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত এ অনির্বাণ আগুন জ্বলবে। কিন্তু এলির পা কেটে কুচি কুচি হয়েছে। ফুলে উঠেছে আবার! শীতকালেও জলভাবে সারেনি তো! আমরা তার পা বেঁধে দিয়েছি। তবু অবিশ্রান্ত রক্ত ঝরছে।

বিশ্রাম দেবার জন্য একবার আমরা যখন বসে পড়ি, হাঁপাতে হাঁপাতে এলি বলে, এই-ই শেষ মার্চ আলেন।

না না! এর চাইতেও অনেক বেশী কষ্ট তুমি সয়েছ এলি। শিগগিরই আমরা বিশ্রাম পাব।

কোনরকম ক্ষোভ প্রকাশ না করে সে বলে, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আলেন! এতদিন কম বোঝা টানতে হয়নি! মস্ত বোঝা বয়েছি।

জব এনড্রুজ আমাদের পাশেই বসা। সে বলে, বুড়ো লোকের পক্ষে একটানা এভাবে মার্চ করা কঠিন।

যা বলেছ, বুড়ো লোকের পক্ষে কঠিনই বটে! মৃদু হাসে এলি।

বুড়ো হবার মত বয়স তোমার নয় এলি!

হয়েছে হে হয়েছে। বয়স কম হল না আলেন। ভাবছি বেচারী পা দুখানাকে এবার বিশ্রাম দিতে হবে। বেশ দীর্ঘ বিশ্রাম!

আবার হোঁচট খেয়ে টলতে টলতে এগোই। রাত হয় তো পথের মধ্যেই বসে পড়ি। আগুন জালবার শক্তি করেও নেই। সার বাঁধা অবস্থাতেই শুয়ে পড়ি। গরম বালির উপর মোড়ামুড়ি করি। হাঁ করে শ্বাস টানি। ভোর হবার সঙ্গে আবার রওনা হই। এগিয়ে যাই উত্তর মুখো।

চলতে চলতে দু-পাঁচ জন পড়ে যায়। মাথা ঘুরে চোখে ঝাপসা দেখে, আর গোটাকয়েক টাল খেয়ে ধড়াস করে মাটিতে পড়ে বাণ্ডিলের মত কুঁকড়ি সুকড়ি দিয়ে বালির উপর পড়ে থাকে। পল্টন এঁকেবেঁকে পাশ কাটিয়ে যায়। আমাদের সারা গায়ে নোংরা মাখা। রোদে-পোড়া বীভৎস কালো চেহারা সকলের।

চলার পথে একটি হেসিয়ানের লাস চোখে পড়ে। গরমে মারা গেছে বেচারী। উর্দি ও গাঁটরির সত্তর পাউণ্ড ওজনের পর এই

প্রচণ্ড গরম সইতে পারছে না। পোকা মাকড়ের মত মরছে। লোকটির ফিটফাট সবজে উর্দির উপর এঁটেল মাটি ও নোংরার দাগ। শূন্য দৃষ্টিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জার্মান সৈনিকটি। মশার কামড়ে মুখ ফুলে ঢোল হয়েছে। অদ্ভুত নিসঙ্গ লোকটি। ছমাস যে শত্রুর দেখা সাক্ষাৎ মেলেনি তারই স্মারক। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ থেমে তার বুট খুলবার চেষ্টা করে।

অনবরত এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। এইবার বুঝতে পারি যে শত্রু পালাবার চেষ্টা করছে। এ এক কল্পনাতীত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এই ছয় মাসের মধ্যে যে কোন দিন এক গুঁতোয় আমাদের খতম করে দিতে পারত। কিন্তু আজকে অধমগ্ন নোংরা ভিখারীদের ভয়ে পালাচ্ছে!

ক্রমেই আরও হেসিয়ানের লাশ চোখে পড়ে। সবাই গরমের চোটে মরেছে। কেউ কেউ রাস্তার উপরেই পড়ে আছে। রাস্তার দুপাশেও আছে কিছু। বালির উপর এদের সবজে উর্দি বেশ বর্ণ বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে। অমন ভারী উর্দি নিয়ে ওরা যে কি করে মাইল খানেক পথও চলেছে তাই ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। আমরা এদের বুট খুলে নিই। মরা হেসিয়ান দেখে হাসাহাসি করি। অধনগ্ন কিছু পেনসিলভানিয়ার চাষী হেসিয়ানের উঁচু টুপি মাথায় পরে; কিন্তু বেশীক্ষণ রাখতে পারে না।

তারপর ফুজিলধারী (সেকেলে হালকা বন্দুক) খাস ইংরেজের এক লাশ দেখা যায়। থেমে আমরা তার লাল কোট আর সোনালী ফিতের দিকে তাকাই। রাজার মত উর্দি বটে!

বেশ গরম কিন্তু। কে একজন বলে ওঠে। অমন গরম পোশাক গায়ে রাখতে পারবে কেন? বেচারী গরমের চোটেই মারা গেছে।

অনায়াসে লোকটা কোন উপত্যকায় থাকতে পারত। এক ফোঁটা রোদের জন্য আঁকুপাকু করতে হত না।

এইবার শীতে এমন একটা লাল জ্যাকেট যদি থাকত! অমন জিনিস ফেলে যেতে বুক ফেটে যায়!

ধুলোর আবছা আবরণের মধ্যে সহসা দু-চারটে জিনিস নজরে পড়ে। ড্রাম বাজনা থেমে গেছে। আমরা যেন ধুলোর সমুদ্রের মধ্যে হাতড়াচ্ছি। ভার্জিনিয়ার সৈনিকেরা টহলদারির জন্য এগিয়ে গেছে। অদৃশ্য স্থান থেকে মাঝে মাঝে তাদের শুকনো গলার হাঁক শোনা যায়।

সব ঠিক আছে···সব ঠিক আছে···সব ঠিক আছে···

খাদ একটা···হাত আষ্টেক গভীর।

বালির ঢিবি···

এরপর একখানা উল্টানো গাড়ি দেখি। বৃটিশদের মালটানা গাড়ি। একসল্ ভেঙে কাত হয়ে আছে। দুটো ভাঙা ট্রাঙ্ক থেকে মেয়েদের জামা পোশাক ছড়িয়ে আছে বালির উপর। হাতে হাতে আমরা পোশাক কটি তুলে নি। লেস-লাগানো সায়া গুটি কয়েক, লেস দেওয়া এবং রেশমী কয়েকটা জ্যাকেট আর গাউন একটা।

আমার এমি থাকলে পরতে পারত।

তোমার এমি এতক্ষণে গণ মেনার সঙ্গে ভিড়েছে। লেস-দেওয়া সায়া চাইবার মত লোক নেই।

গরমে মরা আরও বহু লাশ নজরে পড়ে। মুমূর্ষু ঘোড়াগুলো বালির উপর শুয়ে কঁকাচ্ছে। এক জায়গায় গুটিবারো হেসিয়ানের লাশ দেখা যায়। চোখ খাড়া করে পড়ে আছে। এখন আর তাদের রোদের ভয় নেই।

পাইন বনের শেষ নেই। লম্বা লম্বা পাতা ঝরা পাইন গাছ জায়গায় জায়গায় মাথার উপর যেন ছাতি মেলে ধরে। শ'খানেক পা দূরে সামান্য এক ফালি খোলা জায়গা। আগাছায় ঢাকা গড়ানে

বালির ঢিবি। তারপর আবার পাইন বন। পাইনের উগ্র মাতাল করা গন্ধ ভুলে থাকবার জো নেই। বালির উপর দিয়ে চলবার সময় পা ফসকে যায়—পড়ে যায়। হাত পা ছড়িয়ে একবার পড়ে যাচ্ছি। আবার কোনমতে উঠে চলছি। এলি আমার পাশে। একরোখা যন্ত্রের মত চলেছে সে। চকচক করছে চোখদুটো। আমি তাকে সাহায্য করবার জন্য হাত বাড়াই। ভাঙা গলায় ফিসফিস করে ধন্যবাদ দেয় এলি।

রাত কাটাবার জন্য ছাউনি ফেলা হয়। জোর এক পশলা বৃষ্টি আমাদের ভিজিয়ে চুপচুপ করে দেয়। বাজও পড়ে। সামান্য যে কয়েকটি আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করা হয়, বৃষ্টিতে তাও পণ্ড হয়ে যায়। জন্তুর মত আমরা শুয়ে থাকি। নীরবে সহ্য করি দুঃখ কষ্ট।

সংবাদ রটে যায় যে ব্রিটিশরা আমাদের কাছাকাছি আছে। ক্ষীণ ভাবে একটি তূর্যধ্বনি কানে আসে। পেনসিলভানিয়ার সৈন্যদলের মধ্য দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে ওয়েন আমাদের সম্ভাব্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে যান। গাছের গুঁড়ি জড়ো করে আমরা রক্ষাব্যূহ তৈরী করি এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমোই। ঘুমের ঘোরে অনেকেই গাছের গুঁড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

ওয়াশিংটনের তাঁবু আমাদের আস্তানা থেকে বেশী দূরে নয়। পরামর্শ বৈঠকের জন্য অন্যান্য ব্রিগেডের সেনানীরা তাঁর তাঁবুতে যায়। ভারনাম, স্টুবেন, চার্লস লী, গ্রীন আর লর্ড স্টার্লিং তাঁর ঘরে জমায়েত হয় এবং আলোয় তাদের চেহারা ছায়ার মত ঘোরাফেরা করে।

মনে হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরা তর্কাতর্কি ঝগড়া-ঝাটি করে। সহসা ওয়েনের গলা শোনা যায়। তারস্বরে চেঁচিয়ে তিনি বলছেন, যুদ্ধ করুণ, দোহাই ভগবানের যুদ্ধ করুণ! দেখছেন না যুদ্ধ না করলে সব খতম হয়ে যাবে? পনেরো মাইল লম্বা আধমরা সৈনিক আর বেশ্যার

দলকে বাগে পাওয়া গেছে। এমন সুযোগ আর আসবে না। ভালমত একটা গুঁতো মারলে যুদ্ধ খতম হয়ে যাবে। একটা গুঁতোই যথেষ্ট। আমার লোকজনের দিকে তাকান। ভাবছেন কি গত শীতের মত আর একটা শীতও এরা সহ্য করবে? এখুনি লড়াই না করলে মাসখানেক পরে পল্টনের অস্তিত্ব থাকবে ভাবছেন?

ওয়াশিংটনের স্বর কানে আসে। ক্লান্ত পিতার মত ওয়েনকে তিনি প্রবোধ দেন।

হ্যামিলটন তখন বলে ওঠে, আমার ঘেন্না ধরে গেছে স্যর—সত্যিই ঘেন্না ধরে গেছে। আপনি আমার কমিশন নিয়ে নিতে পারেন।

লীর কর্কশ আওয়াজ বেজে ওঠে, আপনিই সব ডোবাবেন। এ পল্টনের নেতৃত্ব কি নাবালকের হাতে, না বয়স্করা এর পরিচালনা করছেন? হ্যামিলটনের মত অমন ডেপো কুকুর ছানার উপদেশ আমি চাই না।

এ জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে স্যর।

দোহাই—দোহাই আপনাদের। সৈনিকদের কথা ভেবে একটু আস্তে বলুন না। চেঁচাবার কি দরকার?

তখন তাদের কণ্ঠস্বর মৃদু গুঞ্জনে পরিণত হয়। আমরা তখন তাঁবুর কাছাকাছি এগিয়ে আসি। বালির উপর শুয়ে কান পেতে থাকি। বারে বারেই আমার ঝিম আসে। চোখ খুলবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর চেঁচামেচি কানে আসে। ভাঙা ইংরেজীতে লা ফায়েত বলে, এ হতে পারে? এর চাইতে অপমানকর আর কি হতে পারে? আপনারা শুনুন, আমরা যদি আঘাত না হানি তো আমি বাঁচতে চাই না।

আঘাত হান…আঘাত হান! কি দিয়ে আঘাত হানবেন? বাইরের ঐ ভগ্নবল ভিখারীগুলোকে দিয়ে?

আমার সৈন্যদলের জন্য আমিই দায়ী রইলাম স্যর। ওয়েন চেঁচিয়ে ওঠেন।—ভিখারীদের জন্য আমিই দায়ী থাকব। ওদের নিয়ে আমি নরকে চলে যাব। শুধু একবার আমায় সুযোগ দিন।

স্টুবেন বলেন, চমৎকার লোক ওরা। হলপ করে বলছি, ভাল লড়িয়ে।

অবশেষে পরামর্শ বৈঠক ভেঙে যায়। তাঁবু থেকে বেরিয়ে সেনানীরা ঘোড়ায় চড়ে যে যার সৈন্যদলের দিকে চলে যায়। ওয়েন এবং হ্যামিলটনকে নিয়ে ওয়াশিংটন তাঁবুর প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। কথা বলেন চাপা গলায়। আরও অনেকটা বুড়িয়ে গেছে তাঁর মুখ। আরও শীর্ণ হয়েছে। বড় বড় হাড় বেরিয়ে পড়েছে টান টান চামড়ার তলায়।

সেনানী দুজনের সঙ্গে করমর্দন করে ওয়াশিংটন তাঁবুর মধ্যে ঢুকে যান। হ্যামিলটন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেগনি চোখে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। ওয়েন গাছের গুঁড়ির বেড়া অবধি হেঁটে যান এবং একটা গুঁড়ির পর বসে হেঁট মাথায় মাটির দিকে চেয়ে থাকেন।

ক্যাপ্টেন মুলার তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসু ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, কালকে, স্যর ?

কালকে অনেক কিছু জবাব মিলবে।

আমরা যুদ্ধ করব ?

চোখ না তুলে ওয়েন মাথা ঝাঁকান।

এলির সঙ্গে আমি পাহারায় বেরোই। গাছের বেড়া থেকে সামান্য এগিয়ে আমরা অন্ধকারের গর্ভে চেয়ে থাকি। গভীর নিস্তব্ধ রাত। বেজায় গরম। বাতাস নেই একটুও।

অদ্ভুত জঙ্গল। মাটিতে শিকড় বসানো মৃতের জঙ্গল যেন। আবার মোহকের জঙ্গল দেখতে পাব ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম আবারও নরম সবুজ গাছের মধ্য দিয়ে হাঁটতে পাব।

শিগগিরই আমরা হয়ত ফিরে যাব। হয়ত কালকের যুদ্ধের পরেই…

তোমার ভয় করছে আলেন? এলি শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করে।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিই।

কেনটন আর ওদের সবাইর কথা ভাবছ বুঝি!

কেনটনের কথা ভাবছি বটে। ফাঁসিতে মরবার অপমানের জন্য কেনটন যদি আমায় শাপ দেয় তো…

কেনটন মারা গেছে। আমার ধারণা আলেন, মরা লোক শান্তিতে বিশ্রাম করে। পাহাড়ের পর যেখানে আমরা তাকে রেখে এসেছি, গভীর শান্তিতেই আছে সেখানে। এতে লজ্জার কি আছে? মৃত্যু তো ক্লান্ত দেহের পক্ষে পরম শান্তির বিশ্রাম।

আমি যখন এ সম্পর্কে ভাবি, কেবল যুদ্ধের ছবিই মনে পড়ে। মনে হয় যেন একটার পর আর একটা যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধ যদি চলে তো গত শীতের মত আরও বহু শীতের দুর্ভোগ ভুগতে হবে। যুদ্ধের উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে এলি। ড্রামের বাজনাহীন দৈনন্দিন জীবনের জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করছে। ভার্জিনিয়ানদের কাছ থেকে পালিয়ে যে ছোট্ট মেয়েটি ছুটে আসে, বারে বারে তার কথা মনে পড়ে। কোন পুরুষের স্ত্রী হবার যোগ্য সে নয়। তবু তা-ই সে চেয়েছিল। আজকে মনে হয় তাকে পুরোপুরি ভালবাসতাম এবং তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতেও বিশেষ ইতস্তত করতাম না। তাকে নিয়ে ঘর করলে সাংসারিক জীবন শান্তিময় হত এলি। সূর্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গে গাছ পুঁততে লেগে যেতে পারতাম…লাঙলের ফালে উলটান বাদামি মাটির রঙ দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত…তারপর দিনান্তে এমন এক স্ত্রীর কাছে ফিরে আসতে পারতাম যে পুরুষের কাছে বেশী কিছু চাইত না।

তা আর হবার জো নেই। এলি বলে।—আমি তোমায় ব্যথা

দেব না আলেন। তুমিই আমার সব কিছু। কোন ছেলে আমার নেই আলেন। মাঝে মাঝে তোমাকেই পুত্র বলে মনে হয়। কিন্তু যা চাইছ তা কোনদিনই পাবে না। কোন বিশ্রাম পাবে না। আমার নিষেধ রইল আলেন, বিশ্রাম কর না। আমার চির-বিশ্রামের দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু তুমি বিশ্রাম করতে পার না! আমার দিন ফুরিয়েছে—আর তোমাদের দিন শুরু হচ্ছে।

তার দিকে চেয়ে আমি বারে বারে মাথা ঝাঁকাই।

এই যুদ্ধের পর তোমাদের ভাঙা টুকুরো জোড়া দিতে হবে আলেন। শক্তিমানদের সামনে বহু বছরের সংগ্রাম পড়ে আছে। তুমিও শক্তিমান হবে। তখন তোমরা খণ্ড খণ্ড টুকরো জোড়া দেবে। কোন বিশ্রাম—কোন শান্তি তোমাদের নেই।

তারপর ?

মাঝে মাঝে ভরসা হয়, স্বপ্ন বুঝি সফল হবে। আমরা শুধু ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করছি না। লড়াই করছি ওই পশ্চিমে সুন্দর এক বিশাল দেশ গড়বার জন্য। আলাদা ধরনের মানুষ সেই স্বাধীন দেশে বাস করবে আলেন। স্বাধীন দেশের নতুন মানুষ।

আমি বুঝি না। আমি বলি।—আমি ক্লান্ত এলি।

আমার উপর বিশ্বাস রাখ। এলি বলে।

সে-রাত্রে ঘুমোবার চেষ্টা করি। বেসের কথা ভেবে তাকে নিবিড় করে কাছে টেনে আনতে চাই। কিন্তু কোন কিনারা হয় না। এ শুধু অন্তহীন এক সংগ্রাম। শূন্য আদর্শের পেছনে হাতড়ে-মরা। নিজের মনে দৃঢ় আস্থা আনবার চেষ্টা করি। এলি যে ভাবে বিশ্বাস করে, যে ভাবে বিশ্বাস করে জেকব—আমিও ঠিক সেই ভাবে বিশ্বাস করতে চাই।

—তেইশ—

ভোর হতে-হতেই আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। ওয়েন রাত্রে ঘুমিয়েছেন বলে মনে হয় না। উত্তেজিত ভাবে তিনি আমাদের লাইনের পাশ দিয়ে পায়চারি করছেন আর মাথা নাড়ছেন। মাঝে মাঝে আমাদের বন্দুকের দিকে তাকাচ্ছেন এবং বিনা প্রয়োজনে ফিসফাস করে কথা বলছেন। অস্থির হয়ে পড়েছেন তিনি। মুখ বেয়ে দরদর ধারায় ঘাম পড়ছে।

কোমর অবধি নগ্ন অবস্থায় আমরা যুদ্ধের গোছগাছ করি। অধিকাংশেরই খালি-পা। মোজাও নেই। ব্রিচেজও নেই অনেকের। ছেঁড়া এক ধাঁচের কিলট্ (হাইল্যাণ্ডারদের ঘাঘরা) পরে তারা লজ্জা নিবারণ করেছে। একঘেয়ে সুরে ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন বলে যাচ্ছে: বারুদ মেপে নাও—নিজের নিজের বারুদ মেপে নাও। বারুদের পাত্রগুলো শুকিয়ে নাও আর শুকনো রাখার ব্যবস্থা কর। বিশ রাউণ্ডের কম গুলি যার আছে, সে এখুনি রিপোর্ট কর। বন্দুকগুলো পরীক্ষা করে দেখ—দেখ ঠিক মত জ্বলে কিনা।

সৈনিকদের হাতে রেতি দেওয়া হয়। সবাই নিজের নিজের চকমকি ছুঁচলো করে নেয়। আমিও আমারটা পরখ করে দেখি। তেমন চট করে জ্বলে না। আমার ভিজা হাত কাঁপছে। তখন একটা রেতি নিয়ে চকমকি ছুঁচলো করবার চেষ্টা করি। এলি আমার হাত থেকে চকমকিটা নিয়ে দুটো ঘষায় ছুঁচলো করে দেয়। অদ্ভুত শান্ত এলি। মুখখানা সামান্য বিষণ্ণ এবং কতকটা বিস্মিত। জেকবের চোখ দুটো জ্বলছে। মনে হয় যেন জ্বর হয়েছে।

ওয়েন স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। হেঁকে বলেন, কিরিচ—

নিজের নিজের কিরিচ ভাল করে লাগিয়ে নাও। একটা বন্দুক পরীক্ষা করে তিনি ফেলে দেন। অনবরত ছুটাছুটি করছেন পাগলের মত।

আমরা তখন নিজের নিজের গোলাগুলি গুণে দেখি। শিঙে-ভরা আমার নিজের বারুদটুকুও যথারীতি মেপে দেখলাম। আঙুল দিয়ে খানিকটা তুলে দেখলাম শুকনো আছে কি না। বারুদ শুকনো আছে বটে, কিন্তু আঙুল ভেজা। সারা গা ভিজে চুপচুপ হয়েছে। পট্টির মত ব্রিচেজ লেগে পড়েছে পায়ে। জলের সূক্ষ্ম আস্তরণে আমার গোটা দেহ ঢাকা।

অস্থির ভাবে আঙুল দিয়ে মাস্কেট নাড়াচাড়া করি। জেকব বলে, গুলি ভরে রাখ। যত্ন করে গুলি ভরে রাখ আলেন। পয়লা গুলির উপরেই বাঁচা-মরা নির্ভর করে। প্রথম বারে যদি না জ্বলে তো আর জ্বলবে না।

জেকবের কথা শুনে গুলি ভরে রাখি। বন্দুকটা আমার বাবার। মোটা ফুটোওলা সেকেলে মাস্কেট। একসঙ্গে তিন তিনটে গুলি ভরলাম। শঙ্কিতভাবে এলিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনটে গুলি ভরেছি, খুব বেশী হয়েছে কি?

মাস্কেটটা বেশ পোক্ত আছে আলেন।

আমার বেজায় বিচ্ছিরি লাগছে এলি। আমাকে দিয়ে আর কিছু হবে না। ইচ্ছে হয়, বনে বসে শুধু বিশ্রাম করি। লড়বার কোন আগ্রহই নেই এলি।

এই-ই প্রথম লড়াইতে যাচ্ছ না তো! সংক্ষেপে বলে জেকব।

সাত মাস আগে একবার লড়াই করেছি।

শান্ত হও ছোকরা—শান্ত হও। এলি প্রবোধ দেয়।

তারপর আমরা সার বেঁধে দাঁড়াই। তখনও হেঁকে হেঁকে বলা হচ্ছে, গুলির ভাণ্ড শুকিয়ে নাও...মেপে দেখ কটা গুলি আছে...

সৈনিকদের কেউ কেউ নুনমাখা মাংস চিবোচ্ছে। আমারও পেট খালি। বেদম ক্ষিদে পেয়েছে। নিজের গাঁটরির কাছে গিয়ে এক টুকরো মাংস তুলে আনি। কিন্তু জেকব থাবা দিয়ে মাংসটুকরো হাত থেকে ফেলে দেয়।

বেজায় তেষ্টা পাবে।

বড্ড খিদে পেয়েছে জেকব।

খেও না। সঙ্গীদের একজন বলে ওঠে।—খাওয়া পেটে গুলি লাগলে বেজায় বিচ্ছিরি লাগে।

সেনানীরা ওয়াশিংটনকে ঘিরে ধরেছে। ওয়েন তর্ক করছেন। রাগে গড়গড় করে চার্লস লী গটমট করে দূরে সরে যায়। তার পরামর্শ উপেক্ষা করে লড়াই করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটন তাকে ডেকে ফেরান। হ্যামিলটন গোমরামুখে তাঁবুর কাছে একলা দাঁড়িয়ে আছে। স্টুবেন আছেন তার লোকজনের কাছে। দূরে থাকবার উপায় তার নেই।

বাছারা, মনে থাকে যেন…

সবে সূর্য উঠছে। রঙের ছোপ লেগেছে পাইন বনের মাথায়। হাওয়া নেই একেবারেই। এত সকালেও অসহ্য গরম লাগছে। পাইন গাছের তীব্র গন্ধের সঙ্গে মিশেছে বারুদ আর ঘামের গন্ধ। মনে খুঁত-খুঁতি নিয়ে আমরা চলাফেরা করি। একদৃষ্টে চেয়ে থাকি নিজের নিজের মাস্কেটের দিকে। যেন এর আগে কোন দিন মাস্কেট দেখিনি।

সহসা ওয়েন নিজের ঘোড়ার কাছে যান এবং ঘোড়ায় চড়ে লাইনের সামনে এগিয়ে যান। লা ফায়েতও তার অনুসরণ করে। লী পেছন থেকে তাদের ডেকে কি যেন বলেন। তারপর লীও ঘোড়ায় চড়েন। সৈন্যদের তখন মার্চ করবার হুকুম দেওয়া হয়। জিনের পর বসে খানিকটা হেলে ভার্জিনিয়ার এক লম্বা স্কাউটকে ওয়েন যেন উদ্বিগ্নভাবে

কি বলছেন। ওয়াশিংটন আমাদের লক্ষ্য করছেন। তাঁর মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ। ঘোড়া ছুটিয়ে লী এক পাশে সরে যান। কারও সঙ্গে কোন কথা বলেন না। দুঃসহ ক্রোধে তার অদ্ভুত কদাকার মুখখানা কুঞ্চিত। বেজায় কুৎসিত লোকটা। নিজের কুৎসিত মনের আগুনে নিজেই পুড়ে মরছে। পেশাদার সৈনিক লী। স্ট্বেন না-আসা অবধি পেশাদারী পরামর্শের জন্য অন্তত তার কদর ছিল। কিন্তু যুদ্ধ করা না-করার পরামর্শ এখন স্ট্বেনই দেন এবং তার পরামর্শ অনুসারেই ওয়াশিংটন লী'র যুদ্ধ না করার যুক্তি অগ্রাহ্য করেছেন। হ্যামিলটন, লা ফায়েত এবং ওয়েনের প্রতি তার ঘৃণা এত স্পষ্ট যেন বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না।

অতি দ্রুত এগোচ্ছি আমরা। সামনে যা পান ওয়েন যেন তার মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়তে উদগ্রীব। বেজায় গরম। প্রথমে আমরা পাইন বনের মধ্য দিয়ে এঁকে-বেঁকে এগোই। তারপর ঢুকে পড়ি বার্চ ও মেপল বনে। তারপর একটা খাদের মধ্যে নামি। খাদ পার হয়ে ওপারে গিয়ে আবার সার বেঁধে চলতে থাকি। ওয়েন তখন সৈন্যদলের মুখ ঘুরিয়ে দেন। পাখার মত ছড়িয়ে আমরা অর্ধবৃত্তাকারে চলতে থাকি। সামনে আর একটা বন পড়ে। এখন পর্যন্ত শত্রুর কোন হদিস মেলে নি।

বন পার হয়ে খানিকটা দূর আমরা পথ ধরে চলি। তারপর আর একটা পাহাড়ে খাদ পার হই। এ খাদের তলায় কাদা ভরতি। হাঁটু অবধি কাদায় ডেবে যায়। পা টেনে টেনে কোনমতে পার হই। সারা গায়ে কাদার ছিটে লাগে। ব্রিগেডের কমাণ্ডাররা পরস্পরকে ডাকাডাকি করে। তরোয়াল ঘুরিয়ে ওয়েন আমাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রাখবার চেষ্টা করেন। লীর সাদা ঘোড়াটা সারা গায়ে কাদা ছিটিয়ে প্রাণপণে কাদার মধ্য দিয়ে এগোবার চেষ্টা করছে। পেছন ফিরে

আমাদের দিকে না চেয়ে এগিয়ে চলেছেন তিনি। উদাসীনের মত ক্লান্তভাবে বসে আছেন জিনের উপর।

ঘণ্টাখানেক হল চলছি। তারও কিছু বেশী হতে পারে। সময়ের জ্ঞান নেই। কিন্তু চোখ তুলে দেখি যে গাছের ফাঁকে সূর্য উঁকি মারছে। রাস্তার চাইতে খাদের তলা অনেক ঠাণ্ডা। রাস্তা তেঁতে আগুন হয়েছে।

একবার আমি হোঁচট খেয়ে পড়ি। জেকব ধরে তোলে। বলে, আমার কাছে কাছে থাক আলেন—কারও অসুবিধা হবে না। আমার কাছে কাছে থেক।

ওয়েন হেঁকে বলেন, বারুদ শুকনো থাকে যেন। দোহাই ভগবানের, বন্দুকে যেন কাদা না লাগে।

তাঁর হুঁশিয়ারির প্রতিধ্বনিতে হাঁক ওঠে, নিজের নিজের বারুদ সামলাও…চকমকি পরিচ্ছন্ন রেখ…

খাদ পার হয়ে আমাদের ব্রিগেড উপরে উঠছে। সবাই কোমর অবধি কাদায় ভেজা। হোঁচট খেতে খেতে বনের মধ্য দিয়ে এগোই। সহসা গোটাকয়েক গুলির আওয়াজ কানে আসে। এ সঙ্কেতের অর্থ এই যে আমাদের স্কাউট শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ-রক্ষীদের সংস্পর্শে এসেছে।

আমাদের এখনকার অবস্থা অনেকটা ফাঁদে পড়ার মত। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে উঠছি কিন্তু পেছনে কাদা-ভরতি খাদ। মূল সৈন্যদল এখনও অনেকটা পেছনে। কমপক্ষে মাইলটাক হবে। এই কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আগুনের ঝিলিক খেলে যায়। চট করে সবাই থেমে পড়ে। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। মুখ হাঁ-হয়ে যায়। আমি তখন শুধু খাদটি আবার পার হয়ে যাবার কথা ভাবি। ঐ একটি মাত্র চিন্তা মনে জাগে। সবাই হয়ত এক কথাই ভাবছে।

ওয়েন ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যান এবং উন্মত্তের মত চীৎকার করে বলেন, ওপরে ওঠো—চটপট ওপরে ওঠো।

হঠাৎ আমি অবাক হয়ে ভাবি, কেমন করে এলাম এখানে? কে আমাদে এমনি একটা ফাঁদে ফেলেছে যে কাদায় আটকে গুলি খেয়ে মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই?

স্বপ্নাবিষ্টের মত বারে বারে মাথা ঝাঁকাচ্ছে এলি।

জেকবও ওয়েনের সঙ্গে গালমন্দ চেঁচামেচি শুরু করেছে। সে আমাদের সবাইর সামনে। পা টিপে টিপে এগোচ্ছে। মনে হয় যেন গাছের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। যেন তার নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি নেই—শুধু গড়িয়ে যাচ্ছে।

তবু আমরা এগোই। ওয়েনই যেন টেনে নিচ্ছেন। হোঁচট খেয়ে, আছাড় খেয়ে কোন মতে পাহাড়ের মাথায় চড়ি। কোনমতে মাস্কেট সহ নিজেদের দেহ টেনে নিয়ে আসি। সেখানে আবার সার বাঁধা হয়। ক্রমেই আরও লোকজন এসে পড়ে। লাইন বেঁধে সামনে চেয়ে দেখি যে ভার্জিনিয়ার স্কাউটরা গাছের মধ্য দিয়ে ছুটে আসছে। তাদের পেছনে অস্পষ্ট একটা লাল আভাও নজরে পড়ে।

ব্রিটিশদের রণভেরীর শব্দ যেন সকালের বাতাসে উত্তাপের তরঙ্গ সৃষ্টি করে। রণভেরীর শব্দে আমাদের মাথা দপদপ করে। মাটিও যেন কেঁপে ওঠে। ঘূর্ণায়মান চাকার ঘর্ঘর শব্দের মত দামামার বিরামহীন শব্দে চিন্তা-ভাবনা যেন অতলে ডুবে যায়। মনে হয় যেন এই বাতাস-কাঁপানো শব্দ উত্তাপের উৎস। ঘোড়া থেকে নেমে ওয়েন আমাদের লাইনের সামনে হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটাছুটি করে অনুনয়ের সুরে বলেন, এইখানেই রুখতে হবে। খেয়াল রেখ, এইখানেই রোখা চাই।

কাদা-মাখা সাদা ঘোড়াটার রাশ টেনে চার্লস লী হেঁকে বলেন,

এখুনি এখান থেকে সরে পড়তে হবে জেনারেল! যে করে হোক সরে পড়া চাই। আমাদের দশা ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মত। এখুনি পিছু হটা দরকার।

তারস্বরে চীৎকার করে ওয়েন বলেন, ইচ্ছে হয় আপনি পিছু হটতে পারেন স্যর! পিছু হটে নরকে গেলেও আপত্তি নেই।

মনে রাখবেন, আমিই এখন সেনাপতি।

আপনি জাহান্নামে যেতে পারেন স্যর! ওয়েন কেঁদে ফেলেন। ব্রিটিশরা তখন শ'খানেক পা দূরে। সঙিন উঁচিয়ে তিন সারে এগোচ্ছে। রোদে ঝিকিয়ে উঠছে তাদের কিরিচ। ইংরেজের রণ-ভেরীতে তখন মার্চের বাজনার বদলে চাপা কুর-কুর কুর-কুর আওয়াজ হয়। এ বাজনা যেন আমাদের উপহাস করছে। তাড়াহুড়া না করে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছে তারা।

আগুয়ান শত্রুসৈন্যদের গুণবার চেষ্টা করি। গুণব কি, তাদের লাইনের কি অন্ত আছে? ব্রিটিশ বাহিনীর পশ্চাদরক্ষী সমস্ত সৈন্য এগিয়ে এসেছে পেনসিলভানিয়া আর নিউ ইংলণ্ডের গুটিকয়েক ব্রিগেডকে আক্রমণ করতে। আমাদের পল্টন কোথায়? বোকার মত এ কি ভাবে বলি হচ্ছি?

কি করতে হবে কিছুই জানি না। সেনাপতি হিসাবে লী পিছু হটার আদেশ দিয়েছেন। লা ফায়েত আর ওয়েন পাগলের মত রাগে গরগর করছেন। চীৎকার করে রুখতে বলছেন আমাদের। লাইনের নীচে দাঁড়িয়ে স্কট মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। গরমের চোটে আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়েছে। এখনও যেন আমরা ফোর্জ উপত্যকার নরকের স্বপ্নে বিভোর। গরমের ওষুধ ঠাণ্ডা। নরক যেমন গরম তেমনি আবার ঠাণ্ডা। কেউ কেউ মাস্কেট ফেলে খাদের দিকে দৌড় দেয়। কেউ কেউ আবার হাতের বন্দুক ফেলে দিয়ে অবাক বিস্ময়ে

ব্রিটিশদের দেখছে। পল্টনের কি করতে হয়—কখন কি করা উচিত, তা আমরা ভুলে গেছি। জানি শুধু কষ্ট ভোগ করতে।

এবারেও কষ্ট ভোগ করি। পুরানো দুঃখু-কষ্টের জের টেনে চলেছি। নিজেরাই আটকা পড়েছি নিজেদের বাঁধনে। চোখের উপর দিয়ে পরিখা জীবনের দিবা-রাত্রির স্মৃতির মিছিল চলে যায়। মনে পড়ে প্রচণ্ড শীতের রাতে পাহারা দেবার কথা। আরও মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা যখন মাতাল জানোয়ারের মত উপোস করে কাটাতে হয়েছে। মানুষ মরলে তাদের কবর দেওয়া যায়নি—লাশ পাঁজা করে রাখা হয়েছে। নতুন একটা জাতির জন্ম দেবার দায়িত্ব যাদের মাথায়, তাদের শুধু মানুষ বই আর কিছু বলা যায় না। মেয়েদের মত সহ্যগুণও আমাদের নেই। ব্যথা সয়ে তারা সন্তান জন্ম দেয়। তারপর আবার ব্যথার শয্যা ছেড়ে নতুন করে পূর্ণ স্বাস্থ্যে উঠে দাঁড়ায়। দুঃখকষ্টের শেষে কোন ভবিষ্যৎ দেখবার শক্তি আমাদের নেই। পারিনা বেদনার অভিজ্ঞতা থেকে নতুন স্বপ্নের জাল বুনতে। কোন নতুন স্বপ্নের ব্যথা আমাদের উদ্দীপ্ত করে না। পরাভূত বিজিত জনতা আমরা।

ব্রিটিশরা এগিয়ে আসে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তাদের ফৌজদারদের কড়া গলার হুকুম। অদ্ভুত কণ্ঠস্বর। পরদেশী উচ্চারণভঙ্গী। ভিন্ন জগতের কথা। প্যারেড করে এগোচ্ছে ব্রিটিশসেনা। অকুতোভয়ে এগিয়ে চলেছে বিজয়ের পথে!

আচমকা কান্নাজড়িত একটা কণ্ঠস্বর কানে আসে। ওয়েনের আর্তনাদ। এখন তিনি সবই বুঝেছেন। এখন আর আমাদের বিরাট কিছু করতে বলবেন না। বুঝছেন যে ছোটখাটো লোকের কাছে বিরাট কিছু চাওয়া অর্থহীন। তিনি দেখছেন যেন কোর্জ উপত্যকা থেকে একটা বিভীষিকা উঠে তাকে অভিভূত করে ফেলছে।

সে ভয় তিনি জয় করেন। অকুতোভয় ওয়েন। ভয়লেশহীন পাগল। কিন্তু সাধারণ লোকজনের জানোয়ার হয়ে যাবার ছবি ওয়েনের চাইতেও বড় কথা। প্রাণপনে তারা চেষ্টা করছে কোনমতে নরক থেকে মুক্তি পাবার।

সত্যিই আমরা নরকে আছি। ওয়েনও আছেন সঙ্গে। কৃতকর্মের পাপে লীও রেহাই পায়নি। লোকজন নেতৃত্বহীন।

পঞ্চাশ পা সামনে ব্রিটিশরা কিরিচ চার্জের জন্য তৈরী হয়। এখন তাদের বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। উঁচু ছুঁচলো টুপি এবং সোনালী ফিতে লাগান লাল কোটের ফাঁকে প্রতিটি মুখ দেখা যাচ্ছে। দেখি, তামাক চিবোবার সময় একজনের চোয়াল নড়ছে। ভেরী বাজিয়েদেরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একটানা বাজিয়ে চলেছে তারা। স্পষ্ট দেখছি, মার্চ করবার সময় তাদের বারুদের কেসগুলো নড়ছে। টুপির তলায় একটি সৈনিকের হলদে চুল নড়ছে, তাও দেখতে পেলাম।

আমরা গুলি করতে শুরু করি। কোন তাক না করে অকারণে এলোপাথারি গুলি ছোঁড়ে সৈনিকেরা। ব্রিটিশ পক্ষের জনকয়েক মাটিতে পড়ে যায়। একজন পেট চেপে ধরে টলতে টলতে লাইন ছেড়ে গাছে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। বাকী আর সবাই তখন আমাদের দিকে ছুটে আসে। সার বাঁধা বহ্নিশিখার মত কিরিচ ঝলসে ওঠে। কিরিচের পেছনে লাল কোটগুলো যেন জ্বলন্ত আগুন। গর্জে ওঠে তাদের বন্দুক। ধোঁয়ার আড়াল থেকে বারবার গুলি করে ইংরেজ-সেনা।

আমিও গুলি ছুঁড়ি। যে কোন কারণেই হোক, বন্দুকটা কাঁধে ধাক্কা মেরেছে দেখে অবাক হয়ে যাই। হঠাৎ দেখি, আমি আর এলিই শুধু রয়েছি। জেকব চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তার মাথায় একটা ফুটো। সেই মুহূর্তে জেকবকে চিনতে পারি। মশালের

মত সে বেঁচেছে ; আবার দপ করে নিভেও গেছে মশালের মত। সাধারণ লোকজন, এমনকি ওয়েন বা ওয়াশিংটনের চাইতেও আলাদা জেকব। সে ছিল বিপ্লবের একক লক্ষ্য। জেকব ছাড়া এমনি আরও কিছু লোক দেখেছি। নিশ্চয়ি এমনি আরও অনেক লোক ছিল। সেদিন যখন এলি আমাকে বলে যে কোন শান্তি, কোন বিশ্রাম নেই, তখন সে যে কি বলতে চেয়েছে এখন তা···

এলি আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ইংরেজরা প্রায় আমাদের উপর এসে পড়েছে। কাস্তের মত কেটে যাচ্ছে কিরিচ দিয়ে। আমাদের খানিকটা সামনে এক ভার্জিনিয়ান স্কাউটকে কেটে ফেলেছে। রাইফেলটা মুগুরের মত ঘুরাবার সময় চার চারটে সঙিন বসিয়ে দিয়েছে। ভার্জিনিয়ানদের সঙিন নেই—আছে শুধু লম্বা সরু নলের রাইফেল।

প্রবল শক্তিতে এলি টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। দুজনেই অন্ধের মত ছুটছি আর আছাড় খাচ্ছি—আবার উঠে দৌড়োচ্ছি। আমাদের সামনে আরও অর্দ্ধোলঙ্গ লোক রয়েছে। তারাও হন্যে হয়ে দৌড়োচ্ছে আর ভীতিবিহ্বল জানোয়ারের মত চেঁচাচ্ছে। ছুটতে গিয়ে আছাড় খাচ্ছে···গাছে ধাক্কা লাগছে···গা ছড়ে যাচ্ছে···রক্ত পড়ছে, তবু ভীতি বিহ্বল লোকজন দৌড়োচ্ছে শুধু একটি মাত্র চিন্তা নিয়ে—কি করে পালানো যায় ইংরেজ কিরিচের নির্মম লাইন থেকে। কি করে অব্যাহতি পাওয়া যায় এই কাস্তে কাটা থেকে।

ছুটতে ছুটতে আমরা খাদের পাড়ে আসি এবং টলতে টলতে পড়ে যাই। খাদের পাড়ে দাঁড়িয়ে পলকের জন্য ওয়েনকে দেখতে পাই। ঘোড়ার পিঠে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। চীৎকার করে বলছেন, এর মানে কি ? আমার সৈন্যদল কোথায় ? কোথায় আমার লোকজন ?

ঢালু পাড় দিয়ে আমরা গড়িয়ে চলেছি। ধাক্কা খাচ্ছি গাছে গাছে। হুড়মুড় করে কাদা জায়গাটা পার হবার চেষ্টা করছি। কাদা ভরতি খাদটিতে লোক থৈ থৈ করছে। ভীতিবিহ্বল নোংরা হতভাগার দল। অন্ধের মত হুড়োহুড়ি করছে। আমার দশাও আর দশজনের মত। অপর পারে যাবার জন্য আমি গোঁ ধরি কিন্তু এলি আবারও হাত টেনে ধরে।

ইংরেজরা খাদের মাথায় সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে এবং কাদা পার হয়ে যারা অপর পারে উঠবার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করছে, বেছে বেছে নির্মমভাবে গুলি করছে তাদের। তবুও শত শত লোক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ছুটে পালাচ্ছে। হাত দিয়ে দেখিয়ে এলিকে বলি, ঐ দিক দিয়ে চল এলি।

কাদার মধ্য দিয়ে এলি আমায় টেনে নিয়ে যায়। দুজনেই হাঁটছি খাদ দিয়ে। ঠিক আমার সামনের লোকটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। মনে হয় যেন পিঠে হাতুড়ির পিটুনি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। লোকটি সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু টাল রাখতে না পেরে আবার পড়ে যায় এবং কাদায় ডুবে যায়। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুটে আসছে কাদার মধ্যে। জলকাদা ছিটকে উঠছে। অবাক হয়ে দেখছি এই দৃশ্য। এ দৃশ্য আমার চেনা। নরকের অভিজ্ঞতা আগেও একবার হয়েছে।

কোমর অবধি কাদায় ডেবে কয়েকশো লোক খাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই পেনসিলভানিয়ার ব্রিগেডের লোক। যে করেই হোক তারা সেখানে জড়ো হয়েছে। ফৌজদাররা তাদের তাড়িয়ে খানিকটা শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা করে।

আমরা দুজনেও তাদের দিকে এগিয়ে যাই। মিশে যাই তাদের ভীড়ে। চার পাশে লোকজনের ভীড়। তাদের গুলি চালাতে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করি।

আমাদের চোখের সামনেই বহুলোক হন্তে হয়ে পালাচ্ছে। আমরা যেন দর্শক আর ওই ভীতিবিহ্বল পলায়নপর জনতা যেন মঞ্চের অভিনেতা। এক পা দু'পা করে আমরা খাদ ধরে পেছু হটছি আর ফৌজদাররা চেঁচিয়ে বলছে, গুলি ভর…গুলির পাত্র মুছে নাও…চকমকি সাফ কর…আস্তে-সুস্থে গুলি ভরে বন্দুক চালাও…

আমার বন্দুকটা গাদাই। অকস্মাৎ শান্ত হয়ে পড়ি। মনের প্রচণ্ড আগুন যেন দপ করে নিভে যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবি, একটু আগে কেন পালিয়েছি? কিসের ভয়? এমন কি আছে যা আমায় ভয় দিতে পারে? আর কিসে আঘাত দিতে পারে? আর কিসেই বা ব্যথা দিতে পারে? মৃত্যু তো চির-বিশ্রাম। আমার আর জীবনে কোন বিশ্রাম নেই। এই নারকীয় উত্তাপ সত্বেও আমার ভেতরটা বরফের মত ঠাণ্ডা।

এলি বলে, জেকব মারা গেছে। এমন ছাড়া ছাড়া ভাবে সে কথাটা বলে যেন ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে পারেনি।

হাঁ, সে মারা গেছে! আমি গাঢ়কণ্ঠে বলি। এই সবের মধ্যে তার মত লোকের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মরে যাওয়াই তার ধর্ম।

ভগবান তাকে শান্তি দিন।

এখন সে শান্তিতেই আছে।

সযত্নে আমি গুলি ভরি। আমার মনের এই আকস্মিক শান্তিও ভীতিজনক। প্যারেডের সময় যে-ভাবে গুলি ভরেছি, এখনও সেই ভাবেই ভরছি। তখনও খাদের মধ্য দিয়ে ঘেঁষাঘেষি করে চলেছি আমরা। কতজন হব জানিনা। তা তিন চারশোর কম নয়। মুলার রয়েছে সঙ্গে। আর দুজন ফৌজদারও আছে। অবিচলিত ভাবে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুলার। লোকটার সাহস আছে।

ব্রিটিশরা তখন খাদ পার হবার চেষ্টা করে। কিন্তু পাশ থেকে গুলি করে আমরা তাদের তচনচ করে দিই। চোখের সামনে দেখছি, কাদামাখা লালকোট পড়ে যাচ্ছে এবং খানিকটা দাপাদাপি করে বুকে হেঁটে উঠবার চেষ্টা করছে। খাদটি ধোঁয়ায় ভরে যায় আর মানুষগুলো ভূতের মত তার মধ্যে চলাফেরা করে। ওপার থেকে ব্রিটিশরা আমাদের লক্ষ্য করে চোরা গুলি ছাড়ছে। কিন্তু সে-গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এখানে সেখানে দু'চারটি লোক আর্তনাদ করে কাদার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে…দাপাদাপি করে মাথা তুলবার আগ্রহে… আপ্রাণ চেষ্টা করে শ্বাস রোধী কাদা থেকে মুখ তুলবার।

যন্ত্র চালিতের মত আমি গুলি ভরে যাচ্ছি। হুঁশিয়ার হয়ে তাক করছি। লক্ষ্য খুঁজছি ধোঁয়ার মধ্যে। দেখছি কোথাও একটা লাল কি সবজে উর্দি পাওয়া যায় কিনা। আমাদের পল্টনের কথা ভেবে অবাক হচ্ছি। তারা কি আমাদের ছেড়ে গেছে নাকি? ভুলে গেছে আমাদের কথা? না পথ হারিয়েছে? যুদ্ধের শব্দও কি তাদের কানে যায় না? ওয়েনই বা কোথায়? লা ফায়েত, চার্লস লী—এরাই বা কোথায় গেল? স্টুবেন…গোলন্দাজ দল… তারাই বা কোথায়? হাজার হাজার গণফৌজই বা কোথায় এখন?

নিজেদের হঠকারিতার ফল কি হচ্ছে তা স্বচক্ষে দেখা ওয়েন বা লা ফায়েতের পক্ষে অসম্ভব। শত হলেও সৈনিকরা মানুষ তো! মানুষ এমন জানোয়ার হতে পারে না যে কোন ভয়-ভীতি বা বাধ্য বাধকতা ছাড়া পরস্পরকে খুন করবে। ফোর্জ উপত্যকা আমাদের কি সর্বনাশ যে করেছে, স্বচক্ষে তা দেখতে পারবেন না বলেই কি তারা সরে পড়েছেন?

লড়াই করতে করতে আমরা খাদ ধরে হটে আসি। সময় অর্থহীন হয়ে পড়ে। কতক্ষণ হেঁটেছি কারও খেয়াল নেই। মনে হয় যেন

অনন্তকাল আঠালো কাদার মধ্য থেকে এক পা টেনে তুলছি আবার সেই পা ফেলছি ; আর মাস্কেট তেতে আগুন না হওয়া অবধি গুলি ভরছি। এত গরম অসহ্য। গা-পোড়ান হিংস্রুটে গরম যেন প্রাচীরের মত আমাদের ঘিরে রেখেছে। উত্তাপ যেন আকার পেয়েছে।

চোরা-গুলির বিরাম নেই। মাছির মত ব্রিটিশরা আমাদের পেছনে লেগে থাকে। কাদার মধ্যে গুলি লেগে পটপট আওয়াজ হয়। আমার সামান্য কয়েক ফুট দূরে মুলারের গায়ে গুলি লাগে। এলি এগিয়ে গিয়ে তাকে তুলবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে ঝাঁকানি দিয়ে হাত ছড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে, আমি মরতে চলেছি—দেখছ না ? তুলছ কি করতে ?

আস্তে সে কাদায় ডুবে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এর বরাতেও কবর জুটবে না। কোন প্রস্তর ফলক বা কাঠ দিয়ে তৈরী ক্রুশও এর শেষ শয্যা চিহ্নিত করবে না। জীবিতকালে ভাল থাক কি মন্দ থাক, আর দশজনের মত তার গুণগান করে কোন কবিতাও রচিত হবে না। কোন চিহ্নই থাকবে না লোকটার। আর কিছুদিন পরে লোকের মন থেকেও তার স্মৃতি লোপ পাবে। একাকীই যেতে হল মুলারকে।

উদ্দেশ্যহীন অদ্ভুত প্রেরণা অনেক সময় মানুষকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। অনেকটা সেই রকম প্রভাবেই মরিয়া হয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। খাদের শেষ কিনারে এসে আমরা শক্ত মাটির দিকে রওনা হই। এখানে গুলির উৎপাত কম। কিছু লোক লক্ষ্যহীনের মত ঘুরে বেড়ায়। আমি তাদের ডাকি। নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই অবাক হয়ে যাই। তখন এদের তাড়িয়ে আমি একটা লাইন গড়ে তুলি। বিনা আপত্তিতে আমার হুকুম শোনে। এলি বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকায়। তাকে বলি, এদের একসাথে রাখ। দেখছ না, একসাথে থাকা ছাড়া উপায় নেই !

ছাড়া ছাড়া ভাবে সে মাথা নাড়ে। একটা বেড়ার পাশ ঘেঁষে আমি তাদের লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাই। যুদ্ধের কোলাহল আমাদের ডাইনে। বেশ কিছুটা দূরে। বিরাট শব্দ কখনও কখনও কমছে আবার কখনও বাড়ছে। কখনও কাছে এগিয়ে আসছে আবার কখনও বা দূরে সরে যাচ্ছে। এই কোলাহল কলরোলের মাঝে মাঝে গর্জে উঠছে তোপের আওয়াজ। ক্রুদ্ধ পশুর গর্জনের মত তোপদাগার স্পষ্ট শব্দে কানে তালা লাগে।

এখানে বেশ গরম। খাদের চাইতে অনেক বেশী গরম। রোদ থেকে অব্যাহতি পাবার মত কোন ছায়া নেই। সূর্যও যেন শত্রুর দলে ভীড়েছে। অনুসঙ্গী লোকজনের দিকে ফিরে তাকালাম। শ'কয়েক তাপদগ্ধ নোংরা দিগবিদিকহীন ক্লান্ত লোক। অবাক হয়ে ভাবি, আমি কেন পরিচালনা করছি এদের? ব্রিগেডের কমাণ্ডাররা কোথায়? মুলারকে পড়ে যেতে দেখেছি—সে মারা গেছে! কিন্তু আর সবাই গেল কোথায়? তাদের তো থাকা উচিত। চারদিক চেয়ে তাদের খুঁজি। এলিকে জিজ্ঞাসা করি, ক্যাপ্টেন ডীন—মার্সি কোথায়?

এলি মাথা ঝাঁকায়।

গেইন ব্রো?

আবারও মাথা ঝাঁকায় সে।

আমাদের সামনে ফলের বাগান। পুরানো একটা গোলাবাড়ী আর আপেলের বাগান। কিছু লোকজন আছে সেখানে। আমাদেরই মত অর্ধনগ্ন বেশ কয়েকশো লোক। উবু হয়ে বন্দুকে তাক করে আছে।

রোড দ্বীপের লোক। এলি বলে।

আক্রমণের প্রতীক্ষা করছে। মনে মনে ভাবি।—ঐ ভাবে অপেক্ষা করছে। জানেনা আক্রমণ কি জিনিস, তাই অপেক্ষা করছে।

কাদা ও রক্তমাখা একটি লোক ঘোড়ায় চড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। আমি পেছনের লোকজনকে থামতে বলি। অবাক হয়ে তারা আমার দিকে চেয়ে থাকে হাঁ করে। মুখ দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলে।

আমি চেঁচিয়ে বলি, এই, বসে পড়না। বসে জিরিয়ে নাও। কথা বার্তা বল না। এখনও মরে যাওনি তো।

লোকটি ঘোড়া থেকে নামে। কাদার মধ্যেও ওয়েনকে চিনতে পারি। তিনি বলেন, এরা কারা? তুমি কে?

চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়া স্যর। তার যা আছে তাই। ওরাও পেনসিলভানিয়ার লোক, তাই না?

কি করে এখানে এলে?

পেছু হটার পর আমরা খাদ বরাবর লড়াই করে সরে গেছি। ঐ বনের মধ্য দিয়ে এদিকে এলাম।

তোমাদের ফৌজদাররা কোথায়?

মারা গেছে।

কে তোমাদের পরিচালনা করেছে?

তারা মারা যাবার পর? আমিই করেছি স্যর। পরিচালনার তেমন দরকারও ছিল না।

অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ওয়েন মাথা নাড়েন। ভাঙা-ভাঙা গলায় বলেন, তোমরা আমার লোক—সবাই আমার লোক। একলাই তোমরা লড়াই করে সরে এসেছ! হা খ্রীস্ট! আমি পলায়নপর একটি দলের সঙ্গে ভেগে যাই আর তোমরা আমাদের পাশ থেকে রক্ষা করেছ। তোমাদের ফৌজদাররা কোথায় স্যর? শিগগির বল!

তারা মারা গেছে।

তোমার নাম কি?

আলেন হেল।

বেশ বুঝছি, তিনি স্মৃতির ভাণ্ড খুঁজছেন। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন ওয়েন। বারে বারে চোখ রগড়াচ্ছেন। দুই হাতেই রক্তমাখা। বার কয়েক তিনি মাথা ঝাঁকান।—আলেন হেল···খুনের দায়ে তোমার বিচার হয়েছিল···

হাঁ স্যর!

জানি! ফিসফিস করে তিনি বলেন। তারপর আমার পেছনে দাঁড়ান লোকজনের দিকে চেয়ে বলেন, ব্রিগেডের ভার নাও।

ব্রিগেডের ভার আমি চাই না স্যর।

দুত্তোর ছাই, ভাবছ কি তোমার কাছ থেকে আমি ফৌজদারের কাজ চাইছি? শুধু বলেছি, এই ব্রিগেডের ভার নাও। আমি তোমায় ক্যাপ্টেন করে দিলাম। তুমি এদের পরিচালনা করবে। না হয় ভগবানের নামে হলপ করে বলছি, যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেইখানেই গুলি করে মারব।

আমি তার দিকে তাকালাম। পলকের জন্য তার রক্তচক্ষু দেখে নিলাম। তারপর ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম। বল্লাম, আমি এদের পরিচালনা করব স্যর। দরকার হয়তো নরকে নিয়ে যাব।

গাঢ়কণ্ঠে তিনি বলেন, দরকার হয়তো নরকে নিয়ে যাবে! একটু থেমে বলেন, বাগানের কিনারে ওই পাথুরে দেয়ালটার পেছনে এদের নিয়ে যাও। প্রস্তুত হয়ে থেক। ওরা তোমাকে ক্যাপ্টেন হেল বলে ডাকবে, আর তুমি ওদের পরিচালনা করবে। যতক্ষণ একটি লোকও বেঁচে থাকবে, যে-কোন আক্রমণ রুখবার জন্য প্রস্তুত থেক।

আচ্ছা স্যর।

তখন তিনি হাত বাড়িয়ে দেন। আমি হাতে হাত দিলাম। একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম তার নিষ্প্রভ নীল চোখের দিকে। পলকের জন্য

আমার দিকে চেয়ে তিনি পেছন ঘুরলেন এবং চটপট ঘোড়ার কাছে গেলেন।

আমি সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলাম। ওয়েনের কথা তারা শুনেছে। অবাক হয়ে নিরীক্ষণ করেছে আমাকে। এলি আমার দিক থেকে চোখ সরায়নি। তার মুখের চেহারা স্বপ্নাবিষ্ট মানুষের মত। কে জানত সে স্বপ্ন দেখছে এবং এ স্বপ্ন তার কোনদিনই ভাঙবে না। আমি তখন শান্তভাবে বলি, ব্রিগেডের কায়দায় তোমাদের দাঁড়াতে হবে। আমি তোমাদের ফৌজদার। এখন থেকে আমায় ক্যাপ্টেন বলে ডাকবে।

কেউ জবাব করে না। জনকয়েক মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

ব্রিগেড—এটেনশন্! চারজন করে সার বেঁধে দাঁড়াও!

লোকজন তখন উঠে পড়ে এবং ক্লান্তভাবে বন্দুক টেনে নিয়ে কোনমতে সার বেঁধে দাঁড়ায়। আমি তাদের মার্চ করিয়ে পাথুরে দেয়ালের কাছে নিয়ে যাই এবং দেয়ালের পেছনে প্রত্যেককে নিজের নিজের জায়গা দেখিয়ে দিই।

বন্দুকে গুলি ভরে রাখ। গুলির জবাবে গুলি করবার জন্ম তৈরী থাকতে হবে। গুলি করবার আদেশ আমি দেব।

এলির কাছে গিয়ে আমি দেয়ালের পর বসে পড়ি। পাথরও তেতে গেছে। সূর্য যেন আগুনের বড়ি ঢেলে দিচ্ছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে গা বেয়ে। ময়লা মাথা দেহে আঁকাবাঁকা রেখা পড়ছে। চোখ তুলে আমি লড়াইর ময়দানের দিকে তাকাই। আমাদের মূল বাহিনী এখনও পেছনে পড়ে আছে। তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে আগে আমাদের ঘায়েল করতে হবে। এই সব কথা মনে হচ্ছে। কিন্তু তবু চিন্তার সঙ্গে আমার যেন কোন যোগাযোগ নেই। অন্তরে নিষ্প্রাণ শূন্যতা। আর সেই শূন্যতা থেকেই যেন চিন্তা উঠছে।

এলি বলে, তাহলে এইবার তোমায় ক্যাপ্টেন করে দিল আলেন।

হাঁ, ক্যাপ্টেন বানিয়েছে বটে !

আমার মধ্যে কোন আবেগ নেই। তবু কান্না আসে—চোখ দিয়ে জল পড়ে। জিভে চোখের নোনা জলের স্বাদ অনুভব করি।

—চব্বিশ—

অপেক্ষা করছি। সকাল কেটে যায়। হয়ত কোন সময় আক্রমণ আসবে। না হয় কোনকালেই আসবে না। আমাদের পেছনে ওয়েনরক নদীর ওপারে জেনারেল গ্রীন মূল বাহিনী জমায়েত করছেন। কিন্তু তারা প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের রুখতে হবে। আঘাত করে ইংরেজরা যতক্ষণ ক্লান্ত হয়ে না পড়বে ততক্ষণ রুখতে হবে আমাদের। ক্লান্ত ব্রিটিশ বাহিনীকে আমরা পথ ছেড়ে দিতে পারি। ততক্ষণে মহাদেশীয় বাহিনী প্রস্তুত হয়ে তাদের পরাজিত করতে পারবে। বেড়া এবং পাথুরে দেয়ালের পেছনে সামান্য কিছু লোক আছি। সারা সকাল যুদ্ধ করতে হয়েছে আমাদের। আর কি নারকীয় সে যুদ্ধ! গা নিঙড়ে ঘাম বেরিয়েছে। মাংসহীন অস্থিসার অর্ধনগ্ন সৈনিক আমরা। ক্লান্তিতে মৃতপ্রায়। তিন তিনটি ব্রিগেড মিলিয়ে একটি হয়েছি। ভগবান জানেন, আজকে বরাতে কি আছে?

পাথুরে দেয়ালের পেছনে গা-পোড়ান রোদের মধ্যেই আমরা শুয়ে পড়ি। ছায়ার আশায় লোকজন দেয়ালের গা-ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে থাকে। এক ফোঁটা ছায়া নেই কোথাও। সূর্য ঠিক মাথার উপরে। কেউ কেউ নদীতে গিয়ে জল খেয়ে আসবার অনুমতি চায়। মাস্কেট উঁচিয়ে বলি, দেয়ালের পাশ থেকে যে নড়বে তাকে গুলি করব। তবু অবাক হয়ে যাই, কে বলছে এসব কথা? কে

আসেন হেল ? এলি ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকায়। কিন্তু সে কি আর কিছু প্রত্যাশা করেছিল ? একি সে জানত না ? নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে এই জন্যই কি আমাকে গড়ে তোলে নি ? আজ জেকব নেই। পয়লা চোটেই মাথায় একটা রক্তমাখা গোল ফুটো নিয়ে মারা গেছে। এখন আছি শুধু দুজন—এলি আর আমি। আমার জীবনে কোন বিশ্রাম নেই।

যুদ্ধ ক্রমে আমাদের দিকে গড়িয়ে আসে। একদৃষ্টে আমরা লাল কোটের দীর্ঘ লাইন এবং সবজে উর্দি-পরা হোসিয়ানদের দিকে চেয়ে থাকি। খেলা দেখছি যেন।

এক দুই করে আমি কামানের গোলা গুনি। রণক্ষেত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করি। কোন সময় স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছি না। ঘুমোবার আগেকার মত একটা ঝিমু ঝিমু ভাব দেখা দেয়। সৈনিকদের লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে তাদের বন্দুক পরীক্ষা করে দেখি, বারুদের পাত্র পরীক্ষা করি এবং চকমকিতে ভিজা হাত দিতে নিষেধ করি। জোরে জোরে কথা বলছি; কিন্তু নিজের কথার ধরণ শুনে নিজেই অবাক হয়ে যাই।

চকমকি নাড়াচাড়া কর না। মাস্কেটগুলো রোদে দাও। বারুদটাও রোদে শুকিয়ে নাও। ঠাণ্ডা বারুদের চাইতে তাতান বারুদ অনেক ভাল। গাদন কাঠি ঢিলে কর...গাদন কাঠি ঢিলে কর।

এলি আমাকে লক্ষ্য করছে। সব সময় চেয়ে আছে আমার দিকে। পলকের জন্যও তার চোখ অন্য দিকে ফেরেনি। এক একবার মনে হয় যে তাকে বলি, বুঝতে পারছ না কেন ? দোহাই খ্রীস্টের, তুমিই যদি না বোঝ তো কে আর বুঝবে ? জেকবের মত, ওয়াশিংটনের মত আমাকেও কি নিঃসঙ্গ হতে হবে ? আমাকেও কি তাদের মত নিঃসঙ্গতার জন্য আক্ষেপ করতে হবে ? মানুষের সম্পর্কে পাছে উন্মাদনা

কমে যায় এই শঙ্কায় আমাকেও কি লোকজন দূরে সরিয়ে রাখতে হবে? একলা তুমিই আছ—আর কেউই বেঁচে নেই। জেকবও মরে গেছে। আজকের আমি তোমারই পরিকল্পনার ফল।

মনে মনে ভাবলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না। মনে হয় আর কোনদিনই হয়ত এলির কাছে মন খোলা যাবে না। এলিকে আমি ছেড়ে এসেছি। পেছনে ফেলে এসেছি তাকে। আর কোন দিনই এলির কাছে ফিরে যাওয়া যাবে না। আজকে সকালে প্রাণ-প্রিয় পেনসিলভানিয়ানদের এক পাল ভীত হরিণের মত ছিন্নভিন্ন হতে দেখে ওয়েনের মনের যে অবস্থা হয়েছিল—যে চোখে তখন তিনি আমাদের দেখেছেন, আমিও তেমনি চোখে এখন চিনতে পারছি ওয়েনকে। ওয়াশিংটনকেও বুঝতে পারছি। এর মধ্যে কোন আনন্দ নেই—নেই কোন গৌরব। বরফের মত শীতল আমার অন্তর শূন্য।

ইংরেজরা আক্রমণ করে। রয়েল ফুজিলিয়াস´ দলের লোক তারা। বাছাই সৈন্যদল। ইংলণ্ডের অভিজাত পরিবারের সন্তান। দুনিয়ার সেরা সৈনিক। ভয় ডর নেই।

এ কথা তখন জানতাম না। দেখছি, পথ থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেবার জন্য একদল ইংরেজ সৈনিক এগিয়ে আসছে। মূল সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অকুতোভয়ে বীরের মত এগিয়ে আসে। সেলাম করবার ভঙ্গীতে মাস্কেট ধরে তারা মার্চ করে আসছে। চলবার ভঙ্গী অনেকটা প্যারেডের মাঠে মার্চ করার মত। এ রকম মার্চ আমি জীবনে দেখিনি। যে ভাবে মার্চ করা শেখাবার জন্য স্টুবেন এতদিন ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন, এখন তার নিখুঁত ছবি দেখছি। কিন্তু আমরা তো সৈনিক নই। ও রকম মার্চ করা কোনদিনই আমরা শিখতে পারব না। চাষী আমরা। মানুষ নামে পরিচিত উলঙ্গ নোংরা জীব। বারবার মনে মনে কথাটা আলোচনা করি। ভাল লাগা একটি গান

যে ভাবে পাই, ঠিক তেমনি ভাবে বারবার মনে মনে বলি: আমরা সৈনিক নই—আমরা সৈনিক নই। ওদের মত কোন দিন মার্চ করতে শিখব না। আমরা চাষী। স্বাধীন মানুষ আমরা। ভয়-ভীতি ঘৃণা দুঃখ সবই জানি। মানুষের মতই দুর্বল। নিজেরটার জন্তই শুধু লড়তে পারি—আর কিছুর জন্য নয়।

আমাদের লোকজন অবাক হয়ে ইংরেজ সৈন্যদলের দিকে চেয়ে থাকে। এ দৃশ্য তাদের মুগ্ধ করে—আকর্ষণ করে। এ দৃশ্য অবাস্তব প্রাণহীন। জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। জীবনের অংশ আমরা। জীবনের সঙ্গে যে সব জিনিসের সম্পর্ক আছে, আমরা শুধু তা-ই চিনি। আমাদের বন্দুকের সামনে ভেরী ও বাঁশী বাজিয়ে এই যে সৈন্যদল নিখুঁত ভাবে মার্চ করে আসছে, এর সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। বাজনার সুরটিও ধরতে পারি। 'হট স্টাফ' গানের গৎ বাজাচ্ছে। এই গৎ বাজিয়েই ঝাঙ্কার পাহাড়ে এগিয়েছিল।

আমি নিজে সব মোহ, সব ভ্রান্তি ঝেড়ে ফেলি। এত বরফ আমার অন্তরে জমে আছে যে সব মোহ ধ্বংস হয়ে যায়। ভিন্ন জগতের মানুষ এরা—এদের ধ্বংস করতে হবে। এদের ধ্বংস করবার মত সঞ্চিত বরফ আমাদের অন্তরে আছে। সৈন্যদলের পাশ দিয়ে হাঁটাহাটি করে শান্তভাবে বলি, কেউ আগে গুলি কর না। আমার হুকুম না পেয়ে কেউ গুলি করবে না। যে দল ছেড়ে পালাবে তাকেই খুন করব। মাথা নীচু কর। দেখতে না পায় এমন ভাবে ঘাপটি মেরে থাক। মাথা তুলে দেখ না।

চাষীর ঘরের একটি ছেলে, নেহাৎ নাবালক, উঠে দাঁড়িয়ে হাঁ-করে চেয়ে থাকে। ঠাস করে তার গালে এক চড় মারি।

বসে পড়! দেয়ালের আড়ালে থাক। ওভাবে দেখে না। দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাক।

ওয়েন আমাদের পেছনে। ঘোড়ার পিঠে বসে মৃদু হাসছেন। ও লোকটার প্রাণও যেন বরফ দিয়ে গড়া—পুরোপুরি বরফে তৈরী। তিনি আমার দিকে কাত হন। কিন্তু তার প্রশংসা আমি চাই না। আমি তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াই। দেয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে ইংরেজদের হালচাল লক্ষ্য করি।

তারা আমাদের খুবই কাছে এসে পড়ে। প্যারেড করবার সময় যে-ভাবে বন্দুক থাকে এখনও সেই ভাবেই ধরে আছে। এ যেন ঝকঝকে ক্ষুরধার ইস্পাতের ফসল। লাইনটির এক প্রান্তে একটি ভেরী বাজিয়ে হাঁটছে। টুপিটা মাথার পেছনে ঠেলে নিয়েছে লোকটি। মাথা নড়ছে বাজনার তালে তালে। লোকটির কাঁধে একটি উঁচু ইংরেজী ভেরী। ভেরীটির উপরে-নীচে সোনার ব্যাণ্ড লাগানো। পাশে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতীক রাজমুকুট আর সিংহ। ভেরী বাজিয়েটির মুখে প্রসন্ন হাসি। কাঠি দিয়ে বাজাবার সময় লাফিয়ে চলছে।

খোলা তরোয়াল হাতে অফিসাররা সামনে চলছে। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তারা সৈনিকদের দেখছে। যেন প্যারেডের মাঠে সৈন্যদল পরিদর্শন করছে।

একদল চাষীকে হটাবার জন্য নির্ভীক তরুণ ইংরেজ সন্তান নিয়ে গড়া এই রেজিমেণ্টটির হঠকারিতা দেখতে দেখতে পলকের জন্য মনে হয়, লড়াইর বুঝি সাময়িক বিরতি হয়েছে।

মনে মনে বলি, এই তো ইংলণ্ড—এই তো ইয়োরোপ। এর বিরুদ্ধেই তো আমাদের সংগ্রাম। মানুষের প্রতি চরম অবজ্ঞা··· জীবনের প্রতি চরম তাচ্ছিল্য···মানুষের আত্মার প্রতি ঘৃণা···মানুষের বাঁচবার অধিকার, সাধারণ জিনিস জানবার ও তাই নিয়ে সুখী হবার দাবী এবং তার দাসত্বমোচনের আকাঙ্খার প্রতি এই কুৎসিৎ অবজ্ঞার বিরুদ্ধেই তো আমাদের আসল সংগ্রাম! আবারও বলি, অনন্তকাল ধরে

এর বিরুদ্ধেই তো অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হবে। এ যুদ্ধ চলবে! বিশ্রামের কোন অবসর নেই। আমরাই জীবনের প্রতীক। উলঙ্গ নোংরা অনশনক্লিষ্ট চাষীরাই জীবন। আর ওই ওখানে প্রাচীরের ওধারে যারা রয়েছে, জীবনকে উপহাস করছে তারা। মনে মনে বার বার কথাটা আওড়াই।

এতক্ষণে আমাদের খুবই কাছে এসেছে ওরা। নাবালকত্ব বেশীদিন ঘোচেনি কারও। ঘাড় বাঁকিয়ে পরস্পর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে হাসতে হাসতে এগোচ্ছে বালকের দল। দাঁত বার করে উন্নত শিরে এগোচ্ছে। গোঁফ দাড়ি কামানো ছিমছাম মুখে অবজ্ঞার হাসি। সে হাসি উপহাস করছে মৃত্যুকে—উপহাস করছে জীবনকে। জীবন শেষ হয়ে গেছে। হারানো জীবনের সঙ্গে ভয়ডরও গেছে। দুঃখু সয়ে বেঁচে থাকবার ক্ষমতা এদের লোপ পেয়েছে। অতীতের মানুষ এরা। জাঁকজমকের বাহার আছে বটে, কিন্তু সে জাঁকজমক আমাকে স্পর্শ করে না। আমার কি এসে যায় তাতে? পুরো একটা শীতকাল নরকে কাটিয়েছি···দলে দলে মানুষ মরতে দেখেছি···মরতে দেখেছি অন্তরঙ্গদের। আমাকে বাঁচাবার জন্য কেনটন ব্রেন্নার অপমানকর মৃত্যুবরণ করেছে। মরেছে চার্লি গ্রীন। পাঁচ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে যে ইহুদিটি এসেছিল, একদিন মানুষ স্বাধীন হবে—এই স্বপ্ন নিয়ে সেই আরন লেভিও মরেছে। একটি মাত্র আদর্শ বহ্নিশিখার মত যার জীবনে জ্বলেছে, আত্মত্যাগী সেই জেকব ইগেনও প্রাণ দিয়েছে। কৃষক এডওয়ার্ড ফ্লাগ ভেগেছিল কেননা অন্য একটা কিছুর পর তার আস্থা ছিল। ফুজিলিয়ার্সদের উপর করুণা হওয়া উচিত। কিন্তু আমার অন্তরে কোন করুণা নেই। কি করে করুণা করব? ফোর্জ উপত্যকার কাঠের হাসপাতালে গিয়ে আমি হাজার খানেক মানুষকে নরকে পচে মরতে দেখেছি। মরবার আগেই তারা নরকে বাস করেছে। দেখেছি অনামী লাশ বরফের পর পাঁজা

করা রয়েছে। কারণ মাটি লোহার মত শক্ত। তাদের দেহ বাঘের খাবার জুগিয়েছে। হাসি মুখে এরা মরেনি। জীবনকে ভালবেসে মরতে হয়েছে। বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টায় মরেছে। জীবনকে যারা ভালবাসে, মানুষের জীবনের মর্যাদা যারা দেয়—স্বাধীন সুন্দর জীবনকে যারা ভগবানের দুনিয়ায় একমাত্র পবিত্র জিনিস বলে মনে করে তাদের সমরক্ত এরা। জীবনের জন্য চোখের জল ফেলে মরেছে। হেলায় জীবন বিসর্জন দেয়নি।

আগুয়ান ফৌজদারদের মধ্যে একজন সহসা পেছন ফিরে চীৎকার করে হুকুম দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সব কটি সঙিন চট করে আমাদের দিকে উদ্যত হয়। পরিহাসরত ছেলের দল তখন ছুটতে শুরু করে।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও চেঁচিয়ে উঠি, এইবার—এইবার—ব্যাটাদের জাহান্নমে পাঠাও।

পেনসিলভানিয়ার কাদামাখা উলঙ্গ চাষীরা উঠে দাঁড়ায়। তাদের মোটা ফুটোর মাস্কেট আগুন বমি করে। আগুনের হলকায় বেড়া ও দেয়াল ঝলসে ওঠে। গুলির দুমদাম আওয়াজের সঙ্গে মানুষের আর্ত চীৎকার মিশে যায়। রয়াল ফুজিলিয়ার্সদের লাল লাইন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাদের পরিহাসউচ্ছল কণ্ঠে ফুটে বেরোয় মৃত্যু-যন্ত্রণার কাতর আর্তনাদ। মুমূর্ষুর আর্ত-চীৎকার সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে। পেট চেপে ধরে তারা রক্ত বমি করে। টলতে টলতে পালাতে চায়। ইংরেজদের লাইন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ক্রমেই তারা পেছু হটে। ধোঁয়ার মধ্যে ছুটাছুটি করে ছত্রভঙ্গ অস্পষ্ট মানুষের কায়া। আবার কেউ কেউ হামাগুড়ি দিয়ে দেয়াল অবধি এগিয়ে আসে। কিন্তু মাস্কেটের কুঁদোর বাড়িতে পেনসিলভানিয়ার চাষীরা তাদের মাথা চৌচির করে দেয়

আমি তার স্বরে চেঁচিয়ে বলি, গুলি ভর—আবার ভর। দেয়ালের

পেছনে থেকে গুলি ভর। দেয়ালের আড়ালে থাক! চটপট আবার গুলি ভর। চকমকি শুকনো রেখ।

দূর থেকে ভেসে-আসা কথার মত ওয়েনের কণ্ঠস্বর কানে আসে, আবার গুলি ভর—চটপট গুলি করবার জন্য তৈরী হও!

ধোঁয়া উড়ে যায়। সঙ্গীদের ছিন্নভিন্ন দেহের ধ্বংসস্তূপের খানিকটা পেছনে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ইংরেজসেনা। ফৌজদাররা আবার তাদের সার বেঁধে দাঁড় করায়। ভেরীটায় আধখানা ভেঙে গেলেও ভেরী বাজিয়েটি আবার ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ করে এক পক্কর বাজায়। এদের সাহসিকতা যুক্তির বাইরে—জীবনের অতীত। অবিচলভাবে তারা সার বেঁধে দাঁড়ায় এবং আবারও প্যারেড শুরু করে। একটি ফৌজদার আমাদের দিকে হেঁটে এগোয়। পেছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে সে পাথুরে দেয়ালের ত্রিশ গজের মধ্যে এসে পড়ে। ইংরেজদের মত হড়বড় করে সে সঙ্গীদের আহ্বান জানায়। ক্রোধে ও গর্বে তার কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে। আমরা স্পষ্টই তার কথা শুনতে পাই: সদ্বংশের সন্তান কোনদিন পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়?

আবার তারা এগিয়ে আসে। সূর্য হেলে পড়ছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে আমাদের গা বেয়ে। স্পষ্ট দেখছি, কি রকম ঘামাচ্ছে লোকগুলো। তাদের শীর্ণ শুঁটকো দেহে বিন্দুমাত্র জল নেই। তবু ঘামছে।

ধমকে-ধামকে আবার তাদের দেয়ালের আড়ালে নিয়ে আসি।—মুখ তুলে চেয়ো না···চেয়ো না বলছি! কেউ মুখ বার করবে না!

আবার প্যারেড করছে ইংরেজরা। জোর করে হাসছে চলবার সময়। পায়ের ঠোকর মেরে ধুলো উড়োচ্ছে। হাসাহাসি করছে। মহিমময় এরা। কিন্তু আমরা এত মৃত্যু দেখেছি যাকে কোনমতেই মহিমময় বলা যায় না।

ফৌজদারটি সৈন্যদলের সামনে চলে। ক্রমে সে দেয়ালের গজ দশেকের মধ্যে এগিয়ে আসে। তারপর সেইখানে দাঁড়িয়ে তরোয়াল খাড়া করে অবজ্ঞার হাসি হেসে আমার দিকে তাকায়। আমি ওকে ঘৃণা করি না। আমি ঘৃণার অতীত অবস্থায় চলে গেছি এ কথা ভেবে মনে মনে এক বীভৎস বর্বর উল্লাসের চমক অনুভব করি। লোকটি এমন একটি ব্যবস্থার অঙ্গ যাকে ধ্বংস করতেই হবে। আমি শুধু এই কথাই জানি যে তাকেও যেতে হবে। ধ্বংস করতে হবে জীবন ও দুঃখের প্রতি এই অবজ্ঞা। ভেঙে চুরমার করতে হবে ওদের উন্মাদ নির্বোধ সাহস। ওদের শেখাতে হবে যে জীবনের মূল্য আছে—উপহাস অবজ্ঞার জিনিস তা নয়!

আগের বারের মতই তারা এগিয়ে আসে। ত্রিশ পা—বিশ পা—পনেরো পা। তারপর সঙিন বাগিয়ে আমাদের দিকে রুখে এগোয়।

আবার আমি চেঁচিয়ে উঠি, এইবার···এইবার!

চাষীরা উঠে দাঁড়ায় এবং আবারও ফুজিলিয়ার্সদের উপর অগ্নিবর্ষণ করে। আগের বারের মতই তারা ধুপধাপ পড়ে যায়। মৃত্যু যন্ত্রণায় বীভৎস দাপাদাপি চীৎকার করে। এবারে আর পেনসিলভানিয়ানদের বাগ মানান যায় না। কোনদিন যে-দৃশ্য তারা দেখেনি, আজকে তাই দেখতে পেয়েছে। মুখোমুখি সংগ্রামে বৃটিশ রেগুলার সৈন্যদল তাদের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

স্ট্রবেনের শেখান কায়দা এইবার তারা কাজে লাগায়। লাফিয়ে দেয়াল পার হয়ে সঙিন উঁচিয়ে রুখে এগোয় এবং শীতকালের নরকবাসের সমস্ত সঞ্চিত ক্ষোভ নিয়ে উন্মাদের মত ইংরেজদের পর ঝাঁপিয়ে পড়ে···তাদের গায়ে সঙিন বসিয়ে দেয়···কেটে কুচি কুচি করে···ধ্বংস করে। এখন এরাই জীবন্ত নরক। এতদিনের ক্রম-সঞ্চিত অনির্বাণ

ঘৃণা আজ ফেটে পড়েছে। এই লোকগুলোই তাদের শহর কেড়ে নিয়েছে—বরফের মধ্যে তাদের উপবাসে রেখেছে।

আমিও এদের সঙ্গে আছি। জীবন-মৃত্যুর কোন পরোয়া নেই! আমাদের পথ থেকে এদের সরিয়ে দিতে হবে, এদের ধ্বংস করতে হবে—এই একটি মাত্র পণ ছাড়া আর কিছুর কোন মূল্য নেই। আমাদের ধ্বংস করবার জন্য পাঠানো হয়েছে এদের। এরা উপহাস করেছে আমাদের···উপহাস করেছে দেয়ালের পেছনে লুকানো উর্দিহীন গেঁয়ো চাষীর উলঙ্গ নোংরা শীর্ণ এক জনতাকে। এদের উপহাস আমাদের অন্তরে আগুন জ্বালিয়েছে।

পলায়নপর একটি লোকের দেহে আমি সঙিন বসিয়ে দিই এবং সঙ্গে সঙ্গে টেনে বার করে লাফ দিয়ে তাকে পার হয়ে যাই। আমি এখন প্রাণহীন হত্যার যন্ত্রে পরিণত হয়েছি। অন্তরে বরফ। এখন আর আমি মানুষ নই। এতদিনে জেকবকে বুঝতে পেরেছি।

রক্তমাখা বিভীষিকার মত দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছি আমরা। রয়েল ব্রিটিশ ফুজিলিয়ার্সদের সাবাড় করেছি। হাতাহাতি সংগ্রামে ধ্বংস করেছি ইওরোপের বাছাই সৈন্যদল। পাহাড়িয়া মাঠের মধ্যে পড়ে আছে তারা। কেউ মরেছে, কেউ মরছে। আমেরিকার মাটি ভিজে যাচ্ছে ইংলণ্ডের রক্তে। মৃত্যু ও বলির মধ্য থেকে যে আমেরিকা জন্ম নিয়েছে, এই-ই তার আসল রূপ। একই রক্ত আমাদের। তবু ওরা আমাদের কেউ নয়। এক নতুন দুনিয়ার মালিক আমরা। আজকে এইখানে ফুজিলিয়ার্সদের রক্তে আর গোটা শীতকালের নরকবাসের ফলে জন্ম নিয়েছে সে দুনিয়া।

রণক্ষেত্রে বিজয়ীর মত পলকের জন্য আমরা সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি। মাঠের চারদিকে চেয়ে নিজেদের কাণ্ড দেখে নিজেরাই অবাক হয়ে যাই। আমরা সৈনিক নই। হয়ত কথাটা তখন সকলেরই

মনে জাগে যে আমরা সৈনিক নই। শুধু একবারই এই কাণ্ড করে বসেছি। ভুলে যাও। গা এলিয়ে দেবার মত একটা ঠাণ্ডা জায়গা বার করে ঘুমিয়ে পড়। লম্বা ঘুম দিলেই ভুলে যাবে। লম্বা টানা এক ঘুম।

ওয়েন ঘোড়ায় চড়ে আমাদের মধ্যে ছুটছেন আর পেছু হটতে বলছেন। হাঁদার মত তার দিকে চেয়ে থাকি। জনকয়েক যেখানে দাঁড়ান ছিল সেইখানেই পড়ে যায়। তাদের দেহ এত ক্লান্ত যে আর বইতে পারছে না। আমরা ওয়েনের দিকে তাকাই। অনেক কিছুই আমরা করেছি, নয় কি? ওদের রুখেছি তো!

মূল ব্রিটিশ বাহিনী এগোচ্ছে। অবাক হয়ে দেখছি, বিশাল এক জনতা আমাদের দিকে আসছে। অসহায়ের মত মাথা ঝাঁকাই। এই বিরাট বাহিনীর পথে আমরা কয়েকশো মাত্র রয়েছি। লম্বা লম্বা সবজে ও লাল লাইনে এগোচ্ছে তারা। এবারে হেসিয়ানরা সামনে। সঙিন উঁচিয়ে আসছে। এ যেন মাঠভরা সঙিনের ফসল। আমরা পালাবার চেষ্টা করি। ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। লোকজনদের আমাকে অনুসরণ করতে বলি এবং প্রাণপনে ছুটবার চেষ্টা করি। আস্তে পা চলে। যেন স্বপ্নে হাঁটছি। একবার আমি পড়ে যাই এবং পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াই। গুলির শব্দে কানে তালা লাগে। এ অগ্নিবর্ষণের মুখে কিছুই দাঁড়াতে পারে না, কিছুই বাঁচতে পারে না। পাথুরে দেয়াল অবধি পৌঁছুতে যেন অনন্তকাল লাগে। দেয়াল বেয়ে পার হই। পেছন ফিরে দেখি, আদ্ধেক লোক সাবাড় হয়ে গেছে। পেছনে ফুজিলিয়ার্সদের সঙ্গেই পড়ে আছে। গোটা শীতকালের দুঃখ সার্থক হবার মুখে মরছে এরা।

ব্রিটিশ বাহিনীর গুলিবর্ষণ যেন দুনিয়া ঝেঁটিয়ে সাফ করছে... যেন ঝেঁটিয়ে বিদায় করছে জীবনের সব চিহ্ন। আমরা দৌড়োবার

চেষ্টা করি এবং মোড় ঘুরে গুলির পাল্লার বাইরে চলে যাই। নদীর কাছে পৌঁছেই সৈনিকেরা ঝুপঝাপ জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে এবং মাথা ডুবিয়ে থাকে। জল খায় ঢকঢক করে।

নদীর জল আমাদের নতুন জীবন দেয়। জলে পা ডুবিয়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে আমি নদীর স্নিগ্ধ পরশ অনুভব করি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে লোকজনকে এগিয়ে যেতে বলি। আমার অন্তরে বরফ। জলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঠাণ্ডা মেজাজে হুকুম দিচ্ছি। যেন এখনকার মত দুনিয়ার কোথাও কোন পাগলামি নেই। লাইন দিয়ে সৈনিকেরা এগিয়ে যায়। গ্রীনের সৈন্যদল আমাদের সামনে। রক্ষাব্যূহের পেছনে ওৎ পেতে আছে। অপেক্ষা করছে।

একটি লোক নদী থেকে উঠতে চায়না। আমি বলি, চটপট উঠে পড় বোকা কোথাকার!

আমার ভাই পেছনে রয়েছে ক্যাপ্টেন হেল।

সে মারা গেছে। উঠে পড়।

মরেনি। পড়ে যাবার সময় তাকে নড়তে দেখেছি।

বলছি মরে গেছে! উঠে পড় চটপট।

লোকটি এগিয়ে যায়। বার বার মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকায় আর মাথা ঝাঁকে। ওয়েনের ঘোড়াটা নদীর জল ছিটিয়ে আমার পাশ দিয়ে চলে যায়। যুদ্ধের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। পাগলের মত ছুটছেন আর চেঁচামেচি করছেন।

আমি এলির খোঁজ করি। অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে তাকে যেতে দেখিনি তো! মনে হয় পেছনে পড়েছে, এখুনি আসবে হয়ত। কিন্তু পেছন ফিরে শুধু আগুয়ান ব্রিটিশ সেনাদের চোখে পড়ে। মনে মনে বলি, এলি বেঁচে নেই। পেছনে কোথাও হয়ত পড়ে আছে। নিশ্চয়ই বেঁচে নেই!

আমাদের মূল বাহিনীর দিকে হেঁটে এগোবার সময় অসংখ্য হুঁশিয়ারি কানে আসে। তারস্বরে চীৎকার করে সাবধান করছে আমাকে। আক্রমণ আসছে আমারই পেছনে। আমি ভাববার চেষ্টা করি। কান থেকে মুছে ফেলতে চাই গুলির বিকট আওয়াজ। চিন্তা আমাকে করতেই হবে। মনের এই শূন্যতা দূর করে ভাবতে হবে এলির কথা। বুঝতে হবে এলির কি হয়েছে। আজীবন সে আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। আমার প্রসব কালে বাবার সঙ্গে অপেক্ষা করেছে আঁতুর ঘরের বাইরে। মাকে শুনেছে প্রসব ব্যথায় আর্তনাদ করতে। তার কথা না ভেবে পারি? কোথায় গেল এলি? কেন হারালাম তাকে?

এলি মারা গেছে! কিন্তু তার মৃত্যু অর্থহীন লাগছে কেন? ওরা সবাই মরেছে। শুধু আমিই বেঁচে আছি এখনও। একলা আমিই আছি কিন্তু আর সবাই মরেছে।

আমি ছুটতে শুরু করি। বাঁচতেই হবে আমাকে। আমার জীবনে বিশ্রাম নেই।

দৌড়ে আমি মহাদেশীয় বাহিনীর মধ্যে পড়ি। পেনসিলভানিয়ান-দের মধ্যে যারা ফিরেছে তাদের সবাই আছে সেখানে। মাস্কেটে ভর করে এখানে ওখানে ঝিমোচ্ছে। এ ব্যূহ নিউ জার্সির লোক নিয়ে গড়া। সদ্য-আগত নতুন সৈন্যদল অপেক্ষা করছে পয়লা সংগ্রামের জন্য। বেজায় গরম। এত গরম যে কোন চিন্তা মাথায় আসে না। কিন্তু এ উত্তাপেও আমার অন্তরের বরফ গলে না। আমি এখন সৈন্যদলের চালক। তাদের গুলি ভরতে বলা, গুলি করার হুকুম দেওয়া এবং চকমকি শুকনো রাখতে বলাই আমার কাজ। মাথাটা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে, তবু আমাকে চকমকি শুকনো রাখতে বলতে হবে। আবার তাদের ঘুম ভাঙাই। তারা ঘুমোতে চায় কিন্তু আমি তাদের

ঘুমোতে দিতে পারি না। তাড়া দিয়ে আবার লড়াই করতে নিয়ে আসি।

ব্রিটিশরা আক্রমণ শুরু করে। বিরাট তরঙ্গের মত একদল সৈন্য ওয়েনরক নদীতে নামে। কোলাহল ও গুলির আওয়াজে আমার কণ্ঠস্বর তলিয়ে যায়। হেসিয়ানরা নদীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং নদীর মধ্যেই সাবাড় হয়। আমেরিকানদের ব্যূহ আগুনের প্রাচীরের মত। হাজার হাজার লোক একসাথে গুলি করছে। শব্দ আর আগুন মিলে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করে। আমার মাথাটা দপদপ করে। যন্ত্রণায় ফেটে যেতে চায়। নদীর জল রক্তে লাল হয়ে যায়। গুলি বিদ্ধ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে ইংরেজ ফৌজদাররা মাটিতে গড়াগড়ি খায়। আক্রমণের বেগ কমে আসে। পেছু হটে আক্রমণকারী। ছররা গোলায় তাদের সম্মুখ ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। নদী লাল হয়ে ওঠে। লালে লাল হয়ে যায় গোটা দুনিয়া। গোটা পৃথিবীর বুকে লাল রঙ লেপে দিবাকরও হেলে পড়ে। পেনসিলভানিয়ানরা ঘুমোচ্ছে বন্দুকের পর উবু হয়ে। তারা আর এখন যুদ্ধে কোন অংশ নিচ্ছে না। বিকট শব্দেও তাদের ঘুম ভাঙছে না। লম্বা টানা ঘুমে অচেতন ক্লান্ত পেনসিলভানিয়ানরা।

দীর্ঘ ঘুম মানে বিস্মৃতি। এলির কথা ভুলতে হলে ঘুম চাই। সে মারা গেছে। বেশ সঙ্গী পেয়েছে এখন। মস্ত বড় দল। সবাই ঘুমোচ্ছে শান্তিতে। কোন শব্দ তাদের ঘুম ভাঙাবে না। দুনিয়ায় এমন কোন শব্দ হতে পারে না, যা তাদের ঘুম ভাঙাতে পারে। শীত-গ্রীষ্মের অতীত ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট-মুক্ত কামনাহীন গভীর প্রশান্তি আর গভীরতম নিদ্রা। এলির হৃদয়ের মতই মিঠে এ বিশ্রাম। মহান অপূর্ব তার হৃদয়।

মানুষেরই হৃদয় আছে। পবিত্র মানুষের প্রাণ—পবিত্র তার দেহ।

ভগবানের প্রতিমূর্তি মানুষ। তাঁর পবিত্র আলেখ্য প্রতিফলিত মানুষের মধ্যে।

রণক্ষেত্রে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস। মানুষের খুনে নদীর জল লাল হয়ে গেছে।

ব্রিটিশরা পেছু হটে যায়। পেছু হটা ছত্রভঙ্গ পলায়নে পরিণত হয়। ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল পালাচ্ছে মাঠ দিয়ে। প্রথম গুলিবর্ষণের চোট হেসিয়ানদের উপর দিয়েই গেছে। এখন আর তারা ভারী উর্দির নব্বই পাউণ্ড ওজন বইতে পারছে না। টলতে টলতে বিক্ষিপ্তভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে ছোট ছোট সবজে বিন্দু। নদীর মধ্যে এবং পাড়েও পড়ে আছে। আমরা গুলি করা বন্ধ করি; কিন্তু কামানের গুড়ুম গুড়ুম শব্দ চলতে থাকে। ব্রিটিশ বাহিনী আর আমাদের মাঝখানে ছররা গোলার প্রাচীর।

মাঠের বুকে ওরা লাল-সবজে রঙের দাগ ছিটিয়ে দেয়। পেছু হটতে হটতে আবার সার বাঁধবার চেষ্টা করে। মৃতদের ফেলে যায়। আমাদের দিয়ে যায় মৃত মুমূর্ষ আর বিজয়ীর অধিকার।

সময়ের হিসাব নেই। তার একমাত্র পরিমাপক ক্লান্তি। কতক্ষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমরা? আজ রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে।

সূর্য দিগন্তের কোলে হেলে পড়ে। বাতাস বইছে দীর্ঘশ্বাসের মত। বাতাসের এই স্পন্দনে বারুদের ধোঁয়া সুতোর মত জট পাকিয়ে যায়। আমার মাস্কেটের মুখ দিয়েও আঁকাবাঁকা ধোঁয়া বেরোয়। যন্ত্রের মত আমি গুলি ভরেছি—গুলি করেছি—আবার গুলি ভরেছি। বন্দুকটা হাতের পর তেতে আগুনের মত হয়েছে। কিরিচখানাও বেঁকে গেছে। কি করে বেঁকে গেল? সন্তর্পণে আমি কিরিচ স্পর্শ করি। শুকনো রক্ত! মানুষের খুন শুকিয়ে আছে।

ঠিক এলির রক্তের মত। এলি ঘুমোচ্ছে। আমার চারদিকে

লোকজন ধুপধাপ শুয়ে পড়ছে বন্দুক বুকে চেপে। যে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানেই কাত হয়ে পড়ছে। ফৌজদাররা এদের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করে। কেন? কেন ঘুম ভাঙাচ্ছে? যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে। এখন ঘুমোবার অধিকার ওরা অর্জন করেছে। ঘুমোক—লম্বা টানা গভীর ঘুম দিক। ঘুম দিয়ে যাবে বিস্মৃতি।

আমি ঘুমোতে পারি না। মাথার যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়তে থাকে। দপদপ করে অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা ফেটে যেতে যায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি পেছু হটা দেখি। মাঠের বুকে গোধূলির ছায়া নামে। আস্তে আস্তে চলেছে ব্রিটিশ সৈন্যদল। পা টেনে টেনে ছেড়ে যাচ্ছে পরাজিত রণক্ষেত্র। বার বার একটা কামান দাগার শব্দ হচ্ছে। দূরে কোথায় যেন আচমকা পটপট গুলির আওয়াজ হয়। পূব আকাশে পাতলা একখণ্ড মেঘ ভেসে ওঠে। অস্তগামী সূর্য তার গায়ে রঙ মাখিয়ে দেয়। গোলাপী আভা দেখতে দেখতে গাঢ় রক্তরাঙা হয়ে ওঠে। মনে হয়, রণক্ষেত্রের আর্ত বেদনা যেন আকাশের বুকে প্রতিফলিত হচ্ছে।

তোপ দাগার শব্দের বিরাম নেই। ক্রমে আর সব শব্দ মিলিয়ে যায়। সেই গভীর স্তব্ধতার মধ্যে শুধু তোপের শব্দই কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এখনও তোপ দাগা থামাচ্ছে না কেন?

বৃটিশ সৈন্যদল গোধূলির ম্লান আলোর মধ্যে মিশে যায়। লাল ও সবুজ মিলিয়ে যায় মাটির বাদামি আর সবুজ রঙের সঙ্গে। আমি কামানটির জন্য অপেক্ষা করি। কিন্তু তার এগিয়ে আসবার লক্ষণ দেখা যায় না।

সূর্য অস্ত গেছে।

সৈন্যদল ঘুমোচ্ছে। আত্মরক্ষার ঘাঁটির পেছনে বন্দুক জড়িয়ে লম্বা

লাইন দিয়ে ঘুমোচ্ছে সৈনিকেরা। মৃতেরাও ঘুমোচ্ছে তাদের পাশা-পাশি। কিন্তু মড়ার ভয় কেউ করে না। গভীর ঘুমে সবাই অচেতন।

গাছে গাছে বাতস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যায়। মাস্কেটটা আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে মাস্কেটের দিকে চেয়ে থাকি।

তারপর আত্মরক্ষার অস্থায়ী প্রাচীর পার হয়ে হাঁটতে থাকি। প্রতি পদক্ষেপে ব্যথা লাগে। তবু হাঁটতে হবে। একটি লোক আমায় চ্যালেঞ্জ করে।

বলি, ক্যাপ্টেন হেল—চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়া।

লোকটি বলে, পাহারা দেওয়া নরক যন্ত্রণার মত। মড়াগুলো নিয়ে গেলেই তো পারে। আমি ঘুমোতে চল্লাম।

আমি হেঁটে এগোই। আহতেরা কাতরাচ্ছে। একটি ডাক্তার এবং জনকয়েক স্ট্রেচারবাহী আমার পাশ দিয়ে যায়। ডাক্তার বিড় বিড় করে বলে, ঘুম না হলে মানুষ বাঁচে কি করে?

একটি আহত লোক আমার পা জড়িয়ে ধরে। আমি ডাক্তারকে ডাকি।

হা খ্রীস্ট! আমি একলা। একলা লোক আর কত করতে পারে বল?

মৃত ও জীবিতেরা পাশাপাশি শুয়ে আছে। উলঙ্গ হয়ে ঘুমোচ্ছে। বার বার হোঁচট খেতে হচ্ছে আমাকে। হিমশীতল আমার অন্তর। বরফের মত ঠাণ্ডা। এলি জানত।

নদীটি হেঁটে পার হই। হেঁটে যাই ব্রিটিশ শবের মধ্য দিয়ে। বেশ অন্ধকার হয়েছে এখন। কতক্ষণ আগে আমরা যুদ্ধ করেছি?

নিশ্চয়ই সামনে কোথাও এলির দেখা পাব। তাকে বোঝাতে পারি। সে বুঝতে পারত। জেকবের মনের কথাও সে বুঝত।

একটা গাছের দিকে এগোই। তলায় তুটি লোক দাঁড়ান। কথা বলছে। ওয়াশিংটনের গলা চিনতে পারি। যে কোন অবস্থায় চিনতে পারি ও গলা। অপর লোকটি লা ফায়েত।

তাঁদের দিকে হেঁটে এগোই। গাছের নীচে না আসা অবধি থামিনি।

কে তুমি? ওয়াশিংটন জিজ্ঞাসা করেন।

পাগলের মত আপন মনে হাসতে থাকি। যন্ত্রণায় মাথা ফেটে যাচ্ছে তবু হাসছি। বলি, পলাতক খুনী। কিন্তু ওয়েন আমাকে ক্যাপ্টেন বানিয়েছেন। সৈনিকদের নরকে নিয়ে যাবার জন্য বীর জেনারেল ওয়েন ক্যাপ্টেন বানিয়েছেন আমাকে! নরক কেমন জানেন? আজ দেখে এসেছি। সঙ্গীদের আজ নিয়ে গিয়েছিলাম নরকে! ওয়েনকে জিজ্ঞাসা করবেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবেন। তিনিই ক্যাপ্টন বানিয়েছেন আমাকে।

পাগল! ওয়াশিংটন বিড়বিড় করে বলেন।—আবাক হবার কিছু নেই! যা গরম আর আজকে যা দেখেছে!

আমি পাগল নই। শান্তভাবে বলি।—মানুষ কখন পাগল হয় জানি। আমি পাগল নই। তবে বড্ড ক্লান্ত। ঘুমোতে চাই।

যাও, তাহলে ঘুমোও গে।

যাচ্ছি—ঘুমোতেই যাচ্ছি।

প্রতিটি মুখ লক্ষ্য করে আপেল বাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটছি। শেষ অবধি এলির দেখা পাই। পাথুরে দেয়ালের কাছে শুয়ে আছে। অন্ধকারের মধ্যেও তাকে চিনতে কষ্ট হয় না। তার উপর ঝুঁকে ফিসফিস করে ডাকি, এলি…আমি আলেন হেল!

এলির বুকে আঘাত লেগেছে। তার হাত বাঁকিয়ে আমি ক্ষতটি ঢেকে দেবার চেষ্টা করি। চোখ তুটো বুজিয়ে দিই। আর তার

মুখে কোন ক্লান্তি নেই। মহান আত্মদানের পরম প্রশান্তি তার মুখমণ্ডলে।

এলির পাশে শুয়ে পড়ি। ফিসফিস করে বলি, এইবার ঘুমোব এলি। বড্ড ঘুম পেয়েছে। আমার সবকিছুই তো তোমার জানা। বরাবরের দরদী হৃদয় তোমার—সব কিছু বুঝতে!

আস্তে আস্তে ঘুম আসে। মাথার দপদপানি কিন্তু ছেড়ে যায়। এলির পাশাপাশি শুয়ে থাকি আর ফলের বাগানের গাছে গাছে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস কান পেতে শুনি।

—পঁচিশ—

পরদিন সকালে এলিকে কবর দিলাম। বহু ব্রিটিশ হেসিয়ান এবং আমেরিকানকে কবর দিতে হবে। অধিকাংশ আমেরিকান উলঙ্গ। তাদের গায়ে আমরা হেসিয়ানদের সবজে কোট জড়িয়ে দিলাম। উলঙ্গ ভাবে কোন সঙ্গীকে কবর দেওয়া ভাল দেখায় না। জামা খোলা নোংরা হেসিয়ানদের সার বেঁধে শুইয়ে দেওয়া হয়। লম্বা খরিখা কেটে পুঁতে রাখা হয় তাদের। কোন প্রস্তর ফলক তাদের কবর চিহ্নিত করবে না।

আপেল বাগানের যেখানে এলি পড়েছিল, সেইখানেই তার কবরের ব্যবস্থা করি। পাথুরে দেয়ালের কাছাকাছিই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। এখানকার জমিতে কোনদিনই লাঙল পড়বে না। তাছাড়া সূর্য যখন হেলে পড়বে, পাথুরে দেয়ালের ছায়া পড়বে কবরের উপর। ছায়ায় ঘাস গাঢ় সবুজ হয়। নিশ্চয়ই ঘাস জন্মাবে এলির সমাধিতে।

বাগানের মালিক চাষীটি দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করে। পাতলা ঢ্যাঙা লোকটি। বিড়বিড় করে শাপ-শাপান্ত করছে। ক্ষতি

পূরণ বাবাদ সে টাকা চায়। গুলি বৃষ্টিতে ছিন্ন-ভিন্ন আপেল গাছগুলোর দিকে চেয়ে তার গালগাল বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আবারও সে গালমন্দ শুরু করে। তারস্বরে বলে, যত পারিস পুঁতে রাখ। লাঙল দিয়ে চষে আমি বার করবই করব।

আমাদের মধ্যে জনকয়েক তার দিকে তাকায়। সেই তাকানির চোটেই তার গালমন্দ বন্ধ হয়ে যায়। এখনও আমরা গা-হাত-পা ধুইনি। সকলেরই রক্তমাখা বীভৎস চেহারা। তাহলেও বিজয়ী তো!

এলির জন্য একখানা তরোয়াল চাই। তার সঙ্গে একখানা তরোয়াল দিতে হবে আর মুখ ঢেকে দিতে হবে রেজিমেণ্টের ঝাণ্ডা দিয়ে। আমাদের রেজিমেণ্টের পাত্তা নেই। কোন পতাকাও নেই আমাদের। এলি কোনদিন তরোয়াল ব্যবহার করত না। যাই হোক, রণক্ষেত্রে তরোয়ালের অভাব নেই।

মৃত ফুজিলিয়ার্সদের মধ্যে গেলাম। এখনও তাদের কবর দেওয়া হয়নি। তাদের কিছু লোক শূন্যদৃষ্টিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। অধিকাংশই বালক। মৃত্যুর কোলেও লালকোট পরা ফুজিলিয়ার্সদের সাহসী দেখায়। আগে হলে এদের জন্য করুণা হত। কিন্তু এখন কোন কিছুর জন্যই করুণা নেই। এলির জন্যও না।

বেশ সরু একখানা পোশাকী তরোয়াল পেলাম। নীল পতাকাও যোগাড় হয়। নীল রঙটা বেশ স্নিগ্ধ। পতাকাটি দিয়ে এলিকে ঢেকে দিলাম আর তরোয়ালখানি রেখে দিলাম পাশে। পতাকার উপর নোংরা পড়ে। তারপর এলির শেষ-শয্যার সাক্ষী রইল ছোট একটি ঢিবি। ঢিবির উপর একখানা কিরিচ পুঁতে কবরটি চিহ্নিত করে রাখলাম। এই মরচেপরা বাঁকানো কিরিচখানা কারও কোন কাজে লাগবে না। সামান্য কিছুক্ষণই এখানা খাড়া থাকবে।

এলি মরে গেছে। জেকবও নেই।

লক্ষ্যহীনের মত হেঁটে বেড়াচ্ছি। সারা মাঠে মৃত্যুর বিভীষিকা। কিন্তু মৃত্যু আমায় বিচলিত করতে পারে না।

আজকের গরমটাও কালকের চাইতে কম। আকাশে কয়েক খণ্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। মাটিতে তার ছায়া পড়ে। একটা গাছের তলায় বসে আমি পা ছড়িয়ে দিই। দীর্ঘ বিশ্রাম···

একটি লোক আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। জিজ্ঞাসা করি, কি চাও?

রেজিমেণ্ট খুঁজে পাচ্ছি না ক্যাপ্টেন।

আমায় ক্যাপ্টেন বলছ কেন?

কালকে আপনিই তো আমাদের চালনা করেছিলেন।

তবুও সে দাঁড়িয়ে থাকে।

আরও কিছু বলবে?

আপনিই আমার ব্রিগেড চালনা করেছিলেন।

সে তো কালকের কথা।

আপনার কাছেই কি হাজিরা দিতে হবে ক্যাপ্টেন?

বল্লাম তো, সে তো কালকের কথা।

নদীতে গিয়ে স্নান করলাম। আরও বহু লোক উলঙ্গ হয়ে ঠাণ্ডা জলে গড়াচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গে জলের মধ্যে শুয়ে থাকি। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ি আর ঠাণ্ডা জল কুলকুল শব্দে গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যায়। বেশ ঠাণ্ডা জল। ভারি আরাম লাগে। চেয়ে দেখি, খণ্ড খণ্ড মেঘ গড়িয়ে যাচ্ছে আকাশ পথে।

এখন কি করব, কোথায় যাব, তাই নিয়ে কথা ওঠে। কথাবার্ত্তার ভাব শুনে মনে হয়, যুদ্ধ যেন শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজরা পরাজিত— ফ্রান্স আমাদের মিত্র।

লোকজন তখন বাড়ী ফিরবার কথা তোলে। এই আলোচনায়

অস্বস্তি বোধ করি। ফিরে যাবার স্থান আমার নেই। কোন জীবন নেই এ-জীবন ছাড়া। এককালে যাকে বাড়ী বলতাম, তা আজ স্বপ্নের মত মনে হয়। বাস্তব রয়েছে এইখানে—এই বিপ্লবের সঙ্গে। আবার জামা কাপড় পরি। শার্ট নেই, আছে শুধু একটা ছেঁড়া ব্রিচেস আর আর একটা মাস্কেট।

আবারও ফলের বাগানে ফিরে আসি। ওয়েনের সঙ্গে দেখা হয়। ঘাসের পর বসে আছেন। স্টুবেন তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ওয়েন সোৎসাহে বড় বড় করে কথা বলছেন। মুখে প্রসন্ন হাসি। ভুরু কুঁচকে স্টুবেন তার ইংরেজী বুঝবার চেষ্টা করছেন।

তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। অবশেষে ওয়েন বলেন, আলেন হেল!

হাঁ স্তর।

ঘাড় নেড়ে স্টুবেনকে ইশারা করে বলেন, এর কথাই বলছিলাম।

স্টুবেন জার্মান ভাষায় বলেন, খুব সাহসী লোক তুমি।

আমি মাথা ঝাঁকাই। সাহসীরা মরে গেছে। ওয়েনকে বলি, আমার ব্রিগেড উধাও হয়ে গেছে। আমাদের রেজিমেন্ট ভেঙে দিয়েছে।

কে ভেঙে দিল?

হাত দিয়ে আমি এলির কবর দেখাই। ওয়েন তখন উঠে আমার দিকে হাত বাড়ান। বলেন, মনে পড়ে একদিন তুমি হাতে হাত দিতে অস্বীকার করেছিলে?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিই।

তোমাদের আর সবাই কোথায়? কোথায় গেল নিউ ইয়র্কের লোক জন?

মারা গেছে স্তর।

কিছুক্ষণ তার মুখে কথা সরে না। তারপর বলেন, আমি তোমাকে ক্যাপ্টেন বানিয়েছিলাম। তুমি একটা ব্রিগেড চালনা করেছ।

সে ব্রিগেডের অস্তিত্ব নেই স্যর।

তাহলেও তোমার র‍্যাঙ্ক যাতে পাকা হয় তার ব্যবস্থা করব।

মাথা নেড়ে আমি সেলাম করি। তারপর সরে যাই। এলির কবরের পাশ দিয়ে গেলাম। কিরিচখানা এখুনি একটু হেলে পড়েছে। বেশীক্ষণ আর খাড়া থাকবে না।

স্থান ত্যাগের পূর্বে আমরা প্যারেড করি। রণক্ষেত্রে সার বেঁধে দাঁড়াই। সামনে আর মাঝখানে পেনসিলভানিয়ানদের লাইন। অধিকাংশ গণফৌজ। গণফৌজের প্রতিটি কেম্পানীতে শীত কালের অভিজ্ঞতা আছে এমন জনকয়েক পল্টনে নাম লেখান সৈন্য ভাগ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম।

প্রচণ্ড রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি। হাতে তপ্ত মাস্কেট আর কানের পেছনে সবজে কুঁড়ি। জেনারেলরা সৈন্য পরিদর্শন করে আমাদের প্রশংসা করেন। ভিখারীরা সৈন্যদল হয়েছে—দাঁড়িয়ে আছে বিজয়ী রণক্ষেত্রে। ভিখারীরা তাদের বাঁচবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

এ আজ ইতিহাস।

এলি শুয়ে আছে মনমাথের রণক্ষেত্রে। জেকবও আছে সঙ্গে। আর সবাই আছে ফোর্জ উপত্যকা নামে একটা জায়গায়। গ্রীষ্মকালে ফোর্জ উপত্যকা সবুজ সুন্দর হয়ে ওঠে। শীতকালেও সে-বছরের মত শীত আর পড়েনা। মাটির বুকে যেখানে তারা শুয়ে আছে, অতটা গভীর জমে যাবার মত শীত কোনকালেই পড়বে না।